ঝাঁপতাল

মন্দাক্রান্তা সেন

ইউনিসন এস্পায়ার পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম অধ্যায়

খুব ভোরে তিথির ঘুম ভেঙে গেল। আজ মহালয়া। এটা কি ভোর, নাকি শেষ রাত? শরতের ভোরে অন্ধকার জড়িয়ে থাকে। হালকা চাদরের মতো। তার ঈষৎ স্বচ্ছ বুনোটের মধ্যে দিয়ে সকালের ফর্সা ফর্সা গায়ের আভাস পাওয়া যায়। আকাশ কালো থেকে নীল হয়ে আসে। অদ্ভুত অন্যরকমের নীল। এই রংটা শুধু মহালয়ার ভোরেই দেখতে পাওয়া যায়। আজও শুয়ে শুয়ে তিথি পায়ের দিকের জানলা দিয়ে দুটো বাড়ির মাঝখানে একচিলতে আকাশে সেই রংটা দেখতে পেল। রংটা যেন ভিক্সের মতো নীল।

ছোটোবেলা থেকেই তিথির এরকম মনে হয়। আজও হল। এটা তার অনেক বোকা বোকা ধারণার মধ্যে একটা, সে জানে। ভিক্স নীল হয় না, সাদা হয়। কিন্তু তার এমনই ভাবতে ভালো লাগে। আসলে, ছোটোবেলায় বাড়িতে ওষুধের তাকে রাখা থাকত পুরোনো ভিক্সের ঘন নীল কাচের শিশি, তার ভেতর থেকে ভিক্সটাকে ওইরকম নীল আলোর মতো কোমল দেখাত। তিথি কেমন একটা ছমছমে টান অনুভব করত ওই শিশিটার প্রতি। প্রত্যেকবার মহালয়ার ভোরে আকাশ দেখে সেই অনুভূতিটাই ফিরে ফিরে আসে। এছাড়া অন্য অন্য দিন এত ভোরে আকাশ দেখা তার সাধারণত হয় না।

আর ভিক্সের ওই গন্ধটা। সে এক অনির্বচনীয় রোমাঞ্চকর গন্ধ, সারা ছোটোবেলা থেকে বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে এই উত্তর-তিরিশ অবধি জুড়ে থাকা আসন্ন পুজোর গন্ধের মতো, প্রচুর রোদ্দুর আর অল্প অল্প হিমের ঝাঁঝ মেশানো। এই গন্ধটা নাকে লাগলেই আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্তেজনা উদ্বেগ সব কিছু মিলিয়ে জটিল একটা ভালোলাগায় তিথির গা-হাত-পা শিরশির করে ওঠে। পুজো আসছে—বছরকার এই অতি পুরোনো ব্যাপারটা আজও তার বুকের মধ্যে একটা তীব্র ‘কী হয়-কী হয়’ সম্ভাবনার জন্ম দেয়।

অন্ধকার স্বচ্ছ বলে আলো জ্বালতে হল না, তিথি এমনিই উঠে বাথরুমে গেল। চারটে বোধ হয় বাজতে চলল। সাধারণত তার

ভোরে ওঠার অভ্যাস না থাকলেও, মহালয়ার দিন কীভাবে যেন ঠিক সময়ে ঘুম ভেঙে যায়। বাথরুম থেকে বেরিয়েই তিথি শুনল, উলটোদিকের মিন্টুদের বাড়ি থেকে আকাশবাণীর অধিবেশন শুরু হওয়ার সুর ভেসে আসছে।

এই আর একটা জিনিস, এই সুরটা। কোন যন্ত্রে যে সুরটা বাজানো হয় তিথি জানে না, হতে পারে পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ান। কিন্তু মনে হয় যেন সুরটা ঠিক অন্য গ্রহ থেকে ভেসে আসে। চেনা কোনো গ্রহ নয়, একদম অচেনা ছায়াপথের অচেনা নক্ষত্রজগতের অজানা একটা গ্রহ। ওই সুর এই পৃথিবীর হতে পারে না। সুরটা যখন বাজে, বারবার একই চলনে ঘুরে ঘুরে, আর তার পেছন থেকে তানপুরার একটানা উত্তাল গুনগুন চলতেই থাকে চলতেই থাকে, তিথির মনে হয় সমস্তটাই একটা অপার্থিব মন্ত্র। মন্ত্রের জাদু তার স্নায়ুকে তরঙ্গে তরঙ্গে ঘিরে ধরতে থাকে। মহালয়ার দিন ছাড়া এই সুরটাও সারা বছরে বোধ হয় একদিনও শোনা হয় কি না সন্দেহ। হলে হয়তো তার এই ম্যাজিকটাই থাকত না।

সুরটা শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করল তিথি। তারপর ঘরে এসে রেডিয়ো চালাল। তার আগে চালাল না, কারণ সুরটা যে তার ঘরের বাইরে অন্ধকার থেকে ভেসে আসছিল এর মধ্যে একটা বাড়তি রহস্য লুকিয়ে ছিল, নিজের রেডিয়োতে যেটা অনুপস্থিত।

এটা ঠিক রেডিয়ো নয়, সি ডি প্লেয়ার। এতেই রেডিয়ো ধরা যায়। সেন্টার ঠিক করতে করতে তিথি শুনল পাশের ঘর থেকে মায়ের কাশির আওয়াজ আসছে। তার মানে ঘুম ভেঙেছে। বাবার তো ভাঙবেই, বাবা রোজই আর একটু পরে উঠে হাঁটতে বেরোন। রেডিয়োর আওয়াজ মাঝারি রেখে তিথি খাটে এসে শুয়ে পড়ল। ছোটোবেলায় বাবার সঙ্গে আলো জ্বেলে বসে বসে মহালয়া শুনত, মনে আছে। বাবা টেপরেকর্ডারে টেপ করে নিতেন গোটা অনুষ্ঠানটা। সেইটেই আবার বেলায় চালানো হবে বলে। খুব মজা লাগত। চুপ করে শুনতে হত, কথা বললে ফিসফিস করে বলতে হত, নইলে টেপে উঠে যাবে যে! জোরে বলে ফেললে দাদা চাঁটি মারত মাথায়। তখন সেটাও হজম করতে হত চুপচাপ। মা অত সকালে চা করতেন। এখন সেসব আর হয় না। দাদা কবেই বাইরে চলে গেছে। মা বাবার বদলে তিথিই এখন রেডিয়ো খোলে। সবাই অন্ধকারে শুয়ে শুয়েই শোনে। অবশ্য রেডিয়ো

না চালালেও হয়, চারপাশের অনেক বাড়ি থেকেই গানটান সবই ভেসে আসে। কিন্তু এও যেন কেমন একটা সংস্কার, বছরকার দিনটা নিজেরা পালন না করলে মন খুঁতখুঁত করে।

তিথি চোখ বুজে শুনতে লাগল। সেই কবেকার মহালয়ার গান, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের প্রাণমাতানো স্তোত্রপাঠ। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এ যেন কিছুতেই পুরোনো হওয়ার নয়। একইরকম ভালো লাগে, একইরকম কান্না পায়, প্রতি বছর। সবারই ঠিক এমনটাই হয় কি না তিথি জানে না, তবে তার হয়। এও তো একরকম ধর্মাচরণই, সে ভাবল। এই যে আজকের দিনটিতে ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাঙালি ঘরে ঘরে রেডিয়ো খুলে দিচ্ছে, এই যে প্রতিবার এই সময়টাতে কেমন যেন বিনা কারণেই তার বুক ফেটে কান্না আসে, কী পবিত্র নয় এসব? এ সমস্ত উপচারেই যেন অমোঘ হয়ে ওঠে আয়োজন, প্রতি বছর পুজো ফিরে আসে।

ছেঁড়া ছেঁড়া তন্দ্রা আসছে, সেইসঙ্গে টুকরো টুকরো ছবি। তার কিছুটা স্মৃতি, কিছু নিছকই স্বপ্ন। আগমনী সুর আর দুর্গা রাগের উথালপাথালে ভাসতে ভাসতে ছবিগুলো চলেছে নিজের মতো।

১

ভালো করে ক্লাস শুরু হতে-না-হতেই লম্বা পুজোর ছুটি পড়ে গেল তিথিদের। নতুন কলেজ। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে জিয়োগ্রাফি নিয়েছে তিথি, তার বরাবরের প্রিয় সাবজেক্ট।

এবারের পুজো খুব আগে আগে। বর্ষাই যেন এখনও ফুরোয়নি ভালো করে, রোদ্দুর তড়িঘড়ি ছুটি নিয়ে চলে এসেছে বাড়ি। সেই রোদটাই তিথির ঘরের জানলা দিয়ে লাফিয়ে ঢুকতেই তিথি তড়াক করে উঠে বসল বিছানায়। আজই ষষ্ঠী না? পুজো এসে গেছে। ইশশ্—দেরি করে ফেলল নাকি তিথি? ন-টার মধ্যে তার মৌসুমীর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আজ থেকেই ঘুরতে বেরোবে তারা।

তিথির মনটা ছটফট করে উঠল খুশিতে। এবারের পুজোটা খুব আনন্দে কাটবে। প্রত্যেকবারই এমন মনে হয় যদিও, শেষপর্যন্ত তেমন কিছুই ঘটে না। বলতে গেলে ম্যাড়মেড়েভাবেই কবে যেন ফুরিয়ে যায় চারটে দিন। কিন্তু এবার কেমন মনে হচ্ছে দিনগুলো তার জন্যে বহু কিছু সাজিয়ে বসে রয়েছে—অনেক আলো অনেক রোদ অনেক মজা অনেক অনেক কিছু। মাইকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গান ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি গিয়ে পড়তে হবে ওই উত্সবের মধ্যে, তিথি ভেতরে ভেতরে তীব্র তাড়া অনুভব করল।

মাকে বেরোনোর কথা আগে থাকতেই বলা ছিল। গত বছরই সে পুজোয় একদিন বন্ধুদের সঙ্গে বেরিয়েছিল, আর এখন তো সে কলেজে পড়ে। কাজেই আপত্তির কোনো কারণ নেই। যদিও বাড়িতে কেউই মনে করে না সে যথেষ্ট বড়ো হয়েছে। চিরদিনই সে ছোটো, ফালতু। সে যে কাজগুলো করে সেগুলো সব ক-টাই বোকাবোকা, ভুলভাল। মা বাবার ততটা নয়, এগুলো প্রধানত দাদা তমালের অভিমত। তমাল বুদ্ধিমান, সব কাজে দক্ষ, দায়িত্বশীল। আর তিথি হাঁদা, ক্যাবলা, অপদার্থ। পরীক্ষায় ভালো

রেজাল্ট করে বুদ্ধি আছে বলে নয়, না বুঝে বই মুখস্থ করতে পারে বলে। তমাল শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। হোস্টেলে থাকে। পুজোতে বাড়ি এসেছে। আজ সকালেও তিথির বেরোনোর ব্যস্ততা দেখে তমাল নাক সিটকাল।

'এ কী রে, এখন থেকেই পুজো শুরু? সবে তো ষষ্ঠীর সকাল, মা দুর্গারও তো ঘুম ভাঙেনি এখনও।'

তিথি জবাব দেয় না। মনে মনে খুব খারাপ লাগে তার। দাদার সবসময় ইচ্ছে থাকে তার সমস্ত উত্‌সাহ মাটি করে দেওয়ার, সে জানে। বেশিরভাগ সময় সে ইচ্ছে সফলও হয়। আজ তিথি কিছুতেই পাত্তা দেবে না। তাড়াতাড়ি আঙুল চালিয়ে চালিয়ে শ্যাম্পু করা চুল শুকোতে থাকে সে।

তমাল কিন্তু ছাড়ে না। বোনকে বিরক্ত করা তার নেশা। অকৃতকার্য হলে তার জেদ বেড়ে যায়। প্রথম মন্তব্যটা বিঁধল না দেখে এবার সে ধার বাড়াল, 'দেখিস, চুল খুলে হাতে না চলে আসে, আঃ যা লাগবে না দেখতে—টাক মাথায় হেয়ারব্যান্ড, ফার্স্ট ক্লাস!'

তিথি রেগে কেঁদে চেঁচিয়ে উঠলে তমালের তৃপ্তি। ওটা হলেই সে ধীরেসুস্থে নিজের কাজে চলে যেতে পারে। কিন্তু তিথি এবারও খেপল না। বরং হেসে ফেলল। তমালও হাসল। হাসতে হাসতেই বলল, 'আরিব্বাস, আজ সক্কাল সক্কাল শাঁকালুর দোকান খুলে গেছে দেখছি, শাঁকালু কত করে?'

তিথির বুকের মধ্যে জ্বালা করে। তবু হাসতে থাকে সে। হাসতে হাসতে মুখের সামনে হাত চাপা দেয়। আজ সে কিছুতেই রাগবে না। রাগলে তারই ক্ষতি, সারাটা দিন পড়ে রয়েছে সামনে, আজ পুজো।

আয়নার সামনে সরে এল তিথি, তার আনন্দের যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ক-দিন আগেই একটা আইলাইনারের শিশি কিনেছে সে,

কাউকে বলেনি। মৌসুমীকে পরতে দেখেছে, দেখে খুব ইচ্ছে হয়েছে সেও ওইরকম পরবে। তুলে রেখেছিল এ ক-দিন, পুজোয় সাজবে বলে।

তার গায়ের রং কালো। সে মাথায় একটু বেশি লম্বা, রোগা। লম্বা হওয়া খারাপ নয়, কিন্তু তিথির মুশকিল হল সে পিঠ সোজা টানটান করে হাঁটতে পারে না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে। মা বলেন কোলকুঁজো। আসলে, সে জানে তার পিঠটা তার মনেরই মতো, একটুক্ষণ পরপরই গুটিয়ে যেতে চায়।

তার মুখের ওপরদিকটা মোটামুটি ভালো। নীচের দিকে এসে ছন্দপতন হয়ে গেছে। একেবারে ছোটোবেলায় তার দাঁত ভালোই ছিল, সুন্দর হাসিওয়ালা ছবিও আছে একটা। কিন্তু একটু বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, যখন দ্বিতীয়বার দাঁত উঠল, ওপরের পাটির সামনের দাঁতগুলো উঁচু হয়ে যেতে লাগল। হতে হতে শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে গেছিল তার দাঁত, মুখ বন্ধ তো হতই না, কেমন যেন বীভৎস লাগত দেখতে। সে যখন ক্লাস ফাইভে পড়ে, বাবা নিয়ে গেছিলেন শিয়ালদার ডেন্টাল কলেজে। মনে আছে ডাক্তারবাবু তার মাকেও আসতে বলেছিলেন, একটা কাগজে সই করিয়ে নিয়েছিলেন এই লিখে যে উনি সাধ্যমতো চেষ্টা করবেন কিন্তু ফল নাও পাওয়া যেতে পারে—এত সাংঘাতিক খারাপ অবস্থা হয়েছিল তার দাঁতের। ডাক্তার ভঞ্জ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এসে দেখাতেন, ছাত্ররাও সবাই তার মুখের ভিতর আঙুল পুরে কীসব দেখত। একদিন তিথি শুনেছিল ডাক্তারবাবু এক ছাত্রকে বলছেন, ‘কতদূর কী করতে পারব জানি না। চেষ্টা তো করতে হবে। এই দাঁত নিয়ে মেয়েটার বিয়ে হবে কী করে।’ শুনে লজ্জায় দুঃখে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার, একদল যুবক ছাত্রদের সামনে সে কোনোরকমে কান্না সামলেছিল।

ডাক্তার ভঞ্জের কৃতিত্ব বলতে হবে, তিথির দাঁত এখন অনেক ভদ্রস্থ। চার বছর মুখের মধ্যে ক্লিপ লাগানো প্লাস্টিকের প্যালেট পরে থাকতে হয়েছিল তাকে। দাঁত অনেক নীচু হলেও এখনও খুব বড়ো বড়ো, আর অসমান। এটা আর কিছু করা যায়নি। যা

ছিল, তার তুলনায় এটাই ডাক্তার ভঞ্জের ভাষায়—মিরাকল। তিথি এখন ঠোঁট বন্ধ করতে পারে। কিন্তু গোলমেলে সেটিং-এর জন্যে বন্ধ করলেও হাঁ মুখটা একটু ফুলে থাকে তার। হাসলেও ভালো দেখায় না। হাসতে গেলে তাই সে আপনা থেকেই মুখে হাত চাপা দেয়। বিশেষ করে বাইরে, অন্য লোকের সামনে। বাড়িতেও দাদা বলে, 'শাঁকালুর দোকান বন্ধ কর।' তাই সে আজকাল বাড়িতেও মুখে হাত আড়াল করে হাসে।

কিন্তু, কেউ না বলুক, তিথি জানে তার চোখ দুটি বেশ সুন্দর। আর ভুরু দুটি অসাধারণ। টানা লম্বা আর বাঁকানো। খুব সরু নয় আবার খুব মোটাও নয়। মাঝখানে, নাকের ওপর হালকা হালকা লোম দিয়ে জোড়া। এসবের বেশিটাই যদিও ঢাকা থাকে চশমায়। পাওয়ার মাইনাস পাঁচ। সবসময় চশমা পরতেই হয় তাকে, নাহলে সে প্রায় অন্ধ।

সাজতে গেলে চশমাটা খুলে রাখতে হয়, নাহলে মুখে কিছু মাখা যায় না। আবার চশমা খুললে নিজের মুখটাই আয়নায় ভালো করে দেখা যায় না। তিথি মুখ এগিয়ে আয়নার কাচে প্রায় নাক ঠেকিয়ে ফেলল। তার হাতে নতুন কেনা আইলাইনারের শিশি। চোখের ওপরপাতায় সরু একটা রেখা টানতে সে ভেবেছিল খুব একটা অসুবিধে হবে না। তার আঁকার হাত, তুলির টান ভালো। কিন্তু কার্যত দেখল দুটো ব্যাপার আলাদা। আয়নায় দেখে নিজের চোখে তুলি চালানো কাগজে তুলি টানার মতো সহজ লাগছে না। চোখের পাতা কাঁপছে থরথর করে, তুলি-ধরা হাতও কাঁপছে তার।

খুব সাবধানে ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত ঠিকঠাকই ম্যানেজ করতে পারল তিথি। বাঁ-চোখটা একটু জ্বালা জ্বালা করছে। ভিতরে একটু রং চলে গেছে বোধ হয়। তিথি আইলাইনার লাগানো নিজের দু-চোখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল, বাঃ কী সুন্দর মানিয়েছে। তার চোখ ভালো সে জানত। চাপা নাকের ওপর হাত রেখে মুখের নীচটুকু ঢেকে ফেলল তিথি, এবার কি খুব খারাপ লাগছে তাকে দেখতে? মোটেই নয়, বরং সুন্দরীই মনে হচ্ছে। তিথি হাতের আড়ালে হেসে ফেলল।

২

চারতলা বাড়ির প্রত্যেকটাতে আটটা করে ফ্ল্যাট। এরকম ছ-টা বাড়ি নিয়ে একটা হাউসিং কমপ্লেক্স। নাম নবরূপা। বছর ছয়েক হল হয়েছে। তিথিদের বাড়ি থেকে বেশি দূর নয়, হেঁটে গেলে দশ-বারো মিনিট লাগে। মৌসুমীরা এখানেই থাকে। মৌসুমী তিথির স্কুলের বন্ধু। আগে ওরা শিলিগুড়িতে থাকত। ওর বাবা ডাক্তার, সরকারি চাকরি করেন। বদলি হয়ে যখন কলকাতায় এলেন, মৌসুমী বছরের মধ্যিখানে এসে ভরতি হল তিথিদের স্কুলে। সেটাও একটা সরকারি স্কুল। তখন ওরা ক্লাস এইটে। প্রথম দিন মৌসুমীর সঙ্গে তিথির তেমন আলাপ হয়নি। দারুণ সুন্দরী এই নতুন মেয়েটিকে ঘিরে ক্লাসের অন্যান্য মেয়েরা ভিড় জমিয়েছিল। তিথি ছিল দূরে দূরে, কিন্তু যখন জানা গেল মৌসুমীদের নতুন ফ্ল্যাট তিথিদের বাড়ির এত কাছে, তখন মৌসুমী যেচে এসে বলেছিল, 'তিথি শোনো, আমরা একসঙ্গে যাওয়া আসা করব।'

তিথির খুব ভালো লেগেছিল। এটাও সে বুঝতে পেরেছিল ক্লাসের অন্য মেয়েরা কেমন একটা ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিল তার প্রতি। কেন কে জানে! ওদের মধ্যে বোধ হয় একটা চাপা প্রতিযোগিতা চলেছিল, মৌসুমীর বন্ধু কে হবে তাই নিয়ে। মৌসুমী সবারই বন্ধু ছিল, কিন্তু রোজ একসঙ্গে বাড়ি থেকে স্কুল আর স্কুল থেকে বাড়ির পথটুকু যেতে যেতে স্বাভাবিকভাবে তিথিই হয়ে দাঁড়ায় তার বেস্টফ্রেন্ড। অথচ ক্লাসের মধ্যে একমাত্র তিথিই বোধ হয় মৌসুমীকে অধিকার করার প্রতিযোগিতায় ছিল না। মৌসুমী আসার পর তাকে নিজের পাশে বসিয়েছিল মনিট্রেস সুদীপ্তা। সেই কারণে তার দাবি ছিল বেশি। শেষপর্যন্ত মৌসুমী যখন ক্লাসটিচারকে বলে তিথির পাশে নিজের সিট বদলে নিল, সুদীপ্তা বাঁকা সুরে বলেছিল, 'হুঁ, রামের পাশে রামছাগল।' আর একজন টিপ্পনী কেটেছিল, 'না না, বল বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট!'

তিথি নিজেও অবাক হয়েছিল। হতে পারে সে পড়াশুনায় ভালো। কিন্তু মৌসুমীর সঙ্গে তার আকাশপাতাল পার্থক্য। প্রথমত চেহারায়। সুদীপ্তারা যে নেহাত মিথ্যে বলেনি তা সে নিজেই জানে। তারপর মৌসুমীরা রীতিমতো বড়োলোক। চাল না মারলেও

মৌসুমীর কথাবার্তা থেকেই সেটা বোঝা যায়। পরে মৌসুমীর বাড়ি গিয়েও তো তিথি দেখেছে। তারা মৌসুমীদের তুলনায় নিতান্তই সাধারণ মধ্যবিত্ত। এগুলো বন্ধুত্বের পথে যে কোনো বাধা নয়, মৌসুমী তার জীবনে না এলে তিথি বিশ্বাসই করত না।

মাধ্যমিক পর্যন্ত ওরা একসঙ্গে পড়ল। ইলেভেনে আলাদা হতে হল একটু। মৌসুমী ওই স্কুলেরই উচ্চমাধ্যমিক বিভাগে ভরতি হল, তিথি চলে এল অন্য স্কুলে। কিন্তু বন্ধুত্বে ভাঙন ধরল না। কেন ধরবে, তারা তো শুধু স্কুলের বন্ধুই নয়, পাড়ার বন্ধুও।

পার্থ সকাল থেকে বোনের সাজগোজ লক্ষ করছিল। মৌসুমী তার নিজের বোন নয়, খুড়তুতো বোন। পার্থর মা–বাবা–বোন বর্ধমানে দেশের বাড়িতে গেছেন, বাড়ির পুজো উপলক্ষ্যেই। পার্থ যায়নি। পুজোর ক–টা দিন কাকুর বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে বলে কাল রাত্রে এখানে এসেছে।

পার্থর বাবা অলক মল্লিক বাড়ির বড়ো ছেলে। মৌসুমীর বাবা অরূপ মেজো। তার পরে আরও পাঁচ ভাই, বোন নেই। অরূপ মল্লিক ডাক্তারি পাশ করার পর বাবার অমতে বিয়ে করে শ্বশুরের টাকায় বিদেশ চলে যান। উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে কয়েক বছর পর দেশে ফিরে আসেন কিন্তু বাবার সঙ্গে এখনও মিটমাট হয়নি। মা যখন কলকাতায় আসেন ঘুরে ঘুরে সব ছেলের কাছেই কিছুদিন থেকে যান, অরূপের কাছেও থাকেন। অরূপের বউ মিতাকে তাঁর অপছন্দ ছিল না। তাঁর স্বামীই আসলে এটা মেনে নিতে পারেননি যে ছেলে বিয়ের পরে শ্বশুরের পয়সায় বাইরে যাবে।

সেই কারণে মৌসুমীদের সঙ্গে বর্ধমানের বাড়ির বলতে গেলে কোনো যোগাযোগই প্রায় নেই। পার্থদের কিন্তু আছে। অলক-অরূপের বাবা, অর্থাৎ পার্থ-মৌসুমীদের ঠাকুরদা অঘোর মল্লিকরা তিন ভাই। সেই হিসেবে দেশের পুজোর দায়িত্বও পড়ে তিন শরিকের ওপর ঘুরে–ফিরে। গত বছরই ছিল অঘোর মল্লিকের পালা। তার মানে তাঁর ছেলেদেরই পালা, কেননা অঘোর মল্লিকের বয়স এখন আশির ওপর, বছর সাতেক আগে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছিলেন, সেটা পুরোপুরি সারেনি, এখন লাঠি নিয়ে চলাফেরা করেন। কিন্তু ছেলেদের কাউকেই তেমন পাওয়া যায় না। অরূপের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, অলক ছাড়া

বাকিরাও এমন ভাব করে যেন পুজোর চার দিন সপরিবারে দেশের পুজোবাড়িতে গিয়ে দাঁড়ানো এবং ভোগ-প্রসাদ খাওয়াটাই শুধু তাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। পুজোর পুরো ভারটাই চাপে অলকের কাঁধে। অলক এই দায়িত্ব থেকে পালাতে পারেন না, পালাতে চানও না সে-কথা ঠিকই, কিন্তু মজা এখানেই যে তাঁর কোনোরকম দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষমতাই নেই। এক ধরনের চরিত্র দেখা যায়, যারা তাদের সারাজীবন কাটিয়ে দেয় যে-কোনোরকম কাজকর্মেই ন্যূনতম দক্ষতা ছাড়া এবং নিজেদের এই অযোগ্যতার জন্যে তারা অন্যের কাছে করুণার পাত্র হতে পছন্দ করে, তবু কিছুতেই নিজেকে শোধরানোর চেষ্টা করে না। অলক মল্লিক একেবারে এই চরিত্রের মানুষ। কাজেই, ঠাকুরদা অশক্ত হয়ে পড়ার পর তাদের তরফের পুজোর পালা কার্যত পার্থকেই সামলাতে হয়েছে। এই ধরনের পালার পুজোয় একটা বিরক্তিকর ব্যাপার হল, শরিকরা সবসময় ওত পেতে থাকে পুজোর উপচারে আয়োজনে ব্যবস্থাপনায় আপ্যায়নে নানারকম ত্রুটি ধরার জন্যে। প্রত্যেকবারই এই নিয়ে একটা-না-একটা গোলমাল বাধে। গতবার পার্থর সঙ্গে বড়ো ধরনের ঝামেলা হয়েছিল অঘোর মল্লিকের মেজোভাই অর্থাৎ পার্থর মেজোদাদুর ছেলে বিলুকাকার সঙ্গে। মারামারি বাধার উপক্রম। সেই রাগ পার্থর আজও পড়েনি। এবারের পুজোয় মেজোতরফেরই পালা। আর কেউ হলে ওদের পুজোর খুঁত ধরে শোধ তুলতে পারত। কিন্তু পার্থর সে প্রকৃতি নয়, তাই সে মা-বাবাকে বলেছে, 'তোমরা যাও, আমি মেজোকাকুর বাড়ি থেকে যাব এ ক-দিন।'

মৌসুমীর সাজ দেখতে দেখতে পার্থর মজা লাগছিল, সেইসঙ্গে কেমন একটা ভালো লাগছিল, যাকে স্নেহই বোধ হয় বলা যেতে পারে। স্নেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়, মৌসুমী তার থেকে অনেকটাই ছোটো, প্রায় বারো বছরের। ওর জন্ম ইংল্যান্ডে। মেজোকাকু কাকিমা যখন ফুলের মতো ছোট্ট এইটুকু মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরলেন, পার্থর মনে হয়েছিল—এই সুন্দর সাহেবদের মেয়ের মতো বাচ্চাটা তারই খুড়তুতো বোন! অবশ্য মেজোকাকু আর কাকিমাই যে তাদের আত্মীয় এটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। তারা দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় এসেছে আজ ছাব্বিশ বছর, এখনও ভাড়া বাড়িতেই পড়ে আছে। যে চাকরি নিয়ে তার বাবা এই শহরে এসেছিলেন, সেটা অতি সামান্য। সেটা বদলে আরেকটাতে ঢুকলেন, সেটাও ভালো কিছু নয়। আসলে তার বাবা চাকরি করা বা পয়সা রোজগার—এসব নিয়ে গুছিয়ে কিছু ভাবতেই পারতেন না। পার্থ ছোটোবেলায় বাবাকে বার বার দেশের

বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা বলতে শুনেছে। মা বলতেন, ‘সেখানে আছে কী যে ফিরে যাব! তার চেয়ে এখানেই মন দিয়ে দ্যাখো কিছু করা যায় কি না।’ সেই মনটাই বাবা কখনো দেননি। সংসারের হালও সেরকম। কোনোক্রমে ভদ্রভাবে চলে যায়। তার পাশে মেজোকাকুদের ঘরবাড়ি রূপকথার দেশ। সাজানোগোছানো ঘর, সুন্দর বাথরুম। পার্থর মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতে ইচ্ছে করে। আজকেও আরাম করে সোফার একপাশে বসে থাকতে থাকতে তার মনে হল, মৌসুমী খুব সুন্দর হয়ে উঠেছে, ওর মুখ ক্যামেরায় খুব ভালো আসবে।

চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো হয়ে গেলেও মৌসুমী আর একবার আলতো হাতে ব্রাশ বোলাতে বোলাতে পার্থর দিকে তাকাল। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে প্রশংসা আশা করছে। বুঝতে পেরে পার্থ ডান হাতটা তুলে তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের ডগা জুড়ে তারিফসূচক একটা মুদ্রা করল, মুখে বলল, ‘ফ্যান্টাস্টিক!’

মৌসুমী খুশি হয়ে পার্থর পাশে এসে বসল। পার্থ সস্নেহে ওকে দেখতে দেখতে বলল, ‘এখন কী প্রোগ্রাম?’

‘তিথি আসবে। আমার বন্ধু। একসঙ্গে বেরোব। কিন্তু ও খুব দেরি করছে।’ মৌসুমী অধৈর্য ভঙ্গিতে ঘড়ির দিকে তাকাল।

‘তোর বন্ধুও নিশ্চয়ই তোর মতোই সাজগোজ করছে।’ পার্থ হাসল, বলল, ‘চল আমরা নীচে যাই, তোদের হাউসিং-এর ঠাকুর আমার দেখা হয়নি, দেখে আসি।’

মৌসুমীর মনে হল সেটাই ভালো হবে। তাদের এই ফ্ল্যাটটা চারতলার ওপরে। উঠতে নামতেই কত সময় লাগে, তার থেকে নীচে তাদের হাউসিং-এর পুজো হচ্ছে, ওখানে প্যান্ডেলে গিয়ে বসে থাকলে তিথির সঙ্গে নীচেই দেখা হয়ে যাবে, ওকে আর ওপরে উঠতে হবে না। মৌসুমী মাকে গিয়ে বলল, ‘মা, আমি আর বড়দা নীচে যাচ্ছি। তিথি এলে আমি কিন্তু ওর সঙ্গে বেরোব।’

মিতা রান্নাঘরে ছিলেন। রান্নার মেয়ে রান্না করছে, উনি তদারক করছিলেন। মৌসুমীর কথা শুনে বেরিয়ে এসে বললেন, 'নীচে যাচ্ছ যাও, তিথি এলে ওপরে এসে আমাকে বলে তারপর যাবে, হুট করে বেরিয়ে যাবে না।'

মৌসুমী আপত্তি করে বলে উঠল, 'বা রে, এই তো বলে যাচ্ছি। তখন আবার উঠব, আবার নামব নাকি? আমার পা ব্যথা করবে না?'

'মৌ তর্ক কোরো না।' মিতা শাসনের সুরে বললেন, 'আমি কী করে জানব তুমি কখন বাড়ি থেকে বেরোলে, নাকি সেটা আমার জানবার দরকার নেই?...পা ব্যথা হলে তুমি এখন নীচে যেও না, তিথি এখানেই আসবে।'

মৌসুমী মাথা ঝাঁকিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই পার্থ বলল, 'কাকিমা তুমি ভেবো না, আমি তো আছি। এখন নীচে যাই। মৌয়ের বন্ধু এলে যখন ওরা বেরোবে, তখন আমি ওপরে এসে তোমাকে খবর দিয়ে যাব।'

নবরূপার ফ্ল্যাটবাড়িগুলোর মাঝখানে মাঝারি আকারের একটা মাঠ। ওই মাঠেই পুজোর প্যান্ডেল, এখানকার বাসিন্দাদের নিজস্ব পুজো। প্যান্ডেলের সামনে সারি সারি কাঠের ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। এই সকালে বেশিরভাগই ফাঁকা, কয়েকটা এখানকারই কয়েক জন কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণীর দখলে। তাদের মধ্যে অনেকেই বেশ সেজেছে। মৌসুমীর ছোটোভাই দীপ অনেকক্ষণ থেকেই মাঠে। অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করছে, সবার হাতে একটা করে পটকা ভরা খেলনা পিস্তল। ওদেরই চিৎকারহাসিতে হুটোপাটিতে জায়গাটা সরগরম।

পার্থ আর মৌসুমী প্যান্ডেলের কাছাকাছি আসতেই দু-তিনটি মেয়ে সমস্বরে মৌসুমীকে ডেকে উঠল। মৌসুমী ওদের দিকে এগোতে এগোতে পার্থর দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'বড়দা তুমি ঠাকুর দ্যাখো, আমি এক্ষুনি আসছি।'

পার্থ মনে মনে হাসল। মৌসুমী মেয়েগুলির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই মিলে কলকল করে উঠল। উচ্চকিত কথা। হাসির ফোয়ারা। কথা বলতে বলতে মৌসুমী একবার পার্থর দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখমুখের করুণ ভঙ্গি করল, ভাবখানা এই যে, ওরা তাকে পার্থর কাছে আসতে দিচ্ছে না। পার্থ হাত তুলে ওকে নিশ্চিন্ত থাকার ইশারা করতেই মৌসুমী ওখানে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল।

একা একা বসে থাকতে পার্থর ভালোই লাগছিল। তার চোখ প্রতিমার দিকে। শোলার সাজ হয়েছে মা দুর্গার, তাঁর ছেলেমেয়েরও। ঠাকুরের মুখ সুন্দরই হয়েছে, কিন্তু পার্থ বুঝতে পারে না মা দুর্গার গায়ের রং বেশিরভাগ জায়গাতেই গোলাপি কেন করে। মায়ের রং তো কাঁচা হলুদের মতো, গলানো সোনার মতো। তা ছাড়া মুখের ছাঁদও যেন ঠিক দেবী দেবী নয়, কেবলই সুন্দরী মেয়ের মতো মুখ। মা দুর্গা বলতে যে মুখ যে রং যে টানা চোখ, ছোট্ট চিবুকের ডৌলটি মনে ভেসে ওঠে সে তাদের বর্ধমানের বাড়ির ঠাকুরের। একচালার ঠাকুর, বেশি বড়ো নয়। কিন্তু অপূর্ব একটা মহিমা আছে তার, আলাদা একটা ঐশ্বরিক প্রকাশ, তবুও কী ভীষণ মা মা। পার্থর সেরকমই মনে হয়। তাদের দেশের বাড়ির পশ্চিম দিকে পুজোবাড়ি। সারা বছর সেখানে কাঠামো পুজো হয়। দুর্গাপুজোর আগে ওই কাঠামোতেই প্রতিমা গড়া হয়। সে প্রতিমা যেন প্রত্যেক বছর অবিকল এক। পার্থর আশ্চর্য লাগে। ওই তার চেনা মুখ। সত্যিকারের মা-ই সেখানে ফিরে ফিরে আসেন। পার্থর বুকের মধ্যে খুব কষ্ট হতে শুরু করল। এবার প্রথম সে পুজোয় দেশে যায়নি, মায়ের মুখ না দেখতে পেয়ে তার খুব কষ্ট হচ্ছে। এখনও বর্ধমানে চলে যাওয়া যেতেই পারে—কিন্তু না, সে যাবে না। পার্থ চোখ বুজে ফেলল, মনে মনে বলল, 'মা তোমার অন্য কোনো চেহারা আমার ভালো লাগে না, আমাকে ক্ষমা করো। আমি যে রূপে তোমার পুজো করেছি তোমার সেই রূপই আমার প্রিয়।'

পার্থ জানে না সে কতক্ষণ ওইভাবে চোখ বন্ধ করে বসে ছিল। একমনে সে তাদের বাড়ির মা দুর্গার মুখই ধ্যান করছিল, বাচ্চাদের অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি, মেয়েদের হাসির হুল্লোড়ও তার কানে আসছিল না। হঠাৎ কে যেন তার কানের কাছেই জোরে চেঁচিয়ে ওঠাতে তার ধ্যান ভেঙে গেল। চোখ খুলে দেখল, সামনে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মৌসুমীরই বয়সি, মৌসুমী তার

মুখের সামনে হাত-পা নেড়ে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় চেঁচিয়ে বলছে, 'তোর এতক্ষণে আসার সময় হল, আমি কখন থেকে নীচে এসে বসে আছি।'

মেয়েটি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, মৌসুমীর তর্জনগর্জনে রাগ করছে না। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমাতে অপরাধ-স্বীকার আর কৌতুক মিলেমিশে আছে। খুব খানিকটা রাগারাগির পর মৌসুমী যখন একটু শান্ত হয়ে আসছে, তখনই যেন কী একটা লক্ষ করে সে আবার হইচই করে উঠল। তবে এখন তার গলায় রাগের বদলে খুশিমিশ্রিত বিস্ময়, 'ওমা! তিথি, তোকে কী দারুণ দেখাচ্ছে রে! দেখি দেখি, তুই সেজেছিস!'

পার্থ দেখল মেয়েটি মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসছে। তার হাসি দেখা যাচ্ছে না, তবু পার্থর মনে হল এমন হাসি সে আগে কখনো দেখেনি। মেয়েটি মুখ আড়াল করে আছে, অথচ ওর চোখ হাসছে, হাত, পা, সারা শরীর হাসছে। মৌসুমী ওকে আরও কী বলছে আর ও এদিক–ওদিক মাথা নাড়াচ্ছে, ওই মাথা নাড়ানোটাই ওর হাসি। পার্থর মনে হল, এখানে যতগুলি মেয়ে বসে আছে এদিক ওদিকে, এমনকি মৌসুমী, কেউই অত সুন্দর হাসতে পারে না। শুধু এখানে বলে নয়, এ ছাড়াও অন্য কোনো মেয়ে বা ছেলের পক্ষে এই হাসি সম্ভব নয়। এই হাসি দেখবে বলেই সে এবার দেশে যায়নি, এই হাসি দেখল বলেই সে দেখতে পেল, কলকাতাতেও পুজো এসে গেছে।

৩

পার্থ বলে এসেছিল যে মৌসুমীরা বেরোলে সে ওপরে এসে কাকিমাকে খবর দেবে। কিন্তু ওপরে আসতে হল তিনজনকেই, আবার নামতেও হল। কারণ, মৌসুমী আর তিথি কিছুতেই স্থির করতে পারল না তারা কোথায় যাবে। কাছেপিঠে পাড়ার ঠাকুর দেখে আসতে পারত দুজনে, কিন্তু কারোরই সেটা ইচ্ছে নয়। মনে মনে ওরা চাইছে একটু দূরে কোথাও ভালো ঠাকুর দেখতে। এদিকে মুশকিল হচ্ছে, গড়িয়াহাট বালিগঞ্জ পার্কসার্কাস—যেখানেই যাও না কেন, এলোমেলো ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়াতে হলে রাস্তাঘাট যতটা চেনা থাকার দরকার, সেটা তো ওদের নেই। আর তা ছাড়া একটা আত্মবিশ্বাসও জরুরি। নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় যাওয়ার দরকার পড়লে, রাস্তা বাতলে দিলে বাসেট্রামে চেপে ওরা একা একাই হয়তো সেখানে পৌঁছে যেতে পারবে—সেটা আলাদা কথা। কিন্তু দুজনে মিলে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে যদি রাস্তা ভুলে ঘুরে মরতে হয় আর ক্রমাগত লোককে রাস্তা জিজ্ঞেস করতে হয়, তাহলে পুরো আনন্দটাই মাটি। ওরা এও জানে যে ওরা আর ছোটো নেই, উলটোপালটা লোক যদি বুঝতে পারে দুটি মেয়ে পথ হারিয়েছে, তাহলেও বিপদ।

একেই অনেক দেরি হয়ে গেছে, তার ওপর বেড়াতে যাওয়া প্রায় কেঁচেই যাচ্ছিল আর কি! মৌসুমীর মাথায় হঠাৎ বুদ্ধি এল, বলে উঠল, ‘আইডিয়া! বড়দা আমাদের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে। বড়দা প্লিজ চলো না, চলো চলো’

মৌসুমী পার্থর হাত ধরে টানাটানি শুরু করল। তার প্রয়োজন ছিল না। পার্থর রাজি না হওয়ার কোনো কারণ নেই, বরং সে অনেকক্ষণ থেকে পা বাড়িয়ে আছে। সে নিজেও বুঝতে পারেনি, ভেতরে ভেতরে সে ওদের সঙ্গে যেতেই চাইছিল।

সেটা অবশ্য পার্থ মুখের ভাবে প্রকাশ করল না। যেন মৌসুমীর টানাটানিকে প্রশ্রয় দিয়েই তিথির দিকে না তাকিয়ে বলল, ‘আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি। তার আগে কাকিমাকে বলে আসতে হবে তো, না কি?’

তিথির সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর পার্থর মনে হল ওকে সে আগেও দেখেছে। দেখাটাই স্বাভাবিক। কেননা তিথি মৌসুমীদের বাড়িতে প্রায়ই আসে। অতটা ঘন ঘন না হলেও পার্থরও এখানে ভালোই যাওয়া-আসা আছে। যদিও এর আগে মৌসুমীর কোনো বন্ধুর সঙ্গেই পার্থর তেমন পরিচয়-টরিচয় হয়নি। হওয়ার সুযোগ কিংবা কারণ ঘটেনি, তাই। ওরা সবাই তার থেকে এত ছোটো, অন্তত পার্থর তাই ধারণা ছিল। আজ তার মনে হল, সে যেন কবে থেকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে, যুবক হওয়ার পর থেকে তার আর বয়স বাড়েনি। কিন্তু বালিকারা কিশোরী থেকে হু–হু করে তরুণী হয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে হাঁটতে, কথা বলতে আজ প্রতিটি মুহূর্তই মনে হচ্ছে নতুন, দারুণ উপভোগ্য। কিংবা না, এরকমটা ঠিক হয়তো সবার ক্ষেত্রেই হত না, হয় না—একেকজনের সঙ্গেই হঠাৎ কীভাবে যেন এরকম হয়ে যায়।

তিথিও বুঝতে পারছিল কোথাও একটা কিছু হচ্ছে। অদ্ভুত কিছু। কী, সেটা ঠিক ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তার নিজেকেই কেমন অন্যরকম লাগছিল, অচেনা, সে এমনিতে যেমন, তার চাইতে অনেক, অনেক ভালো। সে সাধারণত নতুন মানুষের সঙ্গে প্রথমেই চট করে মিশতে পারে না। কিন্তু আজকের তিথি যেন আলাদা কেউ। ঝরঝর করে হাসছে, প্রতিটি কথার উত্তরে লাগসই কথাটা চটপট চলে আসছে তার জিভে। অন্যদিন এমন হয় না। উত্তর জানা থাকলেও সে মুখ খুলতে পারে না। আজ সে নিজের থেকেই দারুণ সব বুদ্ধিদীপ্ত মজার মজার কথা বলছে। তার কথা শুনে মৌসুমী হেসে কুটিপাটি হচ্ছে, পার্থর চোখেমুখেও সে আগ্রহ চিনতে পারছে। এসবই তার নতুন অভিজ্ঞতা। এমনকী, আয়না না দেখেও সে বেশ বুঝতে পারছে তার নিজেরই চোখের দৃষ্টি আজ খুব ঝকঝক করছে। তিথি এক অভূতপূর্ব স্রোতে ভেসে যেতে যেতে মাত্র কয়েক বারই মুহূর্তের জন্য ভাবার ফুরসত পেল—এ কী! সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কী করে!

পার্কসার্কাস ময়দানে বিরাট মেলা বসেছে। সেখানে ঢুকেই তিথি আর মৌসুমী ছুটে গেল যেদিকে চুড়ি দুল মালা বিক্রি হচ্ছে সেদিকে। ওদের পিছন পিছন উত্সাহের সঙ্গে পার্থও।

দেখা গেল, চুড়ির প্রতি দুজনেরই ঝোঁক বেশি। মৌসুমী পছন্দ করল কালচে নীল কাচের চুড়ি, তার ফর্সা হাতে চমৎকার মানাবে। আরও অনেক সুন্দর সুন্দর রং থাকতেও তিথি বাছল হালকা বাদামি ঘেঁষা একটা চাপা রং। মৌসুমী ক্ষুণ্ণ স্বরে বলল, 'ওই দ্যাখো, এত রং থাকতে ঠিক খুঁজে বার করেছে সবচেয়ে অফ্ কালারটা। কেন, ওই মেরুনটা তো তোকে দারুণ মানায়?'

'রক্ষা কর। ওই রং আমি পরলে আর দেখতে হবে না। আমি নয়, চুড়িটাই লজ্জা পেয়ে যাবে।'

তিথি কথাটা এমন সহজ সুরে বলল যে পার্থ মুগ্ধ হয়ে গেল। আজ অবধি সে কখনো দেখেনি কোনো অল্পবয়সি মেয়ে নিজের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করছে, এমন অনায়াসে, অসংকুচিতভাবে।

মৌসুমী মানতে চাইছিল না। সে চায় তার বন্ধুও উজ্জ্বল রং পরুক। পার্থ অযাচিতভাবেই নাক গলাল, 'থাক না, ওকে ওর পছন্দমতো নিতে দে। রংটা কিন্তু খুব অন্যরকম, তিথিকে সুন্দর মানাবে।'

মৌসুমী তিথির গায়ে কনুই দিয়ে আলতো গুঁতো মারল। এক চোখ টিপে ফিসফিস করে বলল, 'এই, বড়দা তোকে কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে রে!'

তিথির বুক থেকে গলা অবধি ছোট্ট একটা ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, সে গুটিয়ে গেল না, আড়ষ্ট হয়ে উঠল না। তার চোখ নীচের দিকে, সে চুড়ি দেখছে, কিন্তু বেশ বুঝতে পারছে পার্থর দৃষ্টি তাকে ছুঁয়ে আছে। এটা বুঝেও ঠিক ইচ্ছে করে নয়, বরং কেমন আপনাআপনিই তার চোখ উঠে এল পার্থর চোখে, এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ। তিথি একটা ঝাঁকুনি খেয়ে গেল। এরকম আগে তার কখনো হয়নি। সব কিছুই স্বাভাবিক, পার্থর সঙ্গে তার যথেষ্ট দূরত্ব, চোখ থেকে চোখে এই বিদ্যুৎ বয়ে গেল কী করে! তবে কি এমন হবে জেনেই সে চোখ তুলেছিল? এসব কী হচ্ছে? কী হতে চলেছে?

পার্থ চুড়ির দাম দিয়ে দিল। তিথি ঝাঁকুনিটা সামলে নিয়েছিল। আপত্তি করে বলল, 'না না, আমার কাছে আছে—' বলতে বলতে সে ব্যাগ খুলে টাকা বার করছিল।

'দুর, বড়দা আমাদের কিনে দিচ্ছে, তুই দিবি কেন?' মৌসুমী এক ফুঁয়ে ওর আপত্তি উড়িয়ে দিল।

তিথির তবু অস্বস্তি হচ্ছিল। প্রায় অচেনা, সদ্যপরিচিত কারও কাছ থেকে উপহার পেতে সে অভ্যস্ত নয়, এরকম হয়নি কখনো এর আগে। অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'সে তোরটা পার্থদা দিতে পারে, আমারটার দাম আমি—'

মাঝপথেই থেমে যেতে হল, কেননা তার মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই পার্থ তার দশ টাকার নোট ধরা হাতটার ওপর হাত রেখেছে। মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'ছি, এরকম করে না।'

তিথি চকিতে মুখ তুলতেই আবার চোখাচোখি হল। আবার বিদ্যুৎ। আগের বারের মতো অত তীব্র নয়। কোমল। তিথি চোখ সরিয়ে নিল না, হাসল। বড়ো হওয়ার পর এই প্রথম কোনো যুবকের চোখের দিকে এমন সরাসরি তাকিয়ে হাসল সে। মুখের সামনে হাত আড়াল করল না।

তিথির মনে হয়েছিল সে হঠাৎ এমন বদলে গেল কী করে! আসলে কিন্তু তার ভুল মনে হয়েছিল। সে একদিনে তো বদলায়নি, তার পরিবর্তন এসেছিল অনেক দিন ধরে ধীরে ধীরে। কোনো একটি দিনের কোনো একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে নিজের সেই পরিবর্তন লক্ষ করেছিল। এ যেন নিজের কাছেই একটা আবিষ্কার। প্রেম এসেছিল বলে সে বদলে যায়নি। সে বদলে গিয়েছে বলেই প্রেম এসেছিল।

এই বদলটা খুব নিঃশব্দে আর ভেতরে ভেতরে এসে পড়লেও, এটা কিন্তু তার অভ্যন্তরীণ কোনো বদল ছিল না। সে যেন সাপের

মতো খোলস ছেড়েছিল। ছোটোবেলা থেকে নিজের চেহারা সম্বন্ধে বদ্ধমূল একটা সচেতনতা তাকে স্বেচ্ছানির্বাসনে সবসময় ঘিরে রাখত। এর মূল কোথায় কে জানে! হয়তো পরিবারের লোকজন, আত্মীয়, প্রতিবেশীদের কৌতুক আর বিরূপ মন্তব্যই হবে। হয়তো যে মেয়েটি ছোটোবেলা থেকেই রোগা কালো দাঁত-উঁচু আর অমিশুক স্বভাবের, তার এই অভিজ্ঞতাই স্বাভাবিক। হয়তো সে বাড়াবাড়ি–রকমের স্পর্শকাতর।

আজও সেই স্পর্শকাতরতা থেকে সে ভেতরে ভেতরে মুক্ত নয়, কিন্তু বাইরে, নিজেকে বহন করার একরকম কায়দা সে রপ্ত করেছে। সে নিজের অজান্তেই নিজের চেহারা নিয়ে ঠাট্টা করতে শুরু করেছে। সে দেখেছে, নিজের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে সেটা মন্ত্রের মতো কাজ করে।

স্কুল থেকেই সে এটা বুঝতে শিখেছিল। তার বদলে যাওয়ার আরও একটা সূত্র ছিল তার আঁকা। যে–কোনো অনুষ্ঠানে স্কুলের হলঘরে করিডোরে আর সিঁড়িতে আলপনা দিতে তারই সবার আগে ডাক পড়ত। আলপনা দিতও সে দেখার মতো। আলপনা দিতে দিতে, দেওয়ালে নিজের হাতে আঁকা ছবি টাঙাতে টাঙাতে তিথি ভাবত সে নিজে সুন্দর নয় তাতে কী হয়েছে, সে তো পারে তার চারপাশকে সুন্দর করে সাজাতে। এই ভাবনার মধ্যেই হয়তো লুকিয়ে ছিল তার নতুন মাথা-তোলা আত্মবিশ্বাসের বীজ।

নিজের সেই আত্মবিশ্বাসেরই চূড়ান্ত ছবি দেখতে পেয়েছিল তিথি, যখন তার মনে হয়েছিল সে সত্যি সত্যিই প্রেমে পড়ছে।

৪

বিশ্বনাথ মিত্রকে বাইরে থেকে দেখে যেমন অকিঞ্চিত্‌কর ছাপোষা গেরস্থ মনে হয়, তেমনটা আসলে তিনি নন। এককালে যদিও তাইই ছিলেন। আজ এই ষাট বছর বয়সে পৌঁছে ব্যাঙ্কে তাঁর জমানো টাকার পরিমাণ নেহাত কম নয়। তার পুরোটাই সরকারি চাকরি আর টিউশনি করে, সেইসঙ্গে বাড়িভাড়ার টাকা। কিন্তু জীবনযাপনের ধরন তিনি বদলাতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিত্যনতুন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আমদানি করতে চেয়েছে সংসারে, কিছু কিছু সফলও হয়েছে, কিন্তু বিশ্বনাথ মন থেকে সেগুলি মেনে নিতে পারেননি। এজন্যে তাঁকে কৃপণ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু আসল ঘটনা হল এই যে, জীবনের শুরুতে প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করে নিজেকে একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যাস করেছিলেন। সেই অভ্যাস তাঁর মধ্যে এমন ঢুকে গেছে, যে আজ তার প্রয়োজন না থাকলেও তিনি তার থেকে বেরোতে পারেন না।

সরকারি অফিসে কেরানির চাকরিতে ঢুকেই বিশ্বনাথ সংকল্প করেছিলেন নিজের একটা বাড়ি করার। এটা ছিল তাঁর জেদ। সকাল সাতটা থেকে অফিস যাওয়ার আগে দুটো, আর পাঁচটার সময় অফিস থেকে বেরিয়ে আরও দুটো টিউশনি করতেন রোজ। রোববারেও কামাই ছিল না। লোকে নানা কথা বলে, কিন্তু তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়া এই দোতলা বাড়িটি তিনি বানিয়েছেন রক্ত জল করা পরিশ্রমের টাকায়, তার এক পয়সাও কেউ তাঁকে বিনাযুদ্ধে দেয়নি, তিনিও কোনো অসৎ উপায়ের সাহায্য নেননি। ততদিনে অদিতির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে তমালের আর মেয়ে তিথির জন্ম হয়েছে তাঁদের নিজেদের বাড়িতে।

অদিতি কিন্তু একান্ত সচ্ছল পরিবারের মেয়ে। অদিতির বাবা রমাপদ দত্ত খুলনা থেকে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিলেন ভাগ্যান্বেষণে। কালক্রমে তিনি সুন্দরবন অঞ্চলের সাতজেলিয়া নামে ছোট্ট একটা দ্বীপে এসে সংসার পাতেন। ওই দ্বীপটি ছিল স্কটিশ সাহেব

হ্যামিল্টনের নিজস্ব এস্টেটের অন্তর্গত। রমাপদ ওই এস্টেটে ম্যানেজারের চাকরি করতেন। হ্যামিল্টন সাহেবের পুরো নাম স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন। স্কটল্যান্ডেই থাকতেন। বছরে দু-একবার পরিদর্শন আর খাজনা আদায়ের কাজে আসতেন এস্টেটে। বাকি সময়টা সাতজেলিয়া দ্বীপে রমাপদ দত্ত ছিলেন সর্বেসর্বা। অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল তাঁর। সত্যিই তাঁর শাসনে সুন্দরবনে বাঘে গোরুতে একঘাটে জল খেত।

অদিতির ছোটোবেলা কেটেছিল সেই দ্বীপে। অন্যরকম পরিবেশে। সাধারণ গ্রামবাংলার সঙ্গে সেই পরিবেশের যেমন অমিল, শহরের সঙ্গেও তাই। হ্যামিল্টন সাহেব তাঁর এস্টেটের দ্বীপগুলিতে কমিউনের প্রচলন করেছিলেন। তিনি আসার আগে সাতজেলিয়া ছিল ঘন ম্যানগ্রোভ জঙ্গলে ঢাকা একটা আদিম নোনা দ্বীপ, চারদিকে সমুদ্রের মতো নোনা জলের বিশাল বিশাল নদী। সাহেব এখানে জঙ্গল কাটিয়ে বসতি করালেন। কয়েক ঘর চাষি নিয়ে এসে বসালেন, সেইসঙ্গে এক ঘর এক ঘর করে কামার, কুমোর, ঘরামি ইত্যাদি থেকে শিক্ষক, ডাক্তার অবধি। সাতজেলিয়া হয়ে উঠল একটি আদর্শ গ্রাম। সমবায়ের জন্য সেখানে যেমন কোনো প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব ছিল না, তেমনই মানুষের লোভও ছিল কম। ঈর্ষা নোংরামি বজ্জাতি থেকেও অনেক মুক্ত ছিল সেখানকার অধিবাসীরা। দ্বীপের জীবন এমনিতেই মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন আর স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়, দ্বীপের মানুষরাও সাধারণত স্বাধীন আর স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকে। যেমন সারা ইউরোপের সঙ্গে ইংল্যান্ডের আর সারা এশিয়ার সঙ্গে জাপানের বরাবর একটা পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। সেটা বোধ হয় এই দুটি দ্বীপরাষ্ট্র বলেই।

সেই স্বতন্ত্র ঘরানায় বড়ো হওয়া, প্রতিপত্তিশালী বাবার মেয়ে, রুচি এবং চিন্তাধারায় কিছুটা প্রত্যক্ষ বিদেশি প্রভাবে প্রভাবান্বিত অদিতি দুই দিদির সঙ্গে যখন কলকাতায় চলে আসেন, তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর। রমাপদ দত্ত বালিগঞ্জে বিরাট এক বাড়ি কিনেছিলেন ছেলেমেয়েদের কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করার জন্যই। তাঁর পক্ষে কাজকর্ম ফেলে কলকাতায় এসে থাকা সম্ভব ছিল না, অদিতির মা-ও আসতে পারেননি। কলকাতায় অদিতিদের অভিভাবক হয়ে এসেছিলেন তাদের জেঠিমা ভবতারিণী। জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুর পর থেকে যিনি এই পরিবারেই আছেন।

কলকাতায় ভবতারিণীর কাজ ছিল বালিগঞ্জের বাড়িতে সংসার সামলানো, মেয়েদের আগলানো আর দু-তিনদিন অন্তর অবসরমতো টালিগঞ্জে তাঁর সহোদর দিদি জগত্তারিণীর বাড়িতে এসে গল্পগুজব করা। দিদি বাড়ি থেকে বেরোতে পারতেন না, তাঁর বয়স হয়েছে, তা ছাড়া বাতে প্রায় পঙ্গু।

জগত্তারিণীও বিধবা ছিলেন, থাকতেন ছেলেদের সংসারে। বিরাট গুষ্টি তাঁদের। দুই ছেলে, তাদের বউ। নাতিনাতনির সংখ্যা অঢেল। বড়ো ছেলে সুরথ শান্তশিষ্ট বোকাসোকা ভালোমানুষ। ছোটো সুধন্য ভয়ানক ধুরন্ধর, বিষয়বুদ্ধিতে ঘোড়েল। জগত্তারিণীর স্বামী কেশবনাথ মারা যান দেশবিভাগের ঠিক আগে আগে। তখন তাঁরা পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুরের বাড়িতে। মৃত্যুর আগে কেশবনাথ সপরিবারে দেশত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। সেইমতো কলকাতার টালিগঞ্জে একটি মুসলমান পরিবারের সঙ্গে জায়গা জমির অদলবদল করে লেখাপড়াও করে রাখা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর জগত্তারিণী ছেলে ছেলের বউ নাতিনাতনির সঙ্গে এসে উঠলেন টালিগঞ্জের বাড়িতে।

বাড়িটা তখন ছোটোই ছিল। একতলা, সেইসঙ্গে অনেকটা খোলা জমি। সুধন্য অল্পদিনের মধ্যে খোলা জমিতে বাড়ি তুলল, একতলা বাড়ি তিনতলা করল। কয়েকটা ঘরে ভাড়া বসাল। বাস কিনল গোটা তিনেক, একটা পেট্রোল পাম্পও। বাস আর পেট্রোল পাম্প চালিয়ে রীতিমতো ফুলেফেঁপে উঠল। পাশাপাশি তার দাদা সুরথ কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারল না, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে সে এই বাড়িতে যেন ছোটোভাইয়ের একরকম আশ্রিত হয়েই রয়ে গেল।

এর মধ্যে একটা গভীর অন্যায় লুকিয়ে রয়েছে, জগত্তারিণী জানেন। কিন্তু কিছু বলতে পারেন না, কেননা তিনি নিজেই সুধন্যর আশ্রিত।

কেবলমাত্র ভবতারিণী যখন আসেন, দুই বোনে সুখদুঃখের কথা হয়। ভবতারিণীর কলকাতায় আসার পর তাঁদের সম্পর্কসূত্রে দুই পরিবারে বেশ একটা সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। বিশেষ করে, বহুদিন পরে মাসিকে দেখে সুধন্য বোধ হয় আত্মীয়তার টান

অনুভব করেছে। সেইসঙ্গে রয়েছে তিনটি তরুণী এবং তাদের মহিলা অভিভাবিকা সংবলিত একটি 'অসহায়' পরিবারের প্রতি কর্তব্যের অজুহাতও। সুধন্য সেখানে বেশ ঘনঘনই যাওয়া আসা শুরু করছে।

সেদিন দুপুরে জগত্তারিণী নির্জনে বোনকে বললেন, 'ভব, সুধন্য তোদের ওখানে খুব যাতায়াত করছে দেখছি। একটু সাবধানে থাকিস।'

ভবতারিণী অবাক হলেন। দিদির মুখে নিজের ছেলের সম্বন্ধে এ কী কথা! সুধন্যর কি তবে মেয়ে সংক্রান্ত দোষ-টোষ আছে নাকি? বিস্ময়ের গলায় বললেন, 'কেন দিদি, সুধন্য কি—'

'ওর গতিক সুবিধের নয়। একে তো তোর ওপরে তিন-তিনটে দেওরঝির দায়িত্ব। কিন্তু আমি সে-কথাও বলছি না।'

'তবে?'

'টাকাপয়সার ব্যাপারে ওর সঙ্গে কোনো আলোচনা করিস না, ওর পরের সম্পত্তির দিকে খুব চোখ। বিশেষ করে অসহায় মেয়েমানুষদের সম্পত্তি দেখভাল করার নাম করে হাত করতে চায়। তোর দেওর যদিও আছে, কিন্তু সে তো এখানে থাকে না, তাই বলছি আর কি, সাবধানে থাকিস। বাড়ির দলিলপত্র কি এখানে?'

'আমি ঠিক জানি না, বোধ হয় তাই।'

ভবতারিণীর বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। সুধন্যকে তিনি খুব ছোটোবেলায় দেখেছিলেন। তারপর এই দেখা। ওকে দেখে তাঁর ভালোই লেগেছিল। মাসিমা মাসিমা করে ডাকাডাকি করে, খোঁজখবর নেয়। মুখের কথা খুব মিষ্টি। তাঁর দেওরঝিদের সঙ্গে এরই

মধ্যে ভাব করে ফেলেছে। সবসময় বলে, ‘কলকাতায় এসে পড়েছ, তোমাদের কোনো চিন্তা নেই। অসুবিধে হলেই আমায় বলবে।’ সেই ছেলে এই জিনিস! সে–কথা আবার বলছে তার নিজের মা-ই। ভবতারিণীর দিদির কথা ভেবে কষ্ট হল। জগত্তারিণীর মুখ দেখে তাঁর মনে হল দিদির যেন আরও কিছু বলার আছে।

জগত্তারিণী মাদুরের ওপর কাত হয়ে শুয়েছিলেন। ভবতারিণী এসে তাঁর পায়ে তেল মালিশ করে দিয়েছেন অনেকক্ষণ ধরে, এখনও দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখলেন দিদির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। বোনের দিকে না তাকিয়ে চাপা স্বরে বললেন, ‘সবই তো জানি আমি। সুধন্য যে কী ধাতু দিয়ে গড়া—নিজের বড়োভাইকেও—’

ভবতারিণীর যে একটু সন্দেহ হত না তা নয়। তিনি জানতেন এই বাড়ি ছিল কেশবনাথের সম্পত্তি, তাঁর দেশের বাড়ির বিনিময়ে পাওয়া। তাহলে এখন এই বাড়িতে স্বাভাবিকভাবে সুরথ সুধন্য দুই ভাইয়েরই অধিকার থাকা উচিত। অথচ সুরথ থাকে পরাশ্রিতের মতো। ভবতারিণী দিদিকে চেপে ধরলেন, ‘ছেলের নামে এত বড়ো কথা বলছ দিদি, তুমি ঠিক জানো তো?’

জগত্তারিণী আর মুখ খুলতে চাইছিলেন না। মনের দুঃখে হঠাৎ যেটুকু বলে ফেলেছেন তার চেয়ে বেশি বলে লাভ কী? তিনি জানেন সব। জানেন বলেই যন্ত্রণায় ছটফট করেন। কিন্তু কিছু করার তো নেই। করতে গেলে সুরথকে সপরিবারে পথ দাঁড়াতে হবে, হয়তো তাঁকেও।

কিন্তু তবু বলতে হল। একটু একটু করে কথা আদায় করে নিলেন ভবতারিণী দিদির কাছ থেকে। বলতে পেরে জগত্তারিণীরও বোধ হয় একরমক হালকা লাগছিল।

সুধন্যর যে স্বভাবচরিত্র ভালো নয় এটা সে বড়ো হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই জগত্তারিণী ধরতে পেরেছিলেন। কলকাতায় আসার পর সে কোথা থেকে কী উপায়ে টাকা রোজগার শুরু করল তা একটু-আধটু আঁচ করতে পারলেও তাঁর পক্ষে পুরোটা জানা

সম্ভব ছিল না। তবে সেটা যে খুব সাদাপথে নয়, এও তিনি বুঝতে পারতেন।

সুধন্য একটা বাস কিনল। একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে তিনটে। বাস চালানোর ব্যাবসায় নিশ্চয়ই খুব লাভ হয়। তারপর সুধন্য একটা পেট্রোল পাম্প কিনে দাদাকে এসে বলল, ‘তুমি তো বসেই আছ, তার চেয়ে পেট্রোল পাম্পটা দ্যাখো। টাকাপয়সার হিসাব তোমায় দেখতে হবে না, তুমি শুধু ওখানে গিয়ে বসবে। এর জন্যে আমি মাসে মাসে তোমাকে কিছু দেব।’

সুরথ দেশে থাকতে প্রাইমারি স্কুলে মাস্টারি করত। কলকাতায় এসে কোনো কাজ জোটাতে পারেনি। ভাইয়ের কথায় রাজি হওয়া ছাড়া তার আর কিছু করারও ছিল না।

সুরথ পেট্রোল পাম্পে গিয়ে বসতে লাগল। লোকেরাই কাজকর্ম করে, গাড়ি এলে তেল ভরে দেয়, টাকাপয়সা নেয়। সুরথ মন দিয়ে তাদের কাজকর্ম দেখে। এটাই তার কাজ। তার মনে হয় সব ঠিকঠাকই চলছে, কোনো বেচাল নেই। হিসাবের ব্যাপারটা তার দেখার দরকার নেই, ওটা সরাসরি সুধন্যই কর্মচারীদের কাছ থেকে বুঝে নেয়। সুরথের কাজটা অনেকটা নজরদারির। সে জানত না তার নজরের আড়ালে সুধন্যই এই পেট্রোল পাম্পে একটা বেআইনি ব্যাবসা চালাচ্ছে, চোরাই পেট্রোলের কারবার।

জানল, যখন একদিন পেট্রোল পাম্পে পুলিশ এল। সুরথকে থানায় যেতে হল। তখনই সুরথ আর একটা ব্যাপার জানতে পারল যেটা জেনে তার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। পেট্রোল পাম্পটা সুধন্য কিনেছিল তার নিজের নামে নয়, সুরথেরই নামে। সে বুঝতে পারল, পুলিশ তাকে সহজে ছাড়বে না, জেলও হয়ে যেতে পারে।

থানায় গিয়ে সুরথকে ছাড়িয়ে আনল সুধন্য। বাড়ি এসে বলল, ‘চিন্তা কোরো না। আমি সমস্ত সামলে নিচ্ছি। আমাকে ফাঁসানোর জন্যে কেউ মিথ্যে নালিশ করেছে। কিন্তু আমার অনেকের সঙ্গে চেনাজানা আছে। দেখছি কী করা যায়, তুমি এটাতে একটা সই দিয়ে দাও।’

সুধন্যর হাতে একটা সাদা কাগজ। সুরথের তখন কোনো চিন্তা করারও মানসিক অবস্থা ছিল না। ভয়ে আশঙ্কায় দুশ্চিন্তায় তার আধমরা দশা। এসব সময়েই মানুষ সাদা কাগজে সই করে ফ্যালে। তবু সুরথ একবার ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এটা কী?'

'একটা চিঠি লিখতে হবে পুলিশের বড়োকর্তাকে, ব্যাপারটা যাতে মিটে যায় সেজন্য। ভালো করে ভেবে গুছিয়ে লিখতে হবে। সে হয়ে যাবে, ভেবো না। সইটা তোমাকেই করতে হবে কেননা পেট্রোল পাম্পটা তো তোমার নামে।'

সুরথ আর কথা বাড়ায়নি। সই দিয়ে দিয়েছিল। তার মাথায় একবারের জন্যেও আসেনি যে গোটা ব্যাপারটাই একটা সহজ ধাপ্পা। ছেলেমানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার মতোই ভীষণ সোজাসাপটা একটা ষড়যন্ত্র। সে সুধন্যর কথার ওপর নির্ভর করে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে কাটানোর পর যখন দেখল সত্যি সত্যি পুলিশ তাকে নিয়ে আর টানাটানি করল না, সে নিশ্চিন্ত হল। সুধন্যর কর্মকুশলতার জন্যে তার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল তার, কৃতজ্ঞতাও।

তারপর একদিন, সুধন্য সুরথকে একটা কাগজ দেখাল। একটা হ্যান্ডনোট। তলায় সুরথের সই। ওপরে সুরথের জবানিতে যা লেখা আছে তার মর্ম এই যে, পেট্রোল পাম্প সংক্রান্ত মামলায় টাকা প্রয়োজন হওয়াতে সুরথ সুধন্যর কাছে পেট্রোল পাম্প এবং তার নামে এই বাড়ির যে অংশটা, সেটি বন্ধক রেখে তিরিশ হাজার টাকা ধার করেছে। আগামী সাত বছরের মধ্যে এই দেনা শোধ না করতে পারলে সমস্ত সম্পত্তি সুধন্যর অধিকারে চলে যাবে।

এ সমস্ত ঘটনা জগত্তারিণীকে কেউ বলেনি। তিনি কিছুটা দেখেছিলেন, কিছুটা আড়ি পেতে শুনেছিলেন, বাকিটা তাঁর অনুমান। ঠিকঠাক অনুমান করতে তাঁর অসুবিধে হয়নি, কারণ নিজের দুই ছেলেকেই তিনি ভালোমতো চিনতেন।

সুরথও এসব কথা বছর দুয়েক পরে একজনকেই শুধু বলেছিলেন। তাঁর বড়ো ছেলে বিশ্বনাথকে। বিশ্বনাথের মা নেই। ওর আড়াই বছর বয়সে সুরথের প্রথম স্ত্রী মারা যান। মাতৃহীন ছেলেটির প্রতি সেই থেকে সুরথের অতিরিক্ত স্নেহ। দেশেঘরে যা হয়ে

থাকে, ‘বাচ্চাটাকে কে মানুষ করবে’ এই অজুহাতে মায়ের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুরথকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে হয়। এপক্ষে তাঁর মোট চারটি সন্তান। তাদের সঙ্গে সুরথের হৃদয়ের তেমন যোগ নেই, ছেলেমেয়েগুলোও তাদের মায়ের মতো নির্বোধ আর ঝগড়াটে। সুরথের স্ত্রী, বিশ্বনাথের সৎমা কমলা সবসময়ই বিশ্বনাথকে লক্ষ্য করে বলে থাকেন, ‘ওই ছেলেই হল আপনার জান, আর আমরা সবাই ভেসে এসেছি।’

কথাটা একদিক দিয়ে সত্যি। বিশ্বনাথের ওপর সুরথের কেমন একধরনের মানসিক নির্ভরতা রয়েছে। ভাগ্যহত বৃদ্ধ পিতা সম্ভবনাময় পুত্রের ওপর যেভাবে নির্ভর করেন। বিশ্বনাথ পড়াশোনায় ভালো, অসম্ভব পরিশ্রমী, সৎ, সুরথ তাকে ঘরে এনে দরজা বন্ধ করে সব কথা বলে বললেন, ‘তোমাকে বললাম এইজন্যেই যে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এ বাড়ি আর আমাদের নয়। সুধন্য আমার এমন সর্বনাশ করতে পারে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। কিন্তু ঈশ্বর আমায় এমন কোনো জোর দেননি যাতে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমি টুঁ–শব্দটিও করতে পারি...’ সুরথ কেঁদে ফেলেছিলেন।

বিশ্বনাথ অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। বোধ হয় সে সর্বনাশের একটা পরিমাপ করবার চেষ্টা করছিল মনে মনে। তারপর মুখ তুলে শান্ত কঠিন স্বরে বলল, ‘আপনি আমায় কী করতে বলেন বাবা?’

‘আমার মনে হয় সুধন্য হয়তো আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে না। কিন্তু কিছু বলা তো যায় না। তোমার অতগুলি ভাইবোন, বোনেদের বিয়ে দেওয়া বাকি। তাড়িয়ে দিলে আমরা যে পথে বসব।’

বিশ্বনাথ চিন্তা করেছিল। আদালতে নালিশ করার সাধ্য তাদের নেই এ কথা সে খুব ভালো করেই জানে। প্রথমত, অত খরচ আসবে কোত্থেকে। দ্বিতীয়ত, তাদের কাছে কোনো প্রমাণও নেই যে সত্যিই সুরথ বাড়ির অংশ বাঁধা রেখে টাকা নেননি। তার থেকেও বড়ো কথা, তাদের পুরো পরিবারটা কাকার ওপর নির্ভরশীল। তার নিজের কয়েকটা টিউশনি ছাড়া তাদের নিজস্ব কোনো উপার্জন নেই। মামলা করলে কাকা তাদের মারতে মারতে বাড়ি থেকে বের করে দেবে।

বিশ্বনাথ তখন পড়ছে। সামনেই তার বিএসসি ফাইনাল। সে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘বেশ, আমি কাল থেকে চাকরি খুঁজব।’

‘ন্ না!’ সুরথ যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, ‘তুই পরীক্ষাটা দিয়ে নে, পাশ করে নে। ততদিন আমরা অপেক্ষা করতে পারব, এত শিগগির করে কিছু হবে না।’

‘হবে না, সে–কথা এত জোর দিয়ে কী করে বলতে পারছেন?’

‘হ্যাঁ পারছি।’ সুরথের গলায় কেমন একরকম মরিয়া ভাব ফুটে উঠেছিল, স্বভাববিরুদ্ধ দৃঢ় গলায় বলেছিলেন, ‘যাই হোক না কেন, তুমি পরীক্ষা দেবে।’

বিশ্বনাথ পরীক্ষা দিতে পেরেছিল। পরীক্ষার ফি জোগাড় করেছিল বন্ধুদের কাছে ধার করে। কিন্তু তার আশঙ্কা সম্পূর্ণ মিথ্যে হয়নি। পরীক্ষার একমাস আগে থাকতে সুধন্য নানারকম উত্পাত শুরু করলেন। এ বাড়িতে সুরথের অংশ বলতে যা ছিল তা হল ফরিদপুরের সম্পত্তির বদলে পাওয়া পুরোনো বাড়ির দুটো ঘর। অধিকার হারালেও আশ্রিত হয়ে সুরথ এই দুটি ঘর নিয়েই থাকতেন। তার একটা বড়ো, আর একটা খুব ছোটো। এই ছোটো ঘরটি ছিল বিশ্বনাথের। এখানেই তার থাকা শোয়া পড়াশুনো। বড়ো ঘরে মা বাবা এবং ছোটো ভাইবোনেরা। আসলে, আশ্রিতদের একজন হয়েও বিশ্বনাথ তাদের থেকেও বিচ্ছিন্ন ছিল, অনেকটা যেন ব্রাত্য, একা। পরীক্ষার কিছুদিন আগে সুধন্য বললেন তার ঘরটা ছেড়ে দিতে।

কেন, কী প্রয়োজন এ সমস্ত প্রশ্ন তোলারই কোনো প্রশ্ন ছিল না। বিশ্বনাথ বইখাতাপত্র নিয়ে নেমে গেল একতলার একটা গ্যারেজে। সেখানে একটাই ঘুলঘুলি, হাওয়া আসে না, আলো আসে না। ওইখানে থেকেই সে পরীক্ষা দিল, পাশ করল, চাকরিও পেল একটা। প্রতিমুহূর্তে একটাই ভয় পেতে পেতে—এই বুঝি কাকা তাদের পুরো পরিবারটাকে নামিয়ে দিলেন পথে।

এইরকম অবস্থাতেই বিশ্বনাথের অদিতির সঙ্গে আলাপ। তার পরের ঘটনাগুলি আরও দ্রুত। বাড়ি বন্ধকের সাত বছর কেটে যাওয়ার পর তিনি জানতেন যে-কোনো দিন কাকা তাঁদের তাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তার আগেই সুরথ সেই অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশ এড়ালেন হঠাৎ মারা গিয়ে। তার তিন মাসের মধ্যে কমলাও। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েগুলোকে চাইলে সুধন্য বের করে দিতে পারতেন হয়তো, কিন্তু বিশ্বনাথ কাকাকে গিয়ে বললেন সংসার খরচের অর্ধেক তিনি দেবেন। তাঁদের আর কয়েকটা বছর এখানে থাকতে দেওয়া হোক।

এই কয়েকটা বছরে বিশ্বনাথ দুই বোনের বিয়ে দিয়েছেন। দুই ভাই-ও কোনোরকমে মোটামুটি লেখাপড়া করে কাজেকর্মে ঢুকে গেছে। তারপর বিশ্বনাথের সময় হয়েছে অদিতিকে বিয়ে করার। ওঁদের প্রেম নিয়েও ডামাডোল কম হয়নি। সুধন্য চেষ্টা করেছিলেন বিয়ে ভেঙে দেওয়ার। ততদিনে অদিতির মা-বাবা কলকাতায় এসে গেছেন। তাঁরা সব জেনেও বিশ্বনাথকে পছন্দ করেছিলেন তাঁর সৎ পরিশ্রমী স্বভাবের জন্য। অদিতির মা সুধন্যকে বলে দিয়েছিলেন, ‘আমার মেয়ে আপনাদের বউ হতে চলেছে যে, এ শুধুমাত্র বিশ্বনাথের জন্য। আপনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই, আপনি আর এখানে আসবেন না।’

বিয়ের পর মাত্র দেড় বছর বিশ্বনাথ অদিতি ভাড়াবাড়িতে ছিলেন। এই দেড়বছরেই অমানুষিক কষ্ট করে তৈরি হয়েছিল নতুন বাড়ি। বিশ্বনাথ খুব ভালোই জানেন, অনেকটাই তিনি একা লড়েছেন সত্যি, কিন্তু শেষপর্যন্ত অদিতিকে পাশে না পেলে হয়তো এত কিছু সম্ভব হত না।

৫

বাস থেকে নেমে দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালাচ্ছিল তিথি। ন–টা বেজে গেছে। অনেক দিনই তার বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছে আজকাল। বাড়িতে সেজন্য বকাঝকাও খেতে হচ্ছে। তাও ভাগ্য ভালো দাদা এখন বাড়ি নেই, শিবপুরে কলেজের হোস্টেলে চলে গেছে। তমাল বোনের এমন পাখা গজিয়েছে দেখলে ছেঁটে দিতে দেরি করত না। মা-বাবাকে তিথি ততটা ভয় পায় না, কিন্তু বকা খেতেও তার ভালো লাগে না। তবুও খেতে হচ্ছে। এর চাইতেও দুঃখের কথা, তিথি আজকাল বাধ্য হয়ে আরও একটা কাজ করছে, যেটা করতে তার সত্যি সত্যিই ভেতরে ভেতরে খুব খারাপ লাগে, কষ্ট হয়। তিথি বাড়িতে মিথ্যে কথা বলছে। বাড়ি ফিরতে দেরি হলে সে কোনোদিন বলে ক্লাস শেষ হতে দেরি হয়েছে। ফিল্ডওয়ার্ক ছিল। কোনোদিন বলে লাইব্রেরিতে পড়ছিল, কোনোদিন বলে বন্ধুর বাড়িতে গেছিল। আসলে ওই দিনগুলিতে পার্থর সঙ্গে দেখা করে সে।

পার্থর সঙ্গে কী করে যে হু হু করে সময় কেটে যায়, তিথি বুঝতেই পারে না। ঘনঘনই দেখা হয় তাদের, অথচ কথা যেন আর ফুরোয় না। অবশ্য, সবসময় তারা শুধু কথাই বলে, তা তো নয়, চুপ করে কাছাকাছি বসেও তো থাকে অনেক সময়, নন্দনের পুকুরধারে বসে বসে জলে সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের চূড়ার ছায়া ভাসতে দেখে। পাশাপাশি উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটে এপথ–সেপথ, এগলি–সেগলি। সে-সমস্ত রাস্তা তিথি কোনোটাই চেনে না, হয়তো পার্থও চেনে না। তারা শুধু হাঁটে এলোমেলো। সে পার্থর বাহু জড়িয়ে রাখে তার বাহু দিয়ে, পরস্পরের হাতের পাতা মুঠি করে ধরে রাখে দুজনে।

এরকম প্রেম তার জীবনে আসবে, তিথি কি কখনো ভেবেছিল! মৌসুমীর এরই মধ্যে দু-দুটো প্রেম হয়ে গেছে। এ ছাড়াও তার রূপমুগ্ধ পূজারির সংখ্যাও কম নয়। এখন যে ছেলেটির সঙ্গে ওর সম্পর্ক তার নাম রূপম। খুব সুন্দর দেখতে। মৌসুমী রবীন্দ্রভারতীতে ভরতি হয়েছে গান নিয়ে, সে ভালো গান গায়। রূপমও গায়ক, রবীন্দ্রভারতীতে মৌসুমীর সিনিয়র। ওদের দুজনকে পাশাপাশি দেখতে দেখতে তিথির মনে হয়েছে ওরা যেন রাজকন্যা আর রাজপুত্তুর, রূপকথার নায়ক-নায়িকা।

কিন্তু সে তো রাজকন্যা নয়। পার্থও যদিও রাজপুত্তুর নয়, তবে তার মুখচোখ মন্দ নয়। ছোটোখাটো চেহারা, মাথায় তিথির সমান, খুব রোগা। দাড়ি রাখে সে, মাথার চুল একটু পাতলা কিন্তু বড়ো বড়ো ঢেউ খেলানো। সেই পুজোয় দেখা হাওয়া থেকে আজ প্রায় ছ-মাস ধরে তিথি তাকে একই পোশাকে দেখে এসেছে। প্যান্টের ওপর সুতির রঙিন পাঞ্জাবি, পায়ে কাবলি চপ্পল, কাঁধে ঝোলা। তিথির এই সবই খুব ভালো লাগে।

আর ভালো লাগে ওর কথা শুনতে। পার্থ যে কত কথা জানে আর কত কথা বলে...তিথি সে সমস্ত অবাক হয়ে শোনে। পার্থ অনেক বই পড়ে, সে সব বইয়ের গল্প বলে তাকে। তিথি ওইসব বই একটাও পড়েনি শুধু নয়, অধিকাংশের নামই শোনেনি সে। তা ছাড়া সিনেমার গল্প—এই সিনেমা ঠিক তিথির জানাচেনা সিনেমা নয়। যদিও তিথি সিনেমা দেখেছে খুব কম, ছোটোবেলায় বছরে একবার, মা-বাবার বিয়ের দিন সবাই মিলে হলে গিয়ে সিনেমা দেখা হত। এখন সেও আর হয় না। আর টিভি আসার পর থেকে তো শনি-রবিবারে বাড়িতেই সিনেমা দেখা যায়। তিথি মাঝে মাঝে দেখে, কোনো-কোনোটা ভালোও লাগে, সব নয়। কিন্তু পার্থ যেসব সিনেমার নাম বলে তিথি এর আগে তার নাম শোনেনি। পার্থ সিনেমা বলে না, বলে ছবি। আর নায়ক নায়িকার কথা বলে না, বলে পরিচালকদের কথা—কী সব নাম, বার্গম্যান, বুনুয়েল, ফুকো, ফেলিনি, ঋত্বিক ঘটক। এক সত্যজিৎ রায় ছাড়া অ্যাদ্দিন তিথি কোনো পরিচালকের নাম জানত না।

পার্থ যখন ওইসব পরিচালকদের তৈরি ছবির কথা বলে, ওর মুখচোখ কেমন পালটে যায়। চোখ দুটো কেমন উদাস, দৃষ্টি যেন অনেক অনেক দূরে। সেই অত দূর থেকেই যেন তার গলা ভেসে আসে, 'আমি এইরকম ছবি বানাতে চাই তিথি, এই সব স্বপ্নের ছবি। খুব, খুব কঠিন কাজ,...কিন্তু দেখো, আমি পারব...'

তিথি পার্থর সব কথা পুরোপুরি বুঝতেই পারে না। শুধু এইটুকু বোঝে, পার্থ কোনো বিরাট স্বপ্নের কথা বলে, দুরূহ মহৎ কোনো লক্ষ্যের কথা। পার্থর চোখের চাহনিতে, তার গলার স্বরে, এলোমেলো চুলে, রোগা হাতে, নরম কাপড়ের পাঞ্জাবির হাতায়, তার

মলিন কাঁধ-ব্যাগে সেই স্বপ্ন লেগে আছে, তিথি দেখতে পায়। তিথি সেই স্বপ্নগুলোকে ছুঁতে চায়। সে জানে, এত বড়ো আর উঁচু স্বপ্নদের ছোঁয়া তার পক্ষে হয়তো সম্ভব নয়, সে তাই পার্থকেই আরও প্রবলভাবে ছুঁতে চায়। গভীর আবেগে তার পাঞ্জাবির হাতা আঁকড়ে ধরে মনে মনে বলে, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিক পারবে, তুমি অনেক বড়ো হবে...আমি জানি...'

তিথি বুঝতে পারে পার্থ ভীষণ আলাদা, সে যেন অন্য কারও মতো নয়। এই অন্যরকম ছেলেটি তাকে ভালোবাসে, তাকেই। তার প্রেমিক! তারও একজন প্রেমিক আছে! সেই প্রেমিক তিথির জন্যে অপেক্ষা করে, তার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়, তারই হাতে ঠোঁট ছুঁইয়ে বলে, 'আমি যদি ডাক দিই, তুমি আসবে তো?'

এই কথাটা তিথির শুনতে খুব ভালো লাগে, কিন্তু কথাটার মানে তার কাছে ঠিক পরিষ্কার নয়। কথাটা পার্থ প্রায়ই বলে। আজও বলেছে।

তিথি আজকাল কলেজে খুব ক্লাস বাঙ্ক করছে। পার্থর সঙ্গে যেদিন দেখা হওয়ার কথা থাকে, সেদিন সে শুধু সকালের দিকের ক্লাসগুলোই করে। দুপুর নাগাদ পার্থ চলে আসে কলেজের সামনে। ওরা একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। আজ ওরা ইডেনে গিয়ে বসেছিল। তিথি এখানে আগে আসেনি। তার খুব ভালো লাগছিল। কী সুন্দর সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ, মাঠটা আবার অল্প ঢেউ তোলা। লম্বা লম্বা ঘন পাতাওয়ালা সব গাছ, তাতে হাওয়া লেগে ঝিরঝির শব্দ হচ্ছে। একেই তো মর্মর বলে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে কিন্তু মেঘলা নয়। সচল মেঘগুলো সূর্যকে এক–একবার ঢেকে দিচ্ছে, আবার সরে যাচ্ছে। সারা মাঠটার বুকে খেলে যাচ্ছে সেই ভাসমান মেঘেদের ছায়া। বাগানে ঢোকার সময় প্যাগোডার মতো ছাউনি দেওয়া একটা ঘর চোখে পড়েছিল তিথির। এখন মাঠে বসে অন্য পাশে গাছপালার আড়ালে একটা ছোট্ট কাঠের সাঁকো চোখে পড়ল তার। বাঃ কী চমৎকার জায়গা! তিথি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠল, 'কলকাতায় এরকম একটা সুন্দর বাগান আছে আমি জানতামই না। আগে কখনো আসিনি এখানে।'

পার্থ ঘাসের ওপরে আধশোয়া হয়ে সিগারেট ধরাচ্ছিল। ঠোঁটে সিগারেট চেপে হাত আড়াল করে দেশলাই জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, 'তুমি এর আগে প্রেম করতে?'

'যাঃ!' তিথির কান গরম হয়ে উঠল, লজ্জায়।

'তাহলে আসবে কী করে? এখানে শুধু প্রেমিক প্রেমিকারাই আসে।'

তিথি মুখ নীচু রেখে অল্প অল্প হাসছিল। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, 'তুমি তবে কার সঙ্গে এসেছিলে?'

'আমি এসেছিলাম কে বলল?'

'এসেছিলে নিশ্চয়ই, নইলে তুমি জায়গাটা চিনলে কী করে?'

পার্থ হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে তিথির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে পেল, তিথিও হাসছে, কিন্তু তার চোখে যেন একটুকরো ছায়া ভেসে এসেছে, তার মুখ অবিকল এই রোদছায়া ভাসা মাঠটার মতো। পার্থ একটা নিশ্বাস ফেলে ঘাসের ওপর চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। মিনিট খানেক চুপচাপ সিগারেট টানল। সে বুঝতে পারছিল, তিথি উত্তরের প্রতীক্ষা করছে।

পার্থ আকাশের দিকে চোখ রেখে বলল, 'না, এখানে আমি একাই এসেছিলাম। কিন্তু আমি স্বীকার করছি, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে আমার অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল।' পার্থ তিথির দিকে মুখ ফেরাল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে তিথির ঘাসে লুটিয়ে থাকা কামিজের কোনা মুঠি করে ধরে আকুল স্বরে বলল, 'প্লিজ তিথি, দুঃখ পেয়ো না। বিশ্বাস করো, ওটা শেষ হয়ে গেছে, তুমি আসার আগেই সেসব ফুরিয়ে গিয়েছিল।'

তিথি মুখ তুলতে পারছিল না। গলার কাছে প্রবল ব্যথা, চোখ জলে ভরে আসছে। কিন্তু এটা ঠিক দুঃখে বা অভিমানে নয়। পার্থ তার থেকে প্রায় বারো বছরের বড়ো। তিথিই তার প্রথম প্রেম, এমন না হওয়াটাই স্বাভাবিক, তিথি জানত। সে মৌসুমীকে জিজ্ঞেসও করেছিল। মৌসুমী কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু আজ, নিজের অজান্তে কেমন আপনা থেকেই একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেল, যাতে সেও প্রশ্নটা করে ফেলল, আর পার্থও স্বীকারোক্তি দিল। এই পুরো ঘটনাটার একটা অন্তর্নিহিত অভিঘাত ছিল। এর মধ্যে ছিল একটা নাটকীয় রোমাঞ্চ আর গভীরতা, যা তিথির শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল। পার্থর কাতর স্বর তখনও তার কানে আসছিল, ‘প্লিজ তিথি, আমায় ক্ষমা কোরো। কী করব, তোমার সঙ্গে দেখা হতে আমার যে বড়ো দেরি হয়ে গেল...’

তিথির ইচ্ছে করছিল পার্থর বুকের ওপর সে এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণভরে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, ‘কিচ্ছু দেরি হয়নি, যা হয়ে গেছে যাক, এসো আমরা পাগলের মতো ভালোবাসি।’

আবেগে তিথির স্বর ফুটছিল না। পার্থ তখনও আঁকড়ে আছে তার জামা। সেই হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে পিষতে পিষতে তিথি ভাঙা গলায় শুধু বলতে পেরেছিল, ‘না না, এমন কোরো না। আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।’

পার্থ ধড়মড় করে উঠে বসেছিল। সজোরে তিথির দুটো হাত টেনে নিয়ে তাতে নিজের মুখ চেপে ধরে যেন ডুকরে উঠেছিল, ‘ওহ্ তিথি, আমার ছোট্ট তিতির পাখি, আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি সোনা! তুমি—তোমার কাছে—তুমিই আমার শেষ গন্তব্য।’

এর পরেও ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ছিল ওই মাঠে। পার্থ তার সেই পুরোনো প্রেমের কথা বলছিল। তার দুঃখ পাওয়ার কথা। সেই মেয়েটি, সুদক্ষিণা, সে নাকি পার্থর সঙ্গে পাঁচ বছর রীতিমতো গভীর ভালোবাসার পর হঠাৎ অকারণে তাকে ছেড়ে যায়। এক ডাক্তারকে বিয়ে করে সুদক্ষিণা এখন দিব্যি সংসারী। পার্থ আজও বুঝতে পারেনি, সুদক্ষিণা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কেন।

তিথি মন দিয়ে শুনছিল। শুনতে শুনতে তার বুকে টলটল করে উঠছিল মায়া, কূল ছাপানো প্রেম দিয়ে সে মনে মনে পার্থর সমস্ত ক্ষত ধুইয়ে দিতে চাইছিল। ভাবছিল, ইশ্, আহা রে, সে কখনো পার্থকে অমন দুঃখ দেবে না। কক্ষনো না।

পার্থ কথা থামিয়ে চুপ করে শুয়েছিল। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশের ঢালু গা বেয়ে। গাছে গাছে ঘরে ফেরা পাখিদের অবিশ্রান্ত তীক্ষ্ণ কলরব। তিথি দাঁতে ঘাস কাটছিল। বাড়ি ফিরতে হবে তাকেও, কিন্তু উঠতে ইচ্ছে করছে না। শেষপর্যন্ত পার্থই বলল, ‘চলো উঠি, অন্ধকার হয়ে আসছে।’

তিথি উঠে জুতোয় পা গলাল। নিজের জামার পেছনটা ঝাড়তে ঝাড়তে দেখল পার্থ উঠে দাঁড়িয়েছে, ওর সারা মাথায় কাঁধে পিঠে বড়ো বড়ো শুকনো ঘাসপাতা লেগে রয়েছে, চুলে একগুছি ঘাস ঝুলছে কপালের সামনে, পার্থর যেন খেয়ালই নেই। তিথি হাসতে হাসতে বলল, ‘এই, তোমার সারা গায়ে ঘাস, ওগুলো ফ্যালো।’

বলে সে নিজেই পার্থর কপাল থেকে সেই ঘাসের গুছিটা ফেলে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াল, পার্থ চমকে বলল, ‘কী!’

‘কী আবার, দেখতে পাচ্ছ না, এখানেও তো ঘাস লেগে আছে হাঁদারাম!’

তিথির হাতটা নিজের কপালে চেপে রেখে পার্থ বলল, ‘সত্যি করে বলো, আমি যদি তোমাকে কখনো ডাকি, তুমি আসবে তো?’

পার্থ কোথায় যাওয়ার কথা বলছে তিথি ঠিক বুঝতে পারেনি। পার্থ তো তাকে সেই ছ-মাস আগেই ডেকেছিল। তিথি তো সে ডাকেই সাড়া দিয়ে তার কাছে এসেছে। তবুও পার্থ এ কথাটা এভাবে বার বার বলে কেন?

তিথি অনিশ্চিত ভঙ্গিতে মাথা কাত করল, বলল, ‘যাব।’

ইডেন থেকে বেরিয়ে ওদের খুব খিদে পেয়েছিল। কাছাকাছি রাস্তার ধারে একটা দোকানে গিয়ে চাউমিন খেল দুজনে। খেতে গিয়েই আরও দেরি হয়ে গেল। তারপর বাস পেতে পেতেও সময় গেল খানিকটা। পার্থ তিথির সঙ্গে ওদের বাড়ির স্টপেজ অবধি এল। প্রতিদিনই সে এরকম আসে। তিথিদের বাড়ির গলিতে ঢোকে না, বাস থেকে নেমে রাস্তা ক্রস করে উলটোদিকের ফুটপাতে চলে যায়। সেখান থেকে অন্যদিকের বাস ধরে নেয় আবার। অন্যদিন বাস থেকে নেমেও দু-চারটে কথা বলে তারা। আজ তিথি আর দাঁড়াল না, গলিতে ঢুকে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল। ভয় ভয় লাগছে তার, কপালে আজ সত্যিই দুঃখ আছে।

৬

বিশ্বনাথ টিভি দেখছিলেন। রিটায়ার করার পর এটাই তাঁর একটা অকুপেশন। ব্যাপারটা নেশাতে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যে থেকে টিভি দেখেন সাড়ে আটটা অবধি, যতক্ষণ বাংলা অনুষ্ঠান চলে। তারপর 'ওভার টু ডেলহি' হয়ে গেলে টিভি বন্ধ করে দেন। হিন্দি প্রোগ্রাম তাঁর পোষায় না।

এই সময়টাতে কেউ তাঁকে বিরক্ত করে না, তিনিও কোনো ব্যাপারে মাথা দেন না। একমনে একাগ্র দৃষ্টিতে টিভির দিকে তাকিয়ে থাকেন। টিভিটা বসার ঘরেই রাখা। বাড়িতে এ সময়ে কেউ এলেও বিশ্বনাথ টিভি বন্ধ করেন না। একেই তিনি গল্প টল্প ভালো করতে পারেন না, কাজের কথা ছাড়া খুব একটা অন্য কথাটথাও বলেন না। বাড়ির লোকের সঙ্গেও না, বাইরের লোকের সঙ্গেও না। টিভি তাঁকে আরও অসামাজিক করে দিয়েছে। অদিতি বিরক্ত হন, ছেলেমেয়েরাও তাঁর টিভি দেখা নিয়ে মাঝেমধ্যে হাসি ঠাট্টা করে, কিন্তু বিশ্বনাথের ভ্রূক্ষেপ নেই।

অথচ মজার কথা হল, টিভিতে বিশ্বনাথের প্রবল আপত্তি ছিল। চারপাশে চেনাশোনা প্রত্যেকের বাড়িতে যখন টিভি এসে গেছে, বিশ্বনাথ তখনও টিভি কেনেননি। এ ব্যাপারে অদিতিরও সায় ছিল। টিভি এমন কিছু জরুরি জিনিস নয়, বরং ওতে কাজকর্ম পড়াশোনার ক্ষতিই হয়। তিথি আর তমালও ওদের সব বন্ধুদের বাড়িতে টিভি আছে তাদের কেন নেই এই নিয়ে কখনো অভিমান অভিযোগ করেনি। ওদের সে স্বভাবই নয়। তা ছাড়া, ছোটোবেলা থেকেই ওরা একটা নিপুণভাবে পরিচালিত কিন্তু সবরকম বিলাসিতাবর্জিত সংসারের মধ্যে বড়ো হয়েছে। প্রয়োজনের বাইরে যা, সেটা চাইতে নেই বা চাইলে পাওয়া যাবে না, এই বোধ তাদের তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তমাল বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে খেলা দেখত। আর তিথি সন্ধ্যেবেলা অঙ্ক কষতে কষতে পাড়ার কোনো একটা বাড়ির টিভি থেকে ভেসে আসা বিজ্ঞাপনের সুর শুনে আনমনা হয়ে যেত। তার কোনো অভাববোধ হত না, মনে হত, সুরটা যেন কোন দূরের একটা দেশ থেকে সমুদ্র পেরিয়ে কেঁপে কেঁপে ভেসে আসছে। কিংবা হয়তো, সুরটা পৃথিবীর

বাইরে কোনো নক্ষত্র থেকেই ঝরে পড়েছে।

তমাল যেবার ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চান্স পেল জয়েন্ট এন্ট্রান্সে, অদিতি স্বামীকে বললেন, 'শুনছ, তমু বলছে এবারে তো আমরা একটা টিভি কিনতে পারি।'

বিশ্বনাথের মনটা ছেলের কৃতিত্বে তৃপ্ত ছিল। তবু দু-একবার গাঁইগুঁই করেছিলেন, 'টিভি! ও বড়ো সর্বনেশে জিনিস, নেশা হয়ে যায়। তিথির সামনে মাধ্যমিক—'

'তাতে কী হয়েছে, আজকাল সব বাড়িতেই টিভি, তাদের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করছে না? আর তিথি টিভি দেখে পরীক্ষা খারাপ করার মেয়ে নয়।...অনেক দিনই তো হল, তমু অন্যের বাড়ি গিয়ে খেলা দেখে। ও বলছিল সামনে কী ক্রিকেট খেলাটেলা আছে...শোনো, তুমি আর না কোরো না।'

টিভি কেনা হল, একেবারে রঙিন টিভিই। বিশ্বনাথের মত হল, পয়সা যখন খরচ হচ্ছেই, তখন দেখেশুনে ভালো জিনিসটা কেনা ভালো।

তমাল খেলাটেলা থাকলে টিভি খোলে, সেও যখন সে বাড়িতে থাকে। তিথিও মাঝেমধ্যে টিভির সামনে এসে বসে, কিছুক্ষণ দেখে উঠে যায়। সময় পেলে অদিতিও দেখেন টুকটাক। কারোরই নেশা হয়নি। মাঝখান থেকে নেশা ধরে ফেলেছে বিশ্বনাথকেই। তবে, ওই বাংলা প্রোগ্রামটুকুই।

সাড়ে আটটা বাজলে টিভি বন্ধ করে বসার ঘর থেকে বেরিয়ে বিশ্বনাথ দেখলেন, অদিতি বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রয়েছেন।

বিশ্বনাথ জিজ্ঞেস করলেন, 'তিথি ফেরেনি এখনও?'

অদিতি রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, মুখ না ফিরিয়ে বললেন, 'না।'

'সে কী, এত রাত করছে, তোমায় কিছু বলে যায়নি?'

'কী বলে যাবে? আজকাল প্রায়ই দেরি করছে, জিজ্ঞেস করলে বলে ক্লাস ছিল। কলেজে কি আজকাল রাত অবধি ক্লাস হয়!'

অদিতি কথাগুলো বললেন বিড়বিড় করে, অনেকটা স্বগতোক্তির মতো। তিনি অনেকক্ষণ থেকেই একা একা বারান্দায় বসে আছেন। বিশ্বনাথ এতক্ষণ টিভি দেখছিলেন, অদিতি একা একাই দুশ্চিন্তা ভোগ করেছেন। আসলে চিন্তা তাঁর বেশ কয়েক দিন থেকেই হচ্ছে। তিথি বরাবরই চাপা স্বভাবের মেয়ে, নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু অদিতি বুঝতে পারছেন তার মধ্যে কোথাও একটা বড়ো পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে ঠিক আগের মতো ভিতু, সাংঘাতিক মুখচোরা, জড়সড় মেয়েটি নেই। হয়তো এটা ভালো লক্ষণই, হয়তো সে বড়ো হচ্ছে, তাই। কথা-টথা এখনও বিশেষ বলে না, কিন্তু ওর মুখচোখের ভাষাও যেন বদলে গেছে। অদিতির মনে একটা সন্দেহ কাঁটার মতো খচখচ করতে থাকে। বিশ্বনাথকে সে-কথাটা বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারেন না।

বিশ্বনাথও রাস্তার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'কলেজে ঢুকেই এই অবস্থা, হ্যাঁ! সাড়ে আটটা বেজে গেল এখনও পাত্তা নেই!'

বারান্দায় আলো নেই, রাস্তার মিটমিটে আলোয় অদিতির মুখ দেখা যাচ্ছে না, বিশ্বনাথ আবার বললেন, 'মৌসুমীদের বাড়িতে খোঁজ নিয়ে আসব নাকি একবার?'

অদিতি একটু চুপ করে থেকে বললেন, ‘যেতে পারো, তবে মেয়ে কি আর ওখানে বসে আছে? আমার মনে হয় তিথি আজকাল কারও সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে।’

‘কারও সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে মানে?’ বিশ্বনাথের গলায় সংশয়।

‘মানে বুঝতে পারছ না? মানে প্রেম করছে’, অদিতির কথা বলার মধ্যে হতাশা ফুটে ওঠে, ‘বেশ বুঝতে পারি ও এখন আমাকে মিথ্যে কথা বলে...আগে কখনো বলত না। ওকে মিথ্যে কথা বলতে দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছে—’

বিশ্বনাথ যেন কেমন হয়ে যান। তিথি প্রেম করছে? তিথি বড়ো হল কবে? এই তো সেদিনের কথা, দুধ খেতে চাইত না বলে ওর মা ওকে কোলে চেপে ধরে মুখের মধ্যে ঝিনুক ঠুসে দুধ ভরে দিত আর পরমুহূর্তেই তিথি উগরে দিত সবটা। একটু বড়ো হয়েও যে কথা বলতে শেখেনি, তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর ভয় হয়েছিল মেয়েটা বোবা কি না। মুখের মধ্যে বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুল ভরে সারাক্ষণ চুষত, চুষতে চুষতে সামনের দাঁতগুলো উঁচু হয়ে গেল। সেই তিথি প্রেম করছে? এ কথা শুনে অন্য মেয়ের বাবাদের ঠিক কেমন মনে হবে তিনি জানেন না, কিন্তু তাঁর বড়ো ভয় ভয় করতে লাগল, যেন একটা দিশেহারা ভাব। ঢোক গিলে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে?’

‘কে তা আমি কী করে বলব!’ অদিতি চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরও ভয় করছিল, চাপা গলাতেই থেমে থেমে বললেন, ‘আমার মনে হয় ওই ছেলেটা, মৌসুমীর দাদা। পুজোর মধ্যে একদিন আমাদের বাড়িতে এল না?’

বিশ্বনাথের চোখের সামনে ছেলেটার চেহারা ভেসে উঠল, যদ্দুর মনে পড়ছে রোগা, দাড়িওয়ালা, পাঞ্জাবি, কাঁধে ঝোলা। গত পুজোয় এক সন্ধ্যয় বাড়িতে এসেছিল তিথির বন্ধু মৌসুমীর সঙ্গে। মৌসুমীরা বেশ বড়োলোক, কিন্তু এই ছেলেটি, ওর জেঠতুতো না খুড়তুতো দাদা, তার চেহারা-ছবি দেখে তেমন মনে হয়নি, বরং খুব নিষ্প্রভই লেগেছিল। তিনি আর অদিতিও ছেলেটির সঙ্গে

আলাপ করেছিলেন। হ্যাঁ, তাঁর মনে পড়ছে, তিথিকে ওইদিন দেখে মনে হচ্ছিল যেন খুব উচ্ছল, খুব হাসছিল, আঁকার খাতা নিয়ে এসে ছেলেটিকে দেখাচ্ছিল, বেশ হইহই করে কথা বলছিল বন্ধু আর বন্ধুর দাদার সঙ্গে। দেখে তাঁর অবাক লেগেছিল, ভালোও লেগেছিল, মনে হয়েছিল—আহা, ওদেরই তো পুজো, ছোটোদেরই তো আনন্দ। ঘুণাক্ষরেও অন্য কিছু মনে হয়নি। কিন্তু অদিতি যা বলছে তা যদি সত্যি হয় তবে তো—

বিশ্বনাথ ভয়ার্ত গলায় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটা কী করে জানো?'

অদিতি ঠোঁট কামড়ে ধরলেন, 'মনে নেই তোমার? সেদিন গল্প করছিল কী নাকি ফিলম-টিলম বানায়, তার মানে সিনেমা লাইনের।'

বিশ্বনাথের চোখে প্রায়ান্ধকার গলি একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল, তিনি চোখ বুজে ফেললেন। শরীরে মনে কেমন একটা অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়েছে যা তাঁর খুব অচেনা। তিথিকে এক্ষুনি শাসন করা দরকার, কিন্তু এ তাঁর কর্ম নয়। অদিতিও কি পারবে? ছোটোবেলা থেকে ছেলেমেয়েকে তাঁরা এমনভাবেই মানুষ করে তুলেছিলেন যে ওদের কখনো সেভাবে শাসন করারই প্রয়োজন হয়নি। আজ এ কী বিষম বিপদ! বিশ্বনাথ চোখ বুজেই শুনতে পেলেন অদিতি বলছেন, 'ওই এতক্ষণে আসছেন।'

তিথি বাড়ি ঢুকে কোনো কথা না বলে সোজা বাথরুমে চলে গেল। সে বুঝতে পারছে আজ সে ধরা পড়ে যাবে—যাবে কি, ধরা পড়ে গেছে। মায়ের থমথমে মুখ দেখেই তার বুকে খামচে ধরেছে ভয়। তিথি মরিয়া হয়ে সিদ্ধান্ত নিল আজ আর সে মিথ্যের আশ্রয় নেবে না, সত্যি কথাই বলবে। বাথরুমের বন্ধ দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে সে প্রাণপণে মনের সমস্ত জোর সঞ্চয় করে প্রস্তুত হতে লাগল।

দরজার বাইরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রস্তুত হচ্ছিলেন অদিতিও। তাঁরও যেন এই সময়টুকু বড়ো দরকার ছিল। বিশ্বনাথকে

তিনি কোনো কথা বলতে বারণ করে সরে যেতে বললেন। নিজে কী বলবেন, সেইটাই হাতড়াতে লাগলেন মনে মনে। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর সমস্ত আশঙ্কাই সত্যি। তিথি ওই কাঁধে ঝোলা নেওয়া রোগাপটকা দাড়িওয়ালা ছেলেটার সঙ্গেই জড়িয়ে পড়েছে, যে কোনো চাকরিবাকরি করে না। ফিলম-টিলম বানানোর কথা কতটা সত্যি তাই-বা কে জানে, দেখে তো মনে হয় এমনিই ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। পুজোর সময় ছেলেটির বাড়িতে আসা, তিথির সঙ্গে কথা বলা দেখেই তাঁর খটকা লেগেছিল। তবু আজ তাঁকে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, তারপর তিথিকে ফেরাতে হবে। এ হয়তো অন্য মায়েদের পক্ষে খুব কঠিন কাজ নয়, হয়তো সব বড়ো হয়ে ওঠা মেয়ের মাকেই এই কাজ কখনো-না-কখনো করতে হয়েছে, কিন্তু অদিতির খুব ভয় করছে। তিনি কি তিথিকে শান্তভাবে বুঝিয়ে বলতে পারবেন, নাকি চিৎকারচেঁচামেচি করে ফেলবেন? তিথি নিশ্চয়ই মানতে চাইবে না, ওর সঙ্গে কি ঝগড়া করতে হবে তাঁকে? এ বাড়িতে সেরকম বিশ্রী রুচিহীন কোনো ঘটনা ঘটুক অদিতি চান না, অদিতি মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন।

৭

তিথি জানত, পার্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত নয়। প্রতিষ্ঠা দূরে থাক, তার পায়ের তলায় জমিই নেই কোনো। কিন্তু এসব নিয়ে সে ভাবনা করেনি। ভাবনা করেই বা কী করবে সে? পার্থকে ফিরিয়ে দেবে? সে জোর কি তার আছে? তার বদলে যাওয়া জীবনে পার্থ একটা নতুন জানলা। ওই জানলা দিয়ে আকাশ দেখেছে সে, আকাশের শূন্যতা দেখেনি। তার সদ্য-হওয়া ডানাদুটো মেলে সে ওই আকাশে উড়তে চাইবে না তো কি, জানলা বন্ধ করে দেবে? তিথি কি উন্মাদ! কিন্তু উন্মাদও তো নিজের ভালো বোঝে।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে আসার পর মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছিল তিথি। ধরা পড়ে অপমানিত হতে হয়েছিল তাকে। অপমান—হ্যাঁ, অদিতি তাকে যেভাবে, যে কথাগুলো বলে আঘাত করেছিলেন তাতে তিথি অপমানই বোধ করেছিল, কেননা, তিনি পার্থকে অপমান করেছিলেন।

‘কোনো ফিক্সড উপার্জন নেই, চাকরিবাকরি করে না। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়। বোনের বন্ধুর সঙ্গে মিশতে শুরু করে দিল! ওর এত সাহস হয় কী করে!’ অদিতি ফুঁসছিলেন। পার্থর সম্বন্ধে ওই কথাগুলো তিথিই বলেছিল তাঁর প্রশ্নের উত্তরে। অদিতি বুঝে উঠতে পারছিলেন না এসব জেনেও তিথি ছেলেটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল কীভাবে!

‘তাতে কী হয়েছে মা? তুমি যখন বাবার সঙ্গে মিশেছিলে, বাবার তো এর চাইতেও খারাপ অবস্থা ছিল!’

অদিতি প্রচণ্ড চমকে উঠেছিলেন। তিথি যে কখনো তাঁকে এভাবে বলতে পারে এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। গর্জন করে উঠেছিলেন, ‘না, তুমি ভুল বলছ। তোমার বাবা চাকরি করতেন, তাঁর ওপর সমস্ত পরিবারের দায়িত্ব ছিল, তিনি কোনো কর্তব্য এড়াননি। আর এই ছেলেটি তো একটি চালচুলোহীন উড়নচণ্ডী—’

‘মোটেই না। পার্থ ফিলম বানায়, এখন াগল করতে হচ্ছে—’

‘বড়ো বড়ো কথা বোলো না। ফিলম বানায়—ফিলম বানানো মুখের কথা! বানিয়েছে এখনও অবধি একটাও ফিলম?’

তিথির কাছে এর কোনো উত্তর ছিল না। তার গা-হাত-পা কাঁপছিল মানসিক ধকলে। তবু ভেঙে না পড়ে পিঠ সোজা রেখে দাঁড়িয়ে ছিল সে। অদিতি তীক্ষ্ণ চোখে মেয়ের দিকে দেখতে দেখতে বললেন, ‘তুমি ওদের বাড়িতে গেছ?’

তিথি মাথা নাড়ল—না, সে যায়নি। তবে পার্থ বলছিল সে বাড়িতে তিথির কথা বলেছে। তিথি মাকে কিছু বলল না।

অদিতির জেরা তখনও শেষ হয়নি। তাঁর মনে পড়ল পার্থ পুজোর সময় যখন এসেছিল, কথায় কথায় বলেছিল ওদের দেশের বাড়িতে দুর্গাপুজো হয়। কয়েক বছর অন্তর অন্তর পার্থর ওপর সেই পুজোর ভার পড়ে। কথাটা যাচাই করার জন্যে অদিতি জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওদের দেশের বাড়িতে পুজো হয়, মানে দেশের অবস্থা ভালো?’

তিথি এ বিষয়ে কিছু জানে না। সে চুপ করে রইল।

‘কী হল, জবাব দিচ্ছিস না যে? পার্থ বলে গেছিল ও নাকি পুজো করে, পুজোর খরচ আসে কোত্থেকে?’

তিথি ভাবছিল। ভেবে ভেবে বলল, ‘পুজোর খরচ তো দেন ওর দাদু। তাঁরই তো পুজো, পার্থকে তো কেবল কাজকর্মের দিকটা সামলাতে হয়।’

তিথির নির্বিকার সত্যকথনে অদিতির গলায় শ্লেষ উঠে এল, ‘তবে আর কি, কোনোদিকেই কোনো আশার আলো নেই। দেশের সম্পত্তিও নিশ্চয়ই এমন কিছু নেই যে পার্থর চাকরিবাকরি না করলেও দিব্যি চলে যাবে। তিথি আমার কথা শোনো, এখন এমন

কিছু কোরো না যাতে তোমাকে পস্তাতে হয়। পড়াশুনা করো মন দিয়ে...তুমি পড়াশুনায় ভালো...বয়সে এত বড়ো একটা উলটোপালটা লোকের পাল্লায় মিছিমিছি সময় নষ্ট কোরো না, এতে তোমার ভালো হবে না।'

অদিতি যখন এতগুলো কথা বলছিলেন, সেই কথাগুলো তিথির মনের মধ্যে ঠোক্কর মেরে মেরে আরও অন্য কিছু কথা ছিটকে দিচ্ছিল। মাকে এমন টাকাপয়সা সম্পত্তি ইত্যাদি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ মন্তব্য আলোচনা করতে দেখে তার ঘৃণাবোধ হচ্ছিল, লজ্জা করছিল। মা-র মুখে এরকম কথা শুনতে এর আগে সে অভ্যস্ত ছিল না। বরং মা যে বড়োলোকের মেয়ে হয়েও তার গরিব বাবাকে নিজের ইচ্ছেয় ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন এ নিয়ে তার গোপন গর্ব ছিল। আজ তার নিজের অপমানের পাশাপাশি মায়ের অধঃপতন দেখেও সে মরমে মরে যাচ্ছিল।

দ্বিতীয়ত, এই প্রথম সে বাড়িতে কারও মুখে শুনল সে পড়াশোনায় ভালো। আশ্চর্য, তার জীবনে মাত্র এক বছরের মধ্যে এত নতুন ঘটনা একসঙ্গে ঘটছে কী করে!

আর পার্থর সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য নিয়েও মা কটাক্ষ করলেন, অথচ তিথি জানে, মায়ের সঙ্গে বাবার পার্থক্যও প্রায় ওরকমই, হয়তো দু-এক বছর কম। পার্থ চাকরি করে না এটা যদিও-বা তার দোষ হতে পারে, সে তিথির থেকে বারো বছর আগে জন্মেছে এটাও কি তার দোষ?

তিথির মনে এই বিরুদ্ধ যুক্তিগুলো ঘাই মারছিল যদিও, তবু সে এটাও জানত যে বাড়িতে ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়লে তার হেনস্থাই হবে। মনে মনে অনেক ভয়াবহ অশান্তির ছবিও কল্পনা করে রাখা ছিল তার। মায়ের সঙ্গে এই ঘাত-প্রতিঘাতে তার কিছুটা মিলল, কিছুটা মিলল না। ঠিক তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, যখন সে বাথরুমে ছিল, ভয় জমতে জমতে একটা চূড়ান্ত আকার নিয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বাস্তবে একবার ঘটতে শুরু করার পরে তিথির ভয়ে মরে গিয়ে খুব ক্লান্তি আসছিল।

একই রকমভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন অদিতিও। এতটাই যে তাঁর সে রাত্রে খেতে দিতেও ইচ্ছে করছিল না। তিথি খেল না। অদিতি বুঝতে পারলেন তাকে ডাকা বৃথা। তাঁর নিজেরও খাওয়ার ইচ্ছে নেই। একা বিশ্বনাথের খাবার গুছিয়ে দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন। কিন্তু শুধু শুয়েই পড়লেন, ঘুম এল না।

তিথি সমস্ত ঘটনাটাই পার্থকে বলেছিল। বলতে গিয়ে প্রথমে তার মনে হয়েছিল বলাটা হয়তো ঠিক হবে না। বলতে গেলে পার্থর প্রসঙ্গে যে অপ্রিয় সত্যগুলো তাকে উচ্চারণ করতে হবে তাতে পার্থর মনে ব্যথা লাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু তিথি তো ওকে কষ্ট দিতে চায় না। পার্থ হয়তো লজ্জা পাবে, অভিমান করবে, হয়তো ভাববে এগুলো তিথির নিজেরও মনের কথা।

কিন্তু তিথি চেপে রাখতে পারেনি। পার্থর কাছে সে কিছু চেপে রাখতে পারে না। গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এসেছিল তার সদ্য-বিক্ষত মনের মধ্যে থেকে। পার্থর অপমান যে তারও অপমান, সেই যন্ত্রণা ছিটকে উঠেছিল তার চোখেমুখে। বলতে বলতে তিথি ফোঁপাচ্ছিল।

সব শোনার পর পার্থ কিন্তু যা বলল, তাতে তিথি কান্না ভুলে হাঁ–করে তাকিয়ে থাকল তার মুখের দিকে। ওই মুখে কোনো আহত রেখা নেই, কণ্ঠস্বরেও কোমলতার রেশমাত্র নেই। শুকনো খটখটে স্বরে পার্থ বলল, ‘এরকম হবে আমি জানতাম। তোমার মা-বাবা আমাকে মেনে নেবেন না। তিথি চলো আমরা বিয়ে করে ফেলি।’

তিথি শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে পার্থ তার কাঁধে হাত রাখল, ‘তুমি বোধ হয় কথাটা ধরতে পারলে না। আমি রেজিস্ট্রি করে রাখার কথা বলছি। তাহলে তোমার মা বাবার কিছু করার থাকবে না।’

তিথি বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। বিয়ে! এক্ষুনি পার্থ তাকে বিয়ে করতে বলতে পারে এতটা তার সুদূর কল্পনার বাইরে ছিল। এই তো মাত্র ক–মাস হয়েছে পার্থর সঙ্গে তার আলাপ। এর মধ্যে প্রথম প্রেমের অভিঘাতেই সে এখনও কাঁপছে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া

এইমাত্রই শুরু হয়েছে তার। বিয়ের কথা যে তার মনে একবারও উঁকি দেয়নি এ বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু তিথি সে-কথা ভাবতেও যেন সাহস পায়নি, বহুদূরের সম্ভাবনা মনে করে তাকে মনের অতলে ছোট্ট একটা বাক্সে ঢাকনা বন্ধ করে লুকিয়ে রেখেছে। আজ পার্থ একেবারে বিনা ভূমিকায় ধাক্কা মেরে সেই বাক্সের ডালা খুলে টেনেহিঁচড়ে সেই লুকোনো স্বপ্নটিকে বার করে নিয়ে এল। এনে তিথির সামনে ঘাড় ধরে সেটাকে দাঁড় করিয়ে দিতেই তিথি স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পার্থ বলল, 'তার আগে তোমাকে একদিন আমার বাড়িতে নিয়ে যেতে হবে।' বলে একটু হাসল, ফ্যাকাশে ক্লিষ্ট হাসি, 'আমার বাড়ি কিন্তু ভাঙাচোরা, তোমার যদি পছন্দ না হয়?'

তিথি আচ্ছন্নের মতো তাকিয়েই ছিল। জীবনের এ কোন অদ্ভুত বাঁকে এসে দাঁড়িয়েছে সে, সামনের পথ এত ঝাপসা লাগছে কেন! ওখানে কি কুয়াশা খুব? তা এত তাড়াতাড়ি কী আছে, ওই পথে পা বাড়ানোর আগে আর একটু অপেক্ষা করলে হয় না? কুয়াশা কেটে যেতে পারে, এখন যে তিথি চোখে কিছু দেখতেই পাচ্ছে না!

তিথির মনে হতে লাগল তার সামনে একটা গভীর, ভীষণ গভীর খাদ। খাদটা যেন খুব সবুজ, সেই সবুজ ঘন হতে হতে ক্রমশ নীচের দিকে নীল হয়ে গেছে। সেই অনেক অনেক নীচে একটা সুন্দর খরস্রোতা নদী বয়ে যাচ্ছে। তিথির সেখানে যেতে খুব ইচ্ছে করছে কিন্তু ভয় করছে নামতে গেলে পড়ে যাবে। তা ছাড়া তিথির হাতে যেন একদম সময় নেই, ওখানে যেতে হলে তাকে নীচে ঝাঁপ দিতে হবে। তিথির ঝাঁপ দিতে খুব ভয় করছে, কিন্তু খাদটাও তাকে ডাকছে, তীব্রভাবে ডাকছে। কীসের ভয়? ওখানে কে একজন দাঁড়িয়ে আছে না, যাকে সে খুব ভালোবাসে, বিশ্বাস করে? সে তো তার থেকে বয়সে অভিজ্ঞতায় বুদ্ধিতে হৃদয়ে অনেক অনেক বড়ো। তিথি ঝাঁপ দিলে সে তিথিকে লুফে নেবে না? তিথি দ্বিধা করছে কেন?

পার্থ কঠিন স্বরে বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তিথি, আমি ডাকলে তুমি আসবে কি না। আমি তোমাকে ডাকছি তিথি...তুমি না এলে আমি একাই ফিরে যাব।'

তিথির অন্তরাত্মা বলে উঠল, 'না না না—'

তিথি চোখ বন্ধ করে ঝাঁপ দিল।

৮

বাড়িটার বয়েস কত সঠিক বলা মুশকিল। তবে তার ভগ্ন জীর্ণ দশা দেখে বোঝা যায় কমপক্ষে তিরিশ বছর এর কোনো সংস্কার হয়নি। বাইরে এককালে প্লাস্টার ছিল। এখন পুরোটাই ইটের দাঁত বের করা, সারা গায়ে বহু বছরের জমা শুকনো শ্যাওলার ধূসর কালো আস্তরণ। দোতলা বাড়ি, চারপাশের খালি জমিতে বর্ষার জল আর নোংরা নালা উপচানো জল জমে বুনো গাছপালার জঙ্গল হয়ে গেছে। দূর থেকে তার একপাশে হেলে পড়া চেহারাটা দেখে মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে হুড়মুড় করে ধসে পড়বে।

চিলেকোঠার সিঁড়ির ধাপে বসে পার্থ তিথির মুখটা ধরে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে এল।

'না, প্লিজ না!'

তিথি খপ করে পার্থর কবজি ধরে ফেলেছে, মুখটা পিছিয়ে নিয়ে গেছে পার্থর উদ্যত চুম্বন থেকে। তার গলায় অনুরোধের সঙ্গে মিশে আছে একটা স্থির আপত্তি।

পার্থ এক মুহূর্ত থামল। তিথি এখন তার স্ত্রী। সে তাকে চুমু খেতেই পারে। বিয়ের আগে পার্থ তাকে জোর করেনি। আজ যদি সে তিথিকে জোর করেই চুমু খায়, তাকে কি সত্যি জোর করা বলে?

পার্থ তিথির গাল থেকে হাত সরিয়ে নিল। ব্যথিত গলায় বলল, 'কেন তিথি? তোমার ইচ্ছে করছে না?'

তিথি সিঁড়িতে বসে আছে। হাঁটুর ওপর কনুই রাখা। সে দু-হাতে মুখ ঢাকল। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। ভীষণ মা-র কথা মনে

হচ্ছে। তিথি মাথা নাড়াতে নাড়াতে অবরুদ্ধ গলায় বলল, 'আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি বিয়ে করলাম মাকে না জানিয়ে...আমি কখনো ভাবিনি..। মা! মা! আমি বিয়ে করেছি, মা—ও মা! আজ আমার বিয়ে হয়ে গেল...'

তিথি আচমকা চাপা কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছিল। তার দু-হাতের পাতা চোখের জল, সর্দি আর লালায় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে। চশমাটা বেঁকে লেগে আছে তার কপালে।

তিথি আজ নিয়ে এই দু-বার এল পার্থর বাড়িতে। পার্থরা বাড়িটার একতলায় ভাড়া থাকে। এর আগে প্রথম যেদিন পার্থ তাকে নিয়ে এসেছিল, আগের দিন বলে রেখেছিল শাড়ি পরে আসতে। তিথি শাড়ি পরেই এসেছিল। আজ অবশ্য সে চুড়িদার পরে আছে। শাড়ি পরতে সাহস হয়নি। মা যাতে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ না করেন সে আজ বিয়ে করতে যাচ্ছে, তিথি তাই আজ খুঁজেপেতে সবচেয়ে পুরোনো আর প্রায় রং-জ্বলা একটা চুড়িদার পরে এসেছে। এটাও পার্থরই পরামর্শ ছিল।

প্রথম দিন পার্থর বাবা বাড়ি ছিলেন না, ওর মা আর বোনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মা ছোটোখাটো চেহারার মানুষ, খুব ঘরোয়া আর শান্ত। মাথায় অনেক চুল, বিরাট খোঁপা। পাণ্ডুর মুখে হাসিটা যেন স্বভাবতই ঈষৎ করুণ। আটপৌরে ধরনে শাড়ি পরা। তিথির মা এভাবে শাড়ি পরেন না। এরকম শাড়ি পরার ধরন তিথি বাংলা সিনেমায় দেখেছে। পার্থর মাকে দেখে সে চিনতে পেরেছিল, এঁকে সে মৌসুমীদের বাড়িতে কোনো একটা উপলক্ষ্যে একবার দেখেছিল। মৌসুমী আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, 'আমার বড়োমা' বলে।

পার্থর বোন সীমাকে কিন্তু তিথি আগে দেখেনি। সীমা পার্থর থেকে এক বছরের ছোটো। আলাপ হওয়ার পর সীমা প্রথমে তিথির দিকে তাকিয়ে হাসল, ওর হাসিটাও মায়েরই মতো চাপা। তারপর দাদার দিকে ফিরে বলল, 'দেখে যদিও মৌয়ের মতো লাগছে না, তবু এ কিন্তু মৌয়ের বন্ধু। দেখিস দাদা, এ মেয়ে এ বাড়িতে থাকবে তো?'

তিথির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। পার্থ ওকে আড়াল করল, সস্নেহ আস্থার স্বরে বলল, ‘সে আমার বোঝা হয়ে গেছে। তুই নিশ্চিন্ত থাক, তিথি মৌয়ের মতো নয়, ওর কোনো বায়নাক্কা নেই।’

পার্থর মা তিথিকে দেখছিলেন, আস্তে আস্তে বললেন, ‘আচ্ছা, ভালো হলেই ভালো।’ তিথি দেখল, তাঁর মুখে সংশয়।

তিথি নিজেও সংশয়ে আচ্ছন্ন হচ্ছিল। সে এ বাড়ির বউ হয়ে আসবে, তাকে সেভাবেই গ্রহণ করা হচ্ছে সে বুঝতে পারছিল। এই গ্রহণের মধ্যে একটা উত্‌কণ্ঠা লুকিয়ে আছে। তবুও এটা তার একরকম স্বীকৃতিই যে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই স্বীকৃতিতেও তো একটা সম্মান আছে, যাতে তিথির তৃপ্ত বোধ করা উচিত। কিন্তু তার সেরকম কিছু হচ্ছিল না। সে মনে মনে নিশ্চিন্ত আর আনন্দিত বোধ করতে চাইছে, কিন্ত সেটা পারছে না বলে নিজেকে নিয়ে ধন্দে পড়ছিল।

ছিঃ—তিথি ভাবল, আমাকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে। এইরকম সংশয়ের অস্বস্তি নিয়ে সে কী করে পার্থকে ভালোবাসার কথা ভাবে? পার্থ, তার পরিবার, তার ঘরবাড়ি, এরা যদি তাকে আপন বলে মেনে নিতে পারে, সে কেন পারবে না?

ওইদিন পার্থ যখন তাকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার পথে জিজ্ঞেস করল, ‘কেমন লাগল?’ তিথি উত্তর দিতে একটু সময় নিয়েছিল। এই প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী ছিল, তিথি অনেকক্ষণ থেকেই মনে মনে তার উত্তর গুছিয়ে তোলার চেষ্টা করছিল। নিজেকে অবচেতনেই বোঝাবার চেষ্টা করছিল সে, সেই সঙ্গে নিজেকে ঢাকার চেষ্টাও—পার্থ যেন দুঃখ না পায়, তার প্রেমকে ভুল না বোঝে।

সে দেখে এসেছে পার্থর বাড়িতে দুটো ছোটো ছোটো ঘর। ঘর দুটোই জিনিসপত্রে ঠাসা। ঘরের মেঝে মাটি থেকে নীচু। দেওয়ালের চুন খসে খসে অজানা মহাদেশের ম্যাপ হয়ে গেছে। একটা ঘরে একটা উঁচু খাট, ড্রেসিংটেবিল আর আলনা। সব কিছুর ওপরে রাশিকৃত এলোমেলো বিছানাপত্র কাপড়জামা খবরের কাগজ গামছা ইত্যাদি ছড়ানো। আরেকটা ঘরে একটা ছোটো তক্তপোশ, একটা টেবিল। টেবিলের ওপর ডাঁই করা বই আর কাগজপত্র, ওরই মধ্যে একটা সাদাকালো পোর্টেবল্

টিভিও রাখা। সব কিছুই বড়ো অগোছালো, তিথির একঝলক দেখেই মনে হয়েছিল। তাদের বাড়িতে মা যেমন জিনিসপত্র গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখেন, একদমই সেরকম নয়। তিথি চোখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু দেখতে পারে না, নতুন জায়গায় এসে সে একটু জড়সড়ই থাকে, আজকের পরিস্থিতি তো সব মিলিয়েই তাকে আরও আড়ষ্ট করে রেখেছিল। কিন্তু চোখ না মেলেই এসব কিছু চোখে পড়েছিল তার। মনে হয়েছিল কোনো ঘরেই পা ফেলার জায়গা নেই, নিশ্বাস যেন বন্ধ বন্ধ লাগছে।

এসবের কোনোটাতেই তার সত্যি সত্যি কিছু যায় আসে না বলেই সে বিশ্বাস করে, কিন্তু একটা বেয়াড়া প্রশ্ন তার মনের তলায় একটা নাছোড়বান্দা কাকের মতো ক্রমাগত কা-কা করছে, তিথি তাকে ওড়াতে পারছে না।

সে বহু কষ্টে পাহাড়প্রমাণ সংকোচের ওপার থেকে ক্ষীণ গলায় বলল, 'আচ্ছা..বিয়ের পর আমরা কোথায় থাকব?'

পার্থ পূর্ণদৃষ্টিতে তিথির চোখের দিকে তাকাল, কৌতুকের স্বরে বলল, 'আরে, তুমি চিন্তা করছ নাকি?' তিথির পিঠে হাত রেখে নিবিড় চাপ দিল সে, 'এই বোকা মেয়ে, চিন্তা করে না। আমার ওপর ভরসা নেই তোমার?...সব ঠিক হয়ে যাবে।'

নিজের প্রশ্নটাই নিজের কানে এত নির্লজ্জ আর রুচিহীন ঠেকেছিল তিথির, যে লজ্জায় তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করছিল। পার্থর কথায় তার চোখে জলে এসে গেল। সে অপরাধীর মতো তাকাল পার্থর দিকে, তার দু–চোখে ক্ষমাপ্রার্থনা। সত্যিই, পার্থ তার থেকে কত বড়ো, ওর দায়িত্ববোধ নেই? তিথি বোকার মতো কী কতগুলো আজেবাজে কথা ভাবছিল! সে পার্থর পাঞ্জাবির হাতা আঁকড়াল, এটা করলে তার সবচেয়ে নিশ্চিন্ত লাগে।

পার্থ তিথির করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে ওর কাঁধ জড়িয়ে নিল, নরম গলায় বলল, 'ভেবো না তিথি। রেজিটা হয়ে নিতে দাও। পৃথিবীর কোনোকিছুই তারপর আমাদের আর আলাদা করতে পারবে না। আমরা আর কয়েকদিন পরেই একসঙ্গে থাকতে

পারব—'

'না না, শোনো, এত তাড়াতাড়ি কোরো না—' তিথি কথাগুলো বলল এমন ছিটকে ওঠা স্বরে, পার্থ অবাক হয়ে তাকাল।

তিথির স্বরে দ্বিধা, 'তোমার বোন...মানে, সীমাদির বিয়ে হয়নি এখনও। তুমি নিশ্চয়ই ওর বিয়ের আগে আমাকে এখানে আসতে বলবে না?'

'কেন!' পার্থ আরও বিস্মিত, 'সীমার সঙ্গে তোমার এখানে আসার সম্পর্ক কী? তুমি সীমার সঙ্গে থাকতে চাইছ না, ওর সঙ্গে তোমার বনবে না মনে হচ্ছে? ওকে পছন্দ হয়নি?'

'আঃ কী যা তা বলছ!' তিথি ব্যাকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

'তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না তিথি!'

তিথি একটু থেমে বলল, 'সীমাদির বিয়ের জন্যে তোমরা চেষ্টা করছ না?'

'করছি। অনেকদিন থেকেই চেষ্টা চলছে। কিন্তু এসবে অনেক সময় লাগে। দু-পক্ষের পছন্দ হওয়া-হয়ির ব্যাপার আছে। যেগুলো একটুও-বা এগোয় মাঝেমধ্যে, সীমা নিজেই সেগুলো নাকচ করে দেয়।'

'সীমাদি হয়তো অন্য কাউকে পছন্দ করে?'

'না, ও কাউকেই পছন্দ করে না। ও শুধু আশা করে ও বাড়িতে বসে থাকবে আর ওর মা-বাবা ওর জন্যে রাজপুত্র খুঁজে নিয়ে

এসে ওর সঙ্গে বিয়ে দেবে!'

পার্থর গলায় বিরক্তি এতটাই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে তিথি আশ্চর্য হয়ে গেল। সে আর কোনো কথা বলল না। মনে মনে বুঝল, বোনের বিয়ে হতে দেরি হচ্ছে দেখে পার্থ অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সে আর অপেক্ষা করতে রাজি নয়, তার বোধ হয় মনে হচ্ছে নিজেরও বিয়ের সময় চলে যাচ্ছে। তিথির মনটা একটা তেতো স্বাদে ভরে উঠছিল। সে যেন একটা সুর শুনছিল, হঠাৎ সেই সুরের একটা পর্দা যেন সেই সুরের সুতো ছিঁড়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে। তিথির কানে এমন বেসুর বাজল যে তার মাথার মধ্যে ঝনঝন করে উঠল।

সে পার্থকে কীভাবে বোঝাবে, একটা মেয়ে হয়ে আজ সে সীমাকে দেখামাত্র যে কথাটা বুঝে ফেলেছে! সীমা বিষণ্ন আর বিরক্ত। আজ তার বয়েস প্রায় তিরিশ ছুঁতে চলল, কিন্তু এখনও তার বিয়ে হয়নি। অথচ সে চাকরি–বাকরি বা অন্য কোনো পেশাতেই ব্যস্ত নয়। সে নিজে প্রেম করে না কিন্তু স্বপ্ন দেখে তার একটা ভালো বিয়ে হোক, নিজস্ব সংসার হোক। এটাই তার একমাত্র উচ্চাশা। যৌবনে পা দেবার পর থেকেই সেই অপেক্ষা করে করে আজ সে প্রায় আশা হারাতে বসেছে। সেই মেয়ের সামনে তার পিঠোপিঠি বয়সি দাদা বিবাহিত জীবনযাপন করবে, তিথিরই সঙ্গে, যে কিনা সীমার চাইতে এগারো বছরের ছোটো। এই পুরো ঘটনাটার মধ্যে একই সঙ্গে গভীর নিষ্ঠুরতা আর অশ্লীলতা দেখতে পেয়ে তিথির মনটা গুটিয়ে যেতে লাগল ভেতর দিকে, ঘন অন্ধকারে। তার আরও অসহায় লাগছিল এটা বুঝে যে পার্থ তার এ সমস্ত কথা বুঝতে চাইবে না, হয়তো বুঝবেও না।

সেই দিন থেকে আজ এই বিয়ের দিন অবধিও তিথি মনে মনে তীব্র অশান্তি ভোগ করেছে। পার্থকে যেন মাঝে মাঝে কেমন অচেনা লাগছে তার, মনে হচ্ছে যেন এক–একটা সময় তাদের দুজনের মধ্যে দূরত্বের চর জেগে উঠছে। এরকম মনে হওয়া মাত্রই সে পার্থকে আরও দ্বিগুণ জোরে আঁকড়ে ধরছে, সমস্ত দূরত্ব পেরোতে চাইছে আপ্রাণ সাঁতারে, সাঁতরে সাঁতরে এসে সজোরে মুঠো করে ধরতে চাইছে পার্থর পাঞ্জাবির কোনা। সে ছাড়া আর কোনো আশ্রয় নেই, বন্ধুও নেই। মৌসুমীর কাছ

থেকেও যেন এই ডামাডোলে অনেকটাই দূরে ভেসে এসেছে সে। তা ছাড়া মৌসুমীকেও বিয়ের কথা বলতে পার্থর কঠিন নিষেধ রয়েছে।

আজ তিথি কলেজে যাওয়ার নাম করে বেরিয়ে পার্থর সঙ্গে মিট করেছিল যাদবপুর থানার সামনে। সেখান থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে ম্যারেজ রেজিারের বাড়ি। সঙ্গে পার্থর দুই বন্ধু, যাদের তিথি আগে চিনত না, আর সীমা। এই তিনজনেই তাদের বিয়ের সাক্ষী। সীমার মুখ ছিল গম্ভীর আর পাথুরে। সে দু-একবার হাসছিল, সই করল পেনের নিবে খুব চাপ দিয়ে, ধীরে ধীরে। তিথির মনে হচ্ছিল সীমা যেন একটা যান্ত্রিক পুতুল, তার কোনো সাড় নেই, পড়ে থেকে থেকে যার কলকবজাতেও যেন একটু জং ধরেছে।

আইনি বিয়ের যেসব আইনকানুন, সেসব পালন করতে করতে তিথির নিজেকেও একটা কলের পুতুলের মতো লাগছিল। পার্থর মুখ অবশ্য উত্‌ফুল্ল ছিল। স্বামী–স্ত্রীর শপথ নেওয়ার সময় তিথির নিজেকে মনে হয়েছিল অন্য লোক। বিবাহিত, সে বিবাহিত! সে আজ থেকে একজনের স্ত্রী! এই ঘটনা একটা মেয়েকে কতটা বদলে দেয়!

পার্থর বাড়িতে এসে তিথি যখন পার্থর মাকে প্রণাম করল, সুধা তার মাথায় হাত ছুঁইয়ে বললেন, ‘এমন বিয়ে হল যে মাথায় একটু সিঁদুর পর্যন্ত দেওয়া যাবে না।’ তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, ‘আশীর্বাদ করি যেন তেমন দিন তাড়াতাড়ি আসে।’

পার্থর বাবার সঙ্গে তিথির আজও দেখা হয়নি। পার্থকে সে বলেওছিল, ‘তোমার বাবাকে প্রণাম করা হল না—’

—’ ‘‘তোমার বাবা’’ নয়, শুধু বাবা।’ পার্থ হাসছিল।

তিথি লজ্জা পেয়ে জিভ কাটল, ‘সরি, কিন্তু...মানে, মাকে আমি কিন্তু বড়োমা বলব।’

'সে বোলো, শুনতে ভালোই লাগবে। কিন্তু বাবাকে এক্ষুনি কিছু বলার দরকার নেই, বাবা বিয়ের ব্যাপারটা জানেন না।'

তাদের স্বামী–স্ত্রীর নিভৃত আলাপ চলছিল চিলেকোঠায় বসে। ঝিমঝিম করছে নিস্তব্ধ দুপুর। তিথির বুকের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে কী একটা জমছে। একটু আগেই সে মায়ের কথা ভেবে মনখারাপ করছিল, এবার মুখ ফিরিয়ে পার্থর দিকে তাকাল। পার্থ সিগারেট খাচ্ছে। বাড়ি এসে পাঞ্জাবি খুলে ফেলেছে, তার গায়ে এখন শুধু গেঞ্জি। গেঞ্জির গোল গলার ওপর দিয়ে তার বুকের রোম দেখা যাচ্ছে, তিথি দেখল, সেগুলো খুব ঘন। তিথি আড়চোখে দেখেই চোখ সরিয়ে নিল। তার বুকের মধ্যে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যা জমছে, সেটা স্বপ্ন আর আকাঙ্ক্ষা মেশানো একটা চোরা স্রোত, তিথি তার টান টের পাচ্ছিল।

৯

কলিং বেলটা বাজছে।

মিতা রান্নাঘরে পাঁপড় ভাজছিলেন। কাজের মেয়েটা ছুটি নিয়েছে। মিতা গলা তুলে বললেন, 'মৌ, দ্যাখো তো!'

মৌসুমী সিরিয়াল দেখছিল। দীপ দিদির প্রায় ঘাড়ের ওপর উঠে তার বিনুনির প্রান্ত নিয়ে নিজের গোঁফ বানানোর চেষ্টা করছে, চুল ধরে টানাটানিও করছে বিস্তর। অন্য সময় হলে মৌসুমী নির্ঘাত ভাইকে একটি চড় কষাত, কিন্তু এখন সিরিয়ালের গল্পে একটা দারুণ ক্লাইম্যাক্স আসন্ন। এমন সময়ে বেলটা দ্বিতীয়বার বাজল।

মৌসুমী এক ধাক্কা মেরে ভাইকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'ইডিয়েট, দরজাটা খুলতে পারছিস না?'

দীপ চেঁচিয়ে উঠল, 'মা, দিদি মারছে। আমি কেন দরজা খুলব, মা তোকে খুলতে বলেছে না?'

রান্নাঘর থেকে মিতা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'মৌ ডোন্ট বি সিলি, বাইরে কেউ ওয়েট করছে!'

মৌসুমী অগত্যা বিরস মুখে উঠে দরজা খুলল। খুলেই চমকে উঠল। রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বলল, 'মা শিগগির এসো, জেঠু এসেছে।'

অলকের এ বাড়িতে আসাটা অপ্রত্যাশিত বা বিরল কিছু ঘটনা নয়। ভাইয়ের বাড়িতে তিনি প্রায়ই এসে থাকেন। আজও সেরকমই এসেছেন। তাঁর পরনে একটা দলামোচড়া কালো টেরিকটের প্যান্ট, ওপরের শার্টটা ভালো কিন্তু পুরোনো। এটা

অরূপের জামা। অরূপ হাসপাতালে বা চেম্বারে যে শার্টগুলো পরে যান, সেগুলো বছর খানেক পরার পর আর পরেন না। অলক সেগুলো মিতার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যান। অরূপ জানতে পেরে রাগ করেন, দাদাকে নতুন শার্ট কিনে দিতে চান, কিনে দিয়েছেনও দু-একবার, কিন্তু অলক বলেন, 'কেন, বেশ তো জামাগুলো। তুই ডাক্তার মানুষ—নতুন জামা পরবি, তোর এই পুরোনোগুলো দিয়েই আমার দিব্যি কাজ চলে যায়।'

আজ অলক আসতেই যেন একটা সাড়া পড়ে গেল। মিতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন, 'আসুন দাদা। আমরা আপনার কথা খুব বলছিলাম, আপনি কয়েক দিন আসেননি...'

অলক খুশি হলেন। সোফায় এসে জাঁকিয়ে বসলেন, আঃ কী নরম। মিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে ক–দিন অফিসের কাজে, সময়ই পাচ্ছিলাম না। আজও সেই শ্যামবাজার থেকে আসছি, বাব্বা সে যে কতদূর...দুপুর থেকে ঘুরতে হয়েছে আজ...এই রোদ্দুরে...খুব খিদেও পেয়েছে।'

মিতা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, চা-ও দেব তো?'

অলক পা টানটান করে ছড়িয়ে দিলেন। পিঠ হেলিয়ে আরামের স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ-অ্যা, আপত্তি কী! তোমাদের বাড়ির চা তো বেস্ট কোয়ালিটি...'

মিতা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মৌসুমীকে ডেকে নিলেন, 'মৌ ফ্রিজ থেকে দুটো ডিম বের করে কিচেনে নিয়ে এসো তো।'

অলক প্রসন্ন মুখে দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে, বিচ্ছু দি গ্রেট, আসুন ততক্ষণ আপনার সঙ্গে একটু যুদ্ধ করি। আপনার বন্দুক কই, বন্দুক দেখছি না যে?'

দীপ বন্দুক বার করার বা যুদ্ধের কোনো উত্সাহ দেখাল না। কিন্তু জেঠুর কাছে ঘেঁষে এসে বসল। একবার এদিক-ওদিক তাকাল, তার পরে দুম করে বলে বসল, 'জেঠু জানো তো, বড়দা তোমাকে না বলে বিয়ে করেছে।'

মিতা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, দরজার ফ্রেমে স্থির হয়ে গেলেন। মৌসুমী চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'এ-এ-এ বাবা, ভাই তুই—!' মিতার ইশারায় চুপ হয়ে গেল।

অলক কিন্তু অট্টহাস্য করে উঠলেন, 'তাই নাকি, বিচ্ছুবাবু! তুমি কোত্থেকে জানলে?'

দীপ বড়োদের মতো গলা করে বলল, 'আমি সব জানি, বড়দা তো তিথিদিকে—'

'দীপ!' মিতা প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ছোটোদের এত কথা বলতে নেই জানো না! যাও এখান থেকে, যাও হোমটাস্ক করো—গো কুইক!'

অলক থই পাচ্ছিলেন না। দীপ কী বলছে আবোলতাবোল, মিতাই-বা এত রেগে যাচ্ছে কেন?

তারপর সব শুনলেন। মিতা আর মৌসুমী দুজনে মিলে তাঁকে বিস্তারিত শোনাল। মধ্যিখানে একবার উঠে গিয়ে মিতা চা আর ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে দিয়েছিলেন অবশ্য, সেই সঙ্গে পাঁপড়ভাজাও, কিন্তু অলকের আর খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তাঁর শরীর ঝিমঝিম করছিল।

তিথি বলে সেই মেয়েটি মৌসুমীর বন্ধু, অলক তাকে দেখেছেনও হয়তো। ভালো মেয়ে, পড়াশোনাতেও ভালো। সে যে কাউকে না জানিয়ে এমন একটা কাজ করে বসবে মৌসুমী বা মিতা কেউই ভাবতে পারেনি। এটা হয়েছে প্রায় এক বছর হতে চলল। এর

মধ্যে পার্থ এই বাড়িতে দু-একদিনের বেশি আসেনি, শেষ এসেছিল সেও অনেকদিন হয়ে গেছে। তিথি আর পার্থ যে প্রেম করে এটা নাকি সবাই জানত, কিন্তু বিয়ের কথা তিথি নিজে থেকে বলেনি, মৌসুমীর সন্দেহ হওয়াতে সে তিথিকে জেরা করে জানতে পেরেছে।

কীভাবে জানতে পেরেছে তারও শ্বাসরুদ্ধ বিবরণ দিচ্ছিল মৌসুমী, হাত পা নেড়ে, চোখ বড়ো বড়ো করে। তিথির বাড়িতে নাকি প্রচণ্ড অশান্তি চলছে পার্থর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে। সামনেই পার্ট ওয়ান পরীক্ষা। তিথি পড়াশোনাও করতে পারছে না। সে খুব চাপা স্বভাবের মেয়ে, মৌসুমীর সঙ্গে আজকাল দেখাসাক্ষাৎও কম হয়। সেদিন মৌসুমী ওদের বাড়িতে গিয়েছিল। তিথি নাকি কেবলই কাঁদছিল আর বলছিল—হয় সে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে, নয় আত্মহত্যা করবে।

মৌসুমী জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুই এত ভেঙে পড়ছিস কেন? ক-দিন একটু চুপচাপ থাক না, বড়দাকে বল তোর সঙ্গে এখন ক-দিন দেখা না করতে। তাহলেই মাসিমা একটু ঠান্ডা থাকবেন।’

‘মৌ তুই আমার অবস্থা জানিস না’। তিথি বলেছিল, ‘কেউ আমার কথা শুনছে না, বুঝছে না। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দিনরাত গণ্ডগোল আর ওদিকে পার্থ রোজ বলে চলে আসতে...আমি কোথায় যাব, আমার পড়াশোনারই-বা কী হবে, এ বছর পরীক্ষাও দিতে পারব কি না জানি না!’ সে হাউমাউ করে কাঁদছিল।

মৌসুমীর খটকা লেগেছিল, ‘বড়দা তোকে চলে আসতে বলে মানে? কোথায়, ওদের বাড়িতে? তোদের কি বিয়ে হয়ে গেছে যে বড়দা তোকে ও বাড়িতে রাখবে?’

তিথি নিঃশব্দে কাঁদছিল, কোনো উত্তর দেয়নি। ওর মুখ দেখে মৌসুমী স্পষ্ট বুঝেছিল সে কিছু একটা লুকোচ্ছে। আর-একটু ঝাকুনি দিতেই তিথি ভেঙে পড়ল। মৌসুমীকে সব বলে দিল সে।

মৌসুমী অলককে বলল, 'আমার বন্ধু খুব ভালো মেয়ে, জেঠু। বড়দাকে সত্যি সত্যি ভালোবাসে। আমি কিন্তু বড়দাকেই দোষ দেব, বড়দা এটা খুব অন্যায় করেছে।'

মিতাও বললেন, 'ছি ছি, পার্থর তো একবার ভেবে দেখা উচিত ছিল। মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে যাবে বলছে, অথচ এদিকে আপনি কিছু জানেন না। কী খাওয়াবে ও তিথিকে? তা ছাড়া তিথি মৌয়ের বন্ধু, ওর বাড়ির লোক তো আমাদেরই দোষী করবে!'

অরূপ চেম্বার থেকে বাড়ি এসে দেখলেন, অলক একটা ধ্বংসস্তূপের মতো বসে আছেন সোফাতে, সামনে গম্ভীরমুখে মিতা আর মৌসুমী। অলকের পাশে বসে টাই-এর গিঁট আলগা করতে করতে দাদার দিকে তাকালেন অরূপ, 'সব শুনেছ নিশ্চয়ই!'

অলক নিরুত্তর।

অরূপ কঠোর গলায় বললেন, 'পার্থটা একটা ওয়র্থলেস আমি জানতাম। কিন্তু এতটা ইরেসপনসিবল্‌, রাশ, আমার জানা ছিল না। সত্যি দাদা, তোমার জন্যে আমার দুঃখ হয়। আই ফিল ফর ইউ।'

১০

তিথি মৌসুমীকে যে কথাগুলো বলেছিল তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। সে আজকাল আত্মহত্যার কথা ভাবে। গত এক বছরে অনেকবার ভেবেছে। সত্যি সত্যিই যে পরিস্থিতির মধ্যে তার দিন কাটছে তাতে আত্মহত্যা করলেই তার মুক্তি। সে একটা ধারালো সাঁড়াশির মুখে আটকে আছে, সাঁড়াশিটা তাকে দু-দিক থেকে চেপে ধরে একটু একটু করে কাটছে, একেবারে মেরে ফেলছে না।

রেজিটা হয়ে যাওয়ার পর পার্থর মধ্যে একটা তীব্র পরিবর্তন লক্ষ করেছে তিথি। পার্থ তাকে আর প্রেমিকার মতো আদর করতে চায় না, বউয়ের মতো ভোগ করতে চায়। আগেও পার্থ তার শরীর চেয়েছে, কিন্তু তিথি আপত্তি করলে জোর করেনি। তিথির এ জন্যে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, সে কৃতজ্ঞ ছিলও। বিয়ের পর পার্থ স্বভাবতই আর বাধা মানছে না।

পার্থ তাকে একবার চিঠিতে লিখেছিল সে ঠিক কীভাবে তার দেহকে কল্পনা করেছে, সেই দেহের কোথায় কীভাবে সে আদর করতে চায়। তিথি সে চিঠি প্রথমে ছিঁড়ে ফেলেছিল। পাপবোধে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল তার মন। কিন্তু ছিঁড়ে ফেলার একটু পরেই, সেই ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলো দেখতে দেখতে তার পাপবোধ ছাপিয়ে উঠেছিল খুব নতুন একটা তীব্র ভালোলাগা। প্রবল আকর্ষণ অনুভব করেছিল সে চিঠির ওই গর্হিত নির্লজ্জ শব্দগুলির প্রতি, লোভ হয়েছিল আবার চিঠিটা পড়ে। ছেঁড়া টুকরোগুলো খুঁজে খুঁজে সাজিয়ে আবার পড়েও ছিল সে।

ওই শব্দগুলো তিথিকে যেন শরীরী চেতনায় দীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু সত্যি সত্যি পার্থকে শরীর ছুঁতে দিতে সে ভয় পেত। পার্থ মুখে তাকে অনেক কিছু বলত, সেসব শুনে তিথির যেমন ভীষণ লজ্জা করত, তেমনই গভীর ভালোলাগাও গ্রাস করত তাকে। সে জানত, একদিন একটা কিছু ঘটবে তার জীবনে, খুব সুন্দর আর গোপন একটা ঘটনা, যেদিন তার আর পার্থর মধ্যে সমস্ত

আড়াল উড়ে যাবে আকাঙ্ক্ষিত ঝড়ে। তিথি সেই সুন্দর ঝড়ের অপেক্ষা করত।

কিন্তু প্রথম যেদিন ঝড়টা এল, তিথির মনে হল—সে যে সুন্দর ঝড়ের স্বপ্ন দেখেছিল এ তো সে নয়! বিয়ের কয়েকদিন পরেই পার্থ এক দুপুরে তাকে কলেজ থেকে নিয়ে এসেছিল স্বপনের বাড়ি। স্বপন পার্থর সেই বন্ধু দুটির মধ্যে একজন, যারা বিয়েতে সই করেছিল। স্বপনের ফ্ল্যাটটা পার্কসার্কাসে, তিনতলার ওপর ছোটো ওয়ান রুম ফ্ল্যাট, তিথির মনে হল ঠিক যেন পুতুলের বাড়ি।

স্বপন যেন বাইরে যাবার জন্যে সেজেগুজে প্রস্তুত হয়ে ছিল, তিথিকে দেখে হেসে বলল, 'আসুন মিসেস মল্লিক, আপনাদের দেরি দেখে একটু চিন্তা করছিলাম। হানিমুনের পক্ষে আমার খাটটা বেশ ছোটো, কিন্তু কী আর করা যাবে, আমি ব্যাচেলার...একা থাকি...' স্বপন মুখটাকে করুণ বানাতে বানাতে হো-হো করে হেসে উঠেছিল। তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে এক চোখ টিপে ডান হাতের বুড়ো আঙুল তুলে বলেছিল, 'ওকে, সি ইউ বোথ! এনজয় ইওরসেলভস্!'

তিথি কিছুই বুঝতে পারেনি। স্বপন কীসব ইয়ার্কি মারছে, তিথির ভালো লাগছিল না। তাকে বেরিয়ে যেতে দেখে বলল, 'এ কী! আমরা এলাম, আপনি চলে যাচ্ছেন?'

স্বপন যেন একটু থমকে গেছিল। পার্থ ওকে ইশারা করতে সে হেসে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। তিথি অবাক হয়ে পার্থর দিকে তাকিয়ে দেখল পার্থ পাঞ্জাবি খুলছে।

তিথি সেদিন ঢিলেঢালা চুড়িদার পরে ছিল। কমলা রঙের কামিজে সাদা সাদা বোতাম, যেগুলো সত্যি নয়। পার্থ প্রথমে সেই বোতামে হাত দিল, তিথি বিস্ফারিত চোখে বলল, 'কী?' পার্থ কামিজের নীচটা ধরে উলটে ওপরে তুলে দিল। জাপটে ধরে চুমু খেতে লাগল মুখে। তিথির চশমা খুলে যাচ্ছে দেখে সেটা টেনে নিয়ে ছুড়ে দিল খাটের ওপরে। পুরো ঘটনাটা ঘটে গেল এমন

মুখবন্ধহীনভাবে, এমন দ্রুত, তিথি বাধা দেওয়ার অবকাশই পায়নি। পার্থ যখন তার পিঠের দিকে হাত চালিয়ে ব্রা-এর হুক খুলে দিচ্ছে, সে তখনও যেন বুঝতেই পারছিল না পার্থ এমন করছে কেন। তারপর পার্থ যখন দাঁড়ানো অবস্থা থেকে তাকে খাটের ওপর চিত করে ফেলল, তিথির প্রায় অবশ দেহ–মন থেকে শুধু একটা কথাই এলোমেলোভাবে কেঁপে বেরিয়ে আসছিল, 'আহ্ না...না....না...না, ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও...'

পার্থ তাকে দু–হাত আর মুখ দিয়ে খাবলাচ্ছিল, তার বেশি কিছু করেনি। একটা কথাও বলছিল না সে। তিথির স্বরটা ক্রমশ অনিয়ন্ত্রিত গোঙানির মতো লাগছিল শুনতে। হঠাৎ পার্থ এক ঝটকায় উঠে বসে তিথির গালের পাশে হাত রেখে সংজ্ঞাহীন মানুষকে নাড়া দেবার মতো করে ঝাঁকুনি দিল, 'তিথি, ওরকম করছ কেন, আমার নিজেকে রেপিস্ট মনে হচ্ছে।'

তিথিরও যেন ওই ঝাঁকুনিতে চেতনা ফিরে এল। না না, সে ধর্ষিত হতে যাবে কেন? না ঈশ্বর! সত্যিই, সে এমন কেন করছে? সে তো বিবাহিত নারী, পার্থ তার স্বামী। পার্থ তাকে যা করছে এটা একটা শুদ্ধ স্বাভাবিক ব্যাপার, সে নিজেই এমন আচরণ করছে যাতে পুরো ঘটনাটাকে বীভৎস দেখাচ্ছে। তিথির মরে যেতে ইচ্ছে করছিল, সে নিজেকে পার্থর হাতে ধর্ষিত মনে করছিল—এই অপরাধে। সে নিঃশব্দে শুয়ে থাকল, চোখের কোণ থেকে কানের ফুটোর মধ্যে শিরশির করে ঢুকে যাচ্ছে গরম জলের ধারা—ওহ্ ঈশ্বর, একটুও বুঝি আনন্দ হয় না এতে! সারা শরীরে শুধু চাপ আর ব্যথা...

তারপর প্রথম যেদিন ওই স্বপনেরই ফাঁকা বাড়িতে, পার্থ তার সালোয়ারের দড়িতে হাত দিল, তিথি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিল। ছটফট করে বলছিল—'না, প্লিজ না, আমার ভয় করছে—'

'কীসের ভয়!'

'যদি...যদি কিছু হয়ে যায়!

পার্থ তিথিকে জড়িয়ে ধরেছিল, কানে চুমু খেতে খেতে বলেছিল, 'বোকা মেয়ে, আমাকে তোমার ভরসা হয় না?'

সে একটা হাত নিয়ে এসেছিল তিথির চোখের সামনে, হাতে একটা ছোট্ট প্যাকেট, চুইংগামের প্যাকেটের মতো। তিথি ওপরের লেখাটা পড়ল—'কোহিনুর'।

শব্দটা তিথির পরিচিত কি না তিথি জানত না। জানলেও সেটা ঠিক কী সে সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল একেবারে অস্পষ্ট। কিন্তু আজ ওই নামটা দেখামাত্রই যেন সব বুঝে গেল। দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলল সে।

বাঁধটা একবার ভেঙে যেতেই তিথি দেখল, তার আর তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। তার ভালোও লাগছে না, খারাপও লাগছে না। পার্থর সেই চিঠিটা পড়ে, কিংবা তার কথা শুনে তার শরীরে যে গোপন ঢেউ আসত, পার্থর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্কে সেটা আসে না। এরকমই হয়তো হয়, পার্থ তার ওপর থেকে নিজের শরীর সরিয়ে নেবার সময় প্রত্যেকবারই জিজ্ঞেস করো, 'তোমার ভালো লেগেছে তো?'

তিথি হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ে, নিজেকে প্রাণপণে বলে—হ্যাঁ হ্যাঁ, এইটাই ভালোলাগা, এভাবেই ভালো লাগাতে হয়।

এবারের পুজোতেও পার্থ বর্ধমানে গেল না। তার মায়ের জ্বর বলে মা আর বোনও যাননি। শুধু তার বাবাই গেছিলেন দেশের বাড়িতে। সপ্তমীর দিন তিথি আর পার্থ ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিল। একটা হোটেলে। খাতায় নাম লেখানোর সময় কাউন্টারের লোকটি তিথির দিকে উদাসীন তেরছা চোখে একবার তাকিয়েছিল। তিথির মনে হল খাতায় লেখা 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস' শব্দগুলোকে লোকটা আমল দিচ্ছে না। ইশ্‌ কী বিশ্রী লাগছে, সে যদি সিঁদুর পরত তাহলে নিশ্চয়ই কেউ খারাপ সন্দেহ করত না!

তিথির মনে হওয়া পুরোটাই ভুল ছিল। সেই হোটেলে যারা বিভিন্ন ঘরগুলো নিয়েছে, তারা যে প্রত্যেকেই অবিবাহিত নারী–পুরুষ স্পষ্টই বোঝা যায়। এ নিয়ে তাদের রাখঢাকও নেই। পাশের ঘর থেকে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারশুনে তিথি ভয় পেয়ে গেছিল, পরক্ষণেই শুনল সেই মেয়েটাই তীক্ষ্ণ সুরে খিলখিল করে হাসছে।

‘ওরকম করে হাসছে কেন মেয়েটা, কী বিচ্ছিরি!’ তিথির মুখে ঘৃণা।

পার্থ তার কোমর জড়িয়ে ধরে টানল, ‘বুঝতে পারছ না, ওরা ভালোবাসছে। এবার আমরাও বাসব।’

তিথির বিশ্বাস হয়নি। ভালোবাসার সময় কোনো মেয়ে বুঝি ওইরকম চেঁচায়? ছিঃ, এটা কেমন জায়গা! তিথি নিজেকে হোটেলের সেই অপরিসর ঘরে দাগ লাগা বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে সিটিয়ে উঠেছিল। গত পুজোর কথা মনে পড়ছিল তার, পার্থ সঙ্গে প্রথম পরিচয়, প্রেমে পড়া। আজ সে পার্থর স্ত্রী, কিন্তু...।

পার্থ তাকে আদর করছে। সে আর টুঁ শব্দটিও করে না, অনেক সময়ই দাঁতে দাঁত চেপে থাকে। নিজেকে ধর্ষিত ভাবতেই তার অসম্ভব ভয় করে। ধর্ষিত কারা হয়, সে কি তাদের মতো হতভাগ্য! ছি!

কিন্তু তিথি আর পারছে না। পার্থ তাকে মাঝ মাঝে পেয়েই তৃপ্ত নয়, তার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। স্বপনের বাড়ি আর হোটেল তো রোজ রোজ সম্ভব নয়। আজকাল রোজই তার সঙ্গে পার্থর দেখা হয়। পার্থ তাকে একই কথা বলছে, ‘আর পারছি না, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারছি না, তুমি চলে এসো।’ তিথির অস্থির অস্থির লাগে।

তার মানসিক অস্থিরতা থেকে থেকে বাড়ে। সে সময় মনে হয় নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়। তিথির ইচ্ছে করে সে চিৎকারকরে ওঠে, গলা ছেড়ে কাঁদে। এত চাপ সে আর বইতে পারছে না।

চাপের মুখে ভেঙে পড়েই মৌসুমীর কাছে সব বলে ফেলেছে সে। বলতে শুরু করে আর থামতে পারেনি। কিন্তু তারপরই ভয় করেছে তার, পার্থ তাকে নিষেধ করেছিল।

পার্থর সঙ্গে দেখা হতেই তিথি একটা মরিয়া ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'আমি মৌকে বলে দিয়েছি—'

'কী বলেছ?' পার্থ চমকে গেছিল।

'আমাদের বিয়ের কথা।' তিথি স্বীকারোক্তির ধরনে মাথা ঝুঁকিয়ে ছিল, ওইভাবেই বলল, 'আমি খুব সরি, কীভাবে যে বলে ফেললাম, আসলে আমি আর পারছি না...এইভাবে...,তুমি খুব রেগে যাচ্ছ, না! মিতাকাকিমারাও নিশ্চয়ই সব জেনেছেন...'

পার্থ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ভাবছিল। চিন্তিত স্বরে বলল, 'বলে ফেলেছ যখন তখন ভেবে আর কী লাভ!...দেখি...'

তিথির মনে হয়, এখন সবাই সব কিছু জেনে গেলেই ভালো। তার ইচ্ছে করে সবাইকে সে নিজেই সব জানিয়ে দেয়। তাহলে সে পার্থর কাছে চলে যেতে পারে। তা ছাড়া বোধ হয় তার সামনে আর অন্য পথ খোলা নেই। বাড়িতে অশান্তি চরম পর্যায়ে উঠেছে। প্রতিদিন বাড়ি ফিরে মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয় তার। মায়ের কথার জ্বালায় সর্বাঙ্গে লঙ্কাবাটার মতো জ্বলে। বাবা এতদিন তেমন মাথা ঘামাতেন না, আজকাল তিনিও রাগারাগি করেন। তমাল পাশ করার পর বাড়িতে এসেছিল। সে দিল্লিতে চাকরি পেয়ে গেছে। বাড়ি এসে সব শুনে তিথিকে শাসিয়েছে বাড়াবাড়ি করলে চাবকে তার পিঠের ছাল তুলে দেবে আর পার্থকে ল্যাম্প-পোস্টে বেঁধে মারবে। তিথি স্থিরচোখে দাদার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনেছিল। তার চোখে কোনো ভয় ছিল না, ছিল জেদ আর আক্রোশ। তমাল বোনের সেই ভঙ্গি দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিল, দিল্লি যাওয়ার আগে অদিতিকে বলে গেছে, 'তিথি টোটালি আউট অফ কন্ট্রোল হয়ে গেছে দেখছি, ওকে তো বাড়িতে বেঁধে রাখতে হবে!'

তিথি সেটা হওয়ার আগেই বাড়ি ছাড়বে, কিন্তু পার্থ তো তার জন্যে কোনো ব্যবস্থাই করেনি, কোনো প্রস্তুতিই নেয়নি। তার বোনেরও তো বিয়ে হয়নি এখনও। তিথি কোথায় যাবে? আর তার পড়াশোনা! পার্ট ওয়ান ড্রপ দিতে হবে মনে হচ্ছে, তার কোনো ক্লাসে পার্সেন্টেজও নেই। কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে তার জন্যে?

১১

অদিতিরও আর সহ্য হচ্ছিল না। তাঁর কেমন পাগল পাগল লাগে। একটা ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ফালতু অপদার্থ ছেলের মধ্যে কী দেখল তিথি যে সে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসেছে! রোজ বাড়ি ফিরতে রাত করে সে, দিনরাত কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে কাটায়। কোনো কথা বলতে গেলে হয় মুখে মুখে তর্ক করে, নয় দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে সোজা তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর দু-চোখ যেন ধক ধক করে জ্বলে। মেয়েটা কি পাগল-টাগল হয়ে গেল, ওকে কি কেউ সম্মোহন করেছে! তিনি নিজেও তো প্রেম করেছিলেন, এমন দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন দশা তো তাঁর হয়নি!

অদিতির মনে হয় এ অবস্থায় তাঁর আরও কঠোর হওয়া উচিত ছিল। বকুনি দিয়ে, শাসিয়ে, অপমান করে তিথিকে বাগ মানানো যাচ্ছে না। তমাল বলেছিল ওকে ঘরে আটকে রাখতে। না, এই সমস্ত অদিতি পারবেন না। তাঁর রুচিতে বাধে। তিথিকে মারধরও করেন না তিনি। এই অবস্থায় হয়তো সেটাই করা দরকার। কিন্তু ছেলেমেয়ের গায়ে কখনো হাত তোলেননি অদিতি। তিনি বিশ্বাস করেন, গায়ের জোরে যাকে শাসন করতে হয় সে অনেক আগেই শাসনের বাইরে চলে গেছে।

অদিতি পার্থকে আর দ্বিতীয়বার দেখেননি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিথি আর পার্থ যে অনেকদূর এগোচ্ছে, তাঁর মায়ের দৃষ্টি সেটা ধরে ফেলেছিল। তিথি রাত করে ফিরে যখন বাথরুমে চলে যায়, তাঁর ঘৃণাবোধ হতে থাকে।

তিথি আজ আবার রাত করছে। রাত ন-টার আগে আজকাল আর অপেক্ষা করা ছেড়েই দিয়েছেন অদিতি। কিন্তু আজ পৌনে দশটা বাজতে চলল।

বিশ্বনাথ অস্থির হয়ে বললেন, 'দশটা বেজে গেল এখনও পাত্তা নেই, একেবারে গোল্লায় গেল মেয়েটা? একবার মৌসুমীদের

বাড়ি যাব?’

‘তিথি ওখানে নেই।’

বিশ্বনাথ অধৈর্য গলায় বললেন, ‘ওদেরই সমস্ত দোষ। ওরা সব জানে, একটা বদমাইশ ছেলে তিথিকে বোকা পেয়ে—’

‘তাই তুমি ওদের বাড়ি গিয়ে ঝগড়া করতে চাও?’ অদিতি নিজেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘তোমার লজ্জা করবে না? ছেলেটা বদমাইশ, আর তোমার মেয়ে ধোয়া তুলসীপাতা, না? ছেলে ওদের, কিন্তু মেয়ে তো আমাদের। সে নিজেই আমাদের মুখে চুনকালি মাখাচ্ছে। মাখাক। সে মুখ আবার লোককে দেখাতে যাওয়া কেন?’

বিশ্বনাথ অন্যদিন চুপ করে যান, আজ তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘খুব তো বলছ, তুমিই পারোনি ওকে শাসন করতে, নইলে ব্যাপার অ্যাদ্দূর গড়াতই না—’

‘ও আচ্ছা! কী করব আমি? বস্তিবাড়ির মতো পেটাব মেয়েকে? ঘরে বন্ধ করে রাখব? রাখলে ও থাকবে? তা কেলেঙ্কারি সব আমাকেই বা করতে হবে কেন? তুমিও কিছু করো, আমি দেখি তোমার কতদূর ক্ষমতা?’

সওয়া দশটারও পরে তিথি যখন ফিরল, অদিতি বিশ্বনাথ তখনও অসহায় আক্রোশে পরস্পরের ওপর দোষারোপ করছিলেন। তিথি ঘরে ঢুকতেই অদিতি তার চুলের মুঠি ধরলেন। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এসে ওর মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললেন, ‘বল কোথায় গিয়েছিলি, বেহায়া বেয়াদব মেয়ে, বল কোত্থেকে এলি এতরাত্রে হারামজাদি...’ অদিতির সমস্ত ধৈর্য আর রুচির আত্মাভিমান ভেসে গেছিল।

তিথি চুল ছাড়াল না, চুলের টানে তার ঘাড় কাত হয়ে বেঁকে আছে। ওই অবস্থাতেই কেটে কেটে বলল, 'গেছিলাম ডায়মন্ডহারবার।'

বিশ্বনাথ ফ্যালফ্যাল করে মেয়েকে দেখছিলেন। অদিতি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কেন গিয়েছিলে?'

'একটা হোটেলে ছিলাম। আমি আর পা—'

অদিতি ঠাস করে একটা চড় কষালেন তিথির গালে। তারপর চুলের মুঠি ছেড়ে দিয়ে হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন, বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এ মেয়েকে আমি কিছু করতে পারব না, ও সর্বনাশের রাস্তায় পা বাড়িয়ে আছে। তুমি ওকে মারো, ওকে মারো, এই সর্বনাশ হতে দিয়ো না...'

বিশ্বনাথ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। এ অবস্থায় কী করতে হয় তাঁর জানা নেই। তার ওপর জীবনে এই প্রথম অদিতিকে এভাবে খানখান হয়ে ভেঙে পড়তে দেখে তিনি বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন।

মার খেয়ে তিথি কাঁদল না। নির্লজ্জ সত্যি কথা বলতে তার ভয়ও করেনি একটুও। এই সত্যির মধ্যে স্বীকারোক্তির ভঙ্গি ছিল না, কোনো মরিয়া ঔদ্ধত্যও নয়। অত্যন্ত নির্বিকারভাবে সে হয়তো আরও কিছু বলতে পারত, অদিতি তার আগেই তাকে থামিয়ে দিলেন। এখন মাকে কাঁদতে দেখেও সে খুব সহজ শীতল ভঙ্গিতে নিজের ঘরে চলে গেল।

সকালে তিথি যখন বেরোচ্ছে, অদিতি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সারারাত ঘুমোননি, চোখ দুটো খুব লাল হয়ে আছে। তিথি মায়ের দিকে তাকাল না। অদিতি বললেন, 'কিছু খেয়ে বেরোলি না?' তাঁর স্বর স্তিমিত, ক্লান্ত। তিথি জুতোর র‍্যাপ বাঁধছিল, উত্তর দিল না।

‘তিথি!’

তিথি সতর্ক হয়ে উঠল। অদিতি তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর স্বরে আক্রমণ নেই, আকুলতা আছে। তিনি হঠাৎ তিথির হাত ধরে ফেললেন, তাঁকে হঠাৎ কেমন বিপন্ন দেখাচ্ছিল।

‘আহ্ ছাড়ো!’ তিথি হাত টেনে নিতে চাইল।

‘কোথায় যাচ্ছিস?’

এ কথার তিথি কোনো উত্তর দিল না। সজোরে মায়ের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খুব ঠান্ডা গলায় বলল ‘ছাড়ো মা, আমাকে যেতে দাও, দেরি হয়ে যাচ্ছে।’

‘ফিরবি তো?’ অদিতি যেন হাহাকার করে উঠলেন। তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, বার বার খালি মনে হচ্ছে তিথি রোজকার মতো কলেজ যাচ্ছে না, একেবারে চলে যাচ্ছে। আর একবার তার হাত ধরার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ‘তিথি, লক্ষ্মী সোনা মা আমার, বাড়ি ফিরো কিন্তু—’

তিথি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। অদিতি সিঁড়ির মুখে এসে নীচে ঝুঁকে পড়লেন, ‘আমি, আমি ক্ষমা চাইছি তিথি...আর কক্ষনও তোর গায়ে হাত তুলব না...মা, শোন, তিথি...’

তিনি জানেন পিছু ডাকতে নেই, কিন্তু তিনি ডেকেই যাচ্ছিলেন।

তিথি সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় বেরিয়ে প্রায় দৌড়োচ্ছিল।

১২

তিথিকে পার্থ বিয়ের পরেও যে ক–দিন বাড়িতে নিয়ে এসেছে, অলকের সঙ্গে একদিনও তার দেখা হয়নি। পার্থ এটা খুব সচেতনভাবেই চেয়েছিল।

বাবার সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল। বাবাকে সে মনে মনে অপছন্দই করে, অলকও তাই। কিন্তু সে বাবার সঙ্গে একই বাড়িতে একই ছাদের তলায় থাকে, এমনকী, এক বিছানায় পাশাপাশি শোয়ও। এটা এক ধরনের সমঝোতার ব্যাপার। এই সমঝোতায় যদিও পার্থর লাভই বেশি, সে এমন ভাব করে যেন যে-কোনোদিন সে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারে।

সে বাড়িভাড়া আর ইলেকট্রিক বিলের টাকা দেয়। তারা অনেক কালের ভাড়াটে, বাড়িভাড়াও সামান্য। কিন্তু সেই টাকাটা প্রতি মাসে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়, ইলেকট্রিক বিলও তাই। তবে সে হিসেব রাখে। চার-পাঁচ-ছয় মাস অন্তর অন্তর, যখন তার হাতে টাকা আসে তখন থোকে টাকাগুলো মিটিয়ে দেয়। দেরি হলে অলক খোঁটা দিতে ছাড়েন না, প্রত্যক্ষ পরোক্ষে অনেক অপমানকর মন্তব্য করেন। পার্থ সেগুলো চুপচাপ সহ্য করে। যখন সে টাকা দেয় তখন তার দেওয়ার ভঙ্গিতে অভিমান ফুটে বেরোয়, অলক টাকাগুলো নিতে নিতে বলেন— ‘হুঁ, ধন্য করে দিচ্ছেন।’

পার্থ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেনি। বেলুড় বিদ্যামন্দিরে কেমির্ নিয়ে পড়তে পড়তে ফার্স্ট ইয়ারেই পালিয়ে গিয়েছিল পুনেতে, ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভরতি হবে বলে। বন্ধুদের কাছে ধার করে যাওয়ার ভাড়া জোগাড় করেছিল। বম্বে থেকে সে যখন পুনের ট্রেনে উঠল, টিকিট ছাড়া তার পকেটে ছিল বাইশ টাকা। পকেট একেবারে ফাঁকা থাকলেও সে সামলে উঠতে পারত, যদি না তার কপালটাই ফাঁকা হত।

পুনে যাওয়ার পথেই ট্রেনে আলাপ হয়েছিল একটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে। ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আর তাঁদের মেয়ে। মেয়েটি কলকাতায় থেকে পড়ে, আই. সি. এস. সি. পরীক্ষা দিয়ে মা-বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছে। ওঁরা পুনের বহুদিনের প্রবাসী বাঙালি। পার্থর সঙ্গে নিজে থেকেই ভদ্রলোক কথা বলতে শুরু করেছিলেন। তাঁর নাম মিস্টার চ্যাটার্জি। পরে তাঁর স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গেও আলাপ হল। সবারই ব্যবহার খুব মিষ্টি। কথায় কথায় তাঁরা পার্থর বিষয়ে জানতে চাইলেন। পার্থ কিছু গোপন করেনি। বলছিল, সে বাড়িতে না জানিয়ে পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভরতি হতে যাচ্ছে।

মিস্টার চ্যাটার্জি সকৌতুকে বললেন, ‘নায়ক হতে চাও?’

‘না, না’, পার্থ প্রতিবাদ করল, ‘এই চেহারায় নায়ক হওয়া যায় না আমি জানি, আমি ফিল্ম ডিরেকশনের কোর্স করব।’

‘চেহারা তোমার খারাপ নয়, শুধু একটু রোগা’, মিসেস চ্যাটার্জি সস্নেহে বললেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। একটু পরে মিস্টার চ্যাটার্জি বললন, ‘কিছু মনে কোরো না, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ইয়ং ম্যান। এসবে তো টাকাপয়সার ব্যাপার আছে, তোমার কাছে কি—’

পার্থ একমুহূর্ত দ্বিধা করেছিল। তারপর মাথা নেড়েছিল—না, তার কাছে কিছুই নেই।

এর পরের অংশটুকু একটি সম্পূর্ণ স্বপ্নের মতো হতে পারত। ঘটনা সেই দিকেই এগোচ্ছিল। মিস্টার এবং মিসেস চ্যাটার্জি পার্থকে বোধ হয় খুবই পছন্দ করে ফেলেছিলেন। বিদেশবিভুঁইয়ে একটি অসহায় অল্পবয়সি বাঙালি তরুণকে দেখে তাঁদের মায়া হয়ে থাকবে। তাঁরা পুনেতে নেমে পার্থকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যান। বিরাট বাড়ি। মিস্টার চ্যাটার্জি পার্থকে বললেন, ‘তুমি যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারো, আমরা খুশি হব।’

কৃতজ্ঞতায় পার্থর মুখে কথা সরছিল না, কোনোরকমে বলল, ‘আপনারা যে আমার কী উপকার করলেন—’

‘না না,’ মিস্টার চ্যাটার্জি তাড়াতাড়ি পার্থর কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস চাপা দেওয়ার জন্যে বললেন, ‘উপকার-টুপকার নয়, যেটুকু আমাদের কর্তব্য বলে মনে করছি সেটুকুই—’ তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল লজ্জা পাচ্ছেন। একটু পরে বলছিলেন, ‘আর বাড়িতে একটা চিঠি লিখে দাও, এখানকার ঠিকানা দিয়ে, তোমার খবর জানিয়ে। তোমার মা-বাবা দুশ্চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই, তাঁরা একটু নিশ্চিন্ত হবেন।’

পার্থ সেটাই করেছিল। মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিয়েছিল সে ভালো আছে, তার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। কী কারণে সে এভাবে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে সেটা যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করে শেষে লিখেছিল, ‘তোমরা আজ হয়তো ভাবছ আমি ভুল করেছি, অন্যায় করেছি, কিন্তু যেদিন আমি অনেক অনেক বড়ো হব, বুঝতে পারবে কেন আমি এমন করলাম।’

মিস্টার চ্যাটার্জির মেয়ে সুদক্ষিণার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল ট্রেনেই, বাড়িতে এসে বন্ধুত্ব হল। সুদক্ষিণা সুন্দরী আর দারুণ খোলামেলা। এরকম কোনো মেয়েকে পার্থ আগে দেখেনি। সুদক্ষিণারও বোধ হয় এই ঘর পালানো সদ্য দাড়ি-গজানো ছেলেটিকে দেখে খুব কৌতূহল হয়ে থাকবে। ওরা প্রেমে পড়ল।

কিন্তু একটা ব্যাপারে পার্থ প্রচণ্ড ভুল করে ফেলেছিল। সে এখানে পৌঁছে বুঝতে পারল একেবারে কোনো খোঁজখবর না নিয়ে শুধু স্বপ্নে ভর করেই সে এতদূর চলে এসেছে। পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভরতি হতে গেলে একটা সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসতে হয়, সে জানত না। তা ছাড়া, সেখানে ভরতি হওয়ার সময়ও এটা নয়। এমনি এমনি কপর্দকহীনভাবে সে যেভাবে পুনে পাড়ি দিয়েছে একে বোকামিই বলে। মিস্টার চ্যাটার্জিরা না থাকলে তাকে এতদিনে বোধ হয় না খেয়ে মরতে হত।

তার চিঠি মা-বাবার কাছে পৌঁছেছিল কি না সে জানে না, পৌঁছোলেও তার প্রতিক্রিয়া কী ছিল, তার বক্তব্যের মর্ম আদৌ তাঁদের

কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছিল কি না, এসবও তার অজানা। কিন্তু দিন পনেরো পরে বাবাকে পুনে পৌঁছোতে দেখে সে প্রমাদ গুনল। এই ঠিকানা তার চিঠি থেকেই বাবা পেয়ে থাকবেন, সেটাই স্বাভাবিক; কিন্তু তার কাছে সমস্ত পরিষ্কার হয়ে গেল যখন সে শুনল অলক মিস্টার চ্যাটার্জির দু-হাত ধরে বলছেন, 'আপনার কাছে যে আমি কত ঋণী সে মুখে বলে বোঝাতে পারব না। আপনার চিঠি পেয়েই ট্রেনে চেপেছি।'

চলে আসার সময় মিস্টার চ্যাটার্জি আর তাঁর স্ত্রী পার্থকে বার বার করে চিঠি লিখতে বলেছিলেন, আবার আসার কথাও বলেছিলেন। সুদক্ষিণা কেঁদেছিল, আর চুপিচুপি বলেছিল, 'কয়েক দিনের মধ্যেই আমি আবার কলকাতায় দাদু-দিদার কাছে চলে যাব। প্রেসিডেন্সিতে ইংলিশ অনার্স নেব। বাবারও তাই ইচ্ছে কেন কি বাবাও প্রেসিডেন্সির ছাত্র ছিল। তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

কলকাতার ফিরে আসার পর অলক পার্থকে আবার বেলুড়ে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। পার্থ যায়নি। সে তখন পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখে ফেলেছে, কেমিতিতে মন দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

অলক যখন তাকে বললেন, 'পড়বি না তো বেরো বাড়ি থেকে, বেরিয়ে যা—' সে সত্যি সত্যি বেরিয়ে আসছিল। সুধা ছুটে এসে তাকে আটকালেন, স্বামীর দিকে তাকিয়ে কান্নাভরা গলায় বললেন, 'না, ওর যা ইচ্ছে ওকে তাই করতে দাও। একবার ও বাড়ি থেকে চলে গিয়েছিল, তখন আমি কী করে সহ্য করেছি আমিই জানি। আবার ওকে চলে যেতে বললে আমিও ওর সঙ্গে যাব।'

পার্থ কলকাতায় রয়ে গেল। সুদক্ষিণার জন্যে অপেক্ষা করেছিল সে। সুদক্ষিণা এসেও ছিল। পরের পাঁচ বছর ধরে গভীর প্রেম চলল তাদের। তারপর হঠাৎই সুদক্ষিণা ফিরে যায় পুনেতে। ফিরে গিয়ে পার্থকে একটা চিঠি দেয়। এই কথা জানিয়ে, যে তার মা-বাবা বম্বের এক ডাক্তার পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের ঠিক করেছেন। পার্থ যেন তাকে ভুলে যায়।

সুদক্ষিণা হয়তো ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তার চিঠিতে সেরকম কোনো আভাসও ছিল না। বরং পার্থর মনে হয়েছিল, সুদক্ষিণা যেন খুশি। ব্যাপারটা মেনে নিতে কষ্ট হয়েছিল তার, অনেকদিন সুদক্ষিণাকে ভুলতে পারেনি সে। তারপর তিথির সঙ্গে দেখা। তিথিকে এই সবকথাই বলেছে সে। তার এখন মনে হয়, ভালোই হয়েছে সুদক্ষিণার সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে গিয়ে। সে ছিল তেজি আর খামখেয়ালি নদীর মতো, আর তিথি যেন শান্ত একটা দিঘি, নিশ্চিন্তে স্নান করা যায়।

পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে তার পড়া হয়নি। কলকাতাতেই সে এদিক ওদিক খোঁজখবর নিতে শুরু করল। এডিটিং-এর বিদ্যে রপ্ত করল কিছু কিছু। বড়ো পর্দার নয়, ইউম্যাটিক ভিডিওর কাজ। অন্তত কিছু রোজগার তো চাই। এই লাইনে বন্ধুবান্ধবও হল কিছু, তাদের সূত্রে কিছু কাজও আসে হাতে। বেশিরভাগই অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হিসেবে। দু-একটা ছোটোখাটো কাজ অবশ্য সে একাই নামিয়েছে। এগুলো সবই টিভির জন্যে তৈরি করা অনুষ্ঠান, যার অধিকাংশই টিভিতে দেখানো হয় না। তা না হোক, ওতে পার্থর এসে যায় না। এ সমস্ত করেই হাতে মাঝেমধ্যে চার-পাঁচ হাজার টাকা আসে তার, তাও অনেক ঘোরাঘুরির পর, পাঁচ–ছয়মাস কি তারও বেশি সময় অন্তর। তবু সে এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে আছে। আজ সে যে জায়গায় সেখানেই তো চিরদিন আটকে থাকবে না, প্রতীক্ষা যত দীর্ঘই হোক না কেন—সে ভাবে। তার স্বপ্নগুলো বরাবরই তার তুলনায় আকারে আয়তনে অনেক বড়ো, সে দু–হাতে জাপটেও ঠিক সামলাতে পারে না। কিন্তু স্বপ্ন তো এমনই হয়!

যখন তার সমবয়সি চেনা পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয় প্রতিবেশী ছেলেরা স্বপ্ন দেখেছে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিএ, নিদেনপক্ষে সরকারি আমলা হওয়ার, সে স্বপ্ন দেখেছে সত্যজিৎ রায়ের মতো পরিচালক হবে। কীভাবে যে এই স্বপ্নের বীজ তার মধ্যে উড়ে এসে পড়ল, আলো হাওয়া জল পেয়ে তরতর করে বেড়ে উঠল স্বপ্নের চারাগাছ, সে জানে না। পরে সে নিজে নিজেই এ বিষয়ে বইপত্র জোগাড় করে পড়াশুনা করেছে, খুঁজে খুঁজে বিশ্ববিখ্যাত পরিচালকদের ছবি দেখেছে। ছবি দেখে বেরিয়ে এসে তার মনে হয়েছে এঁরাও কি জানতেন, বিশ্বে এত কিছু করার থাকতে তাঁরা ছবি বানাতে চেয়েছিলেন কেন। ভাগ্যিস চেয়েছিলেন, তাই না বার্গম্যানের সাইলেন্স, বুনুয়েলের ভিরিডিয়ানা, ত্রুফোর কুলেজিম, ঋত্বিকের কোমল গান্ধারের মতো ছবি সম্ভব হয়েছে। সেও

এঁদেরই মতো মহৎ সিনেমা সৃষ্টি করতে চায়, এই মহৎ স্বপ্নই তাকে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে বাধ্য করে।

দশ বছর আগে অলক পুনে থেকে ঘাড় ধরে ছেলেকে নিয়ে এসেছিলেন, তারপর থেকেই পার্থর সঙ্গে তাঁর অগাধ দূরত্ব। অতদূর থেকে ছেলেকে নিয়ে আসতে তাঁর একরাশ টাকা খরচ হয়েছিল, কিন্তু কী করবেন, একটা মাত্র ছেলে। ভয়ও পেয়ে গিয়েছিলেন খুব। সুধা কেঁদেকেটে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। পুনের সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে চিঠি না পেলে ছেলেকে হয়তো ফিরেই পেতেন না।

অলক ভেবেছিলেন, এসব বয়সে ছেলেদের মাথায় অনেক ভূত চাপে। ভূত নামতেও দেরি হয় না। কিন্তু পার্থর ভূত নামল না। যে যখন পড়াশুনাই ছেড়ে দিল, অলক প্রথম কিছুদিন রাগারাগি লাফালাফি চেঁচামেচি করলেন, তারপর আর কোনো আশা না দেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

সেই থেকে দুজনে একই বাড়িতে থাকেন কিন্তু পারতপক্ষে বাবা আর ছেলের মুখোমুখি দেখা হয় না। অলক ন–টার সময় যখন ভাত খেয়ে অফিসে বেরোন, বেশির ভাগ দিনই পার্থ তখনও ঘুম থেকে ওঠে না। অলক যখন বাড়ি ফেরেন, পার্থ তখনও বাইরে। সে কোথায় যায়, কী করে, আদৌ কিছু করে কি না এসব সম্বন্ধে অলকের ধারণা স্পষ্ট নয়। আগে তিনি সুধাকে জিজ্ঞেস করতেন, এখন আর করেন না। তার কারণ, তিনি দেখেছেন সুধার পার্থর প্রতি একটা অকারণ পক্ষপাতিত্ব আছে, যেন তিনি সর্বশক্তি দিয়ে ছেলেকে স্বামীর ভর্ৎসনার হাত থেকে আড়াল করতে বদ্ধপরিকর। অলকের মুখ থেকে পার্থ সম্বন্ধে একটিও বিরূপ বাক্য উচ্চারিত হলে তিনি অযৌক্তিক তর্ক করেন, কখনো কেঁদেও ভাসান। তাঁর ভয়, অলকের গঞ্জনায় ছেলে ফের বাড়ি-ছাড়া না হয়। পার্থ অবশ্য গত দশ বছরে মাঝেমধ্যেই সে হুমকি দিয়েছে, তবে সত্যি সত্যি কোথাও যায়নি।

অলক একবার বলেছিলেন, ‘তুমি ভাবো ও বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। যাবেটা কোথায়? একবার বাপ নিজে গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল, আর যে আনবে না সে ও ভালোই বোঝে। বিনে পয়সার বাপের হোটেল ছেড়ে যাবে কোথায় ও?’

সুধা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ও বুঝি তোমার সংসারে কিছু দেয় না? ওকে দু-চক্ষে দেখতে পারো না তুমি, নিজের ছেলের সঙ্গে এ কী ব্যবহার!'

'দেখতে পারি না কি আর সাধে! আমি বুড়ো বাপ খেটে খেটে মরে যাচ্ছি আর সোমত্ত ছেলে কোনো কাজকর্ম নেই, পড়াশোনাও করল না, চাকরি-বাকরির পথ নিজেই বন্ধ করল। অপদার্থ ধাড়ি ছেলে কোলে নিয়ে বসে থাকতে মায়ের লজ্জা হয় না সুধা, বাপেরই লজ্জা হয়।'

'ছেলেকে অপদার্থ বলছ, তুমিই-বা কোন পদার্থটা শুনি? বর্ধমান থেকে এসেছি আজ পঁচিশ বছরের ওপর। সেই এক ভাঙা বাড়িতেই পড়ে আছি। মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত দিতে পারলাম না এখনও। সবাই এখানেই কত কী গুছিয়ে নিচ্ছে। আর তুমি এখনও বর্ধমানে ফিরে যাওয়ার খোয়াব দ্যাখো!'

অলক আর কথা বাড়ান না। সুধা তাঁর আসল দুর্বলতার জায়গাতে ঘা দিয়েছেন। ইচ্ছে করেই দিয়েছেন। কলকাতায় আসার পর থেকেই এই নিয়ে সুধার সঙ্গে তাঁর অশান্তি হত। তিনি চাইতেন দেশে ফিরে যেতে, কারণ এখানে কিছু হচ্ছে না। সুধা যেতে দেননি। তাঁর আশা ছিল কলকাতাতে থাকলেই তাঁদের অবস্থা ফেরার সম্ভাবনা। সে আর সম্ভব হয়নি। এর জন্যেও সুধা স্বামীকেই দায়ী করেন। তাঁর এ বিরক্তি যাওয়ার নয়। ছেলের দোষ তিনি ধরেন না, ছেলের কথা উঠলে শেষ পর্যন্ত স্বামীকে খোঁটা দেন।

পার্থর ওপরে সুধার অসীম প্রশ্রয়। কিন্তু পার্থর এভাবে বিয়ে করায় তাঁর ঠিক সায় ছিল না। পার্থ যখন তাঁকে প্রথম বলেছিল তিথিকে সে বিয়ে করবে ঠিক করেছে, সুধা বলেছিলেন, 'তুই বিয়ে করলে সীমার কী হবে!'

'কেন মা, আমি বিয়ে করলে কি ওর বিয়ে হবে না ভেবেছ?'

'না, তা নয়—।' সুধা চুপ করে গেলেন। তিনি শুধু একটা কথাই মুখ ফুটে বলেছিলেন। তাঁর বলার ছিল অনেক কিছু।

প্রথমত কাগজে সই করে বিয়েটা ঠিক কতটা সত্যিকারের বিয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। তা ছাড়া জাতেরও এত অমিল। আর যদি এটা বিয়ে হয়ও, তাহলে বিয়ের পরে বউ কোনো সধবার চিহ্ন ধারণ না করে কুমারী মেয়ের মতো বাপের বাড়ি থাকবে, এতে তাঁর ছেলের অকল্যাণ হবে না? তবে পার্থ বলেছে কিছুদিন পর সেও বউকে এখানে নিয়ে আসতে চায়। সুধার আসল ভয় সেখানেই। তাঁর স্বামী এখনও পর্যন্ত কিছু জানেন না। তখন জানলে তিনি কী করবেন? ভয়ে সুধার বুক টিপ টিপ করে। এতদিন তিনি ছেলেকে প্রাণপণে আড়াল করে এসেছেন, সেদিন স্বামীকে সামলাবেন কী করে!

কিন্তু এত কথা পার্থকে কিছুই বলতে পারলেন না সুধা। জাত–টাত আজকাল আর কেউ মানে না। পার্থকে সে বিষয়ে কিছু বলে লাভ নেই। তা ছাড়া, তাঁর বয়স্থ ছেলে বিয়ে করতে চলেছে, মা হয়ে কোন মুখে তাতে আপত্তি করেন তিনি! তিনি কি চান না তাঁর ছেলের বিয়ে হোক। আহা ষাট, ভগবান মুখ তুলে চাইলে সীমার বিয়েটাও যেভাবে হোক তিনি তাড়াতাড়ি দিয়ে দেবেন।

এ বাড়িতে জলের ব্যবস্থা টাইমকলে। কলে জল এলে বালতি ভরে জমিয়ে রাখতে হয়। এই কাজটা সীমাই করে। আজ সে বাড়ি নেই। বিকেলে পাড়াতেই একজনের বাড়ি গেছে সে-বাড়ির মাসিমার কাছে টেবিলঢাকার এমব্রয়ডারি তুলতে। যাওয়ার আগে চারটে লোহার বালতিতে জল অবশ্য ভরে রেখে গেছে সে, বালতিগুলো শুধু বাথরুমেই তোলা হয়নি।

সীমা এখনও ফেরেনি। সুধা কলতলায় ছিলেন। জলভরা বালতিগুলো টেনে টেনে নিয়ে আসছিলেন বাথরুমে। অলকও ফেরেননি এখনও। পার্থর তো বাড়ি ফেরার সময়ই নয় এটা। বাইরের দরজা খোলা ছিল। খোলাই থাকে। দরজাটা কলতলার সোজাসুজি, কেউ এলে সুধা দেখতে পাবেন।

জল টানতে টানতে সুধা শুনতে পেলেন দরজায় আওয়াজ হল। মুখ তুলেই দেখতে পেলেন অলক স্খলিত পায়ে ঘরে ঢুকে

মেঝের ওপর এলিয়ে বসে পড়ছেন।

‘ও কী, কী হল গো—’ সুধা বালতি রেখে হাঁকপাক করে ছুটে এলেন। অলকের চোখ বন্ধ। সুধা তাঁর কাঁধ ধরে নাড়া দিলেন, ‘কী হয়েছে, শরীর খারাপ করল নাকি, কথা বলছ না কেন—’ তাঁর স্বর ভয়ার্ত।

অলক চোখ মেলে তাকালেন। তাকিয়েই রইলেন সুধার দিকে। তাঁর রকম–সকম দেখে সুধার হাত পা ছেড়ে যাচ্ছিল। এমন করছে কেন মানুষটা!

হঠাৎ অলকের বাক্যস্ফূর্তি হল। তিনি তীব্রস্বরে বলে উঠলেন, ‘চক্রান্ত! অ্যাঁ, এত বড়ো চক্রান্ত! আমাকে না জানিয়ে ছেলের বিয়ে দিয়ে দিলে?’

সুধা মূর্তির মতো জমে গেলেন। তাঁর আড়ষ্টতা লক্ষ করে অলকের গলায় আক্রোশ উঠে এল, তিনি দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, ‘কতদিন লুকিয়ে রাখবে ভেবেছিলে কথাটা? তোমার গুণধর তো বউ নিয়ে এইখানেই ওঠবার প্ল্যান করছে শুনে এলাম। ওকে বলে দিয়ো এসব আমি বরদাস্ত করব না। ও যেন নিজের রাস্তা দেখে।’

সুধা ব্যাপারটার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। কোথা থেকে কী হয়ে গেল তাঁর মাথায় কিছুই ঢুকল না। তিনি অসাড়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

যদিও পার্থ জানত এমন একটা কিছু ঘটতে পারে। তিথি তাকে যেদিনই জানিয়েছিল সে মৌসুমীকে সব কথা বলে ফেলেছে, সেদিনই ঘটনাপ্রবাহ কোন দিকে যেতে পারে তার একটা আন্দাজ করেছিল সে। আজ সে বাড়ি ফিরতেই সুধা কোথায় ছিলেন, ছেলেকে আড়ালে ডেকে ফিসফিস করে বলে দিলেন, ‘সর্বনাশ হয়েছে, তোর বাবার কানে সব উঠেছে।’

পার্থ চপ্পল ছাড়তে ছাড়তে শুনল, টিভিটা চলছে। তার মানে, বাবা টিভি দেখছেন। পার্থ সোজা টিভির ঘরে ঢুকেই কাঁধের ঝোলাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। আজ আর এড়ানোর সুযোগ নেই, এড়িয়ে লাভও নেই।

তক্তপোশে শুয়ে টিভি দেখতে দেখতে অলকের ঝিমুনি এসেছিল। চটকা ভেঙে দেখলেন, ঘরে পার্থ। পার্থ প্রস্তুত হয়ে অলকের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল, অলকও খানিকক্ষণ এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন যেন তাঁর কিছু মনে পড়ছে না। পরক্ষণেই তিনি গর্জে উঠলেন, 'রাস্কেল, তোমার এত হিম্মত, তুমি বিয়ে করেছ? নিজে তো কবেই গোল্লায় গেছ, আবার একটা পরের মেয়ের সর্বনাশ করলে তুমি কোন আক্কেলে—'

'তিথি নিজের ইচ্ছেয় আমাকে বিয়ে করেছে।'

অলক লাফিয়ে উঠলেন, তর্জনী তাক করলেন পার্থর দিকে, 'বাস্ বাস্, একদম বাজে কথা বলবে না। মিতা আমায় সব বলেছে। একটা ভালো মেয়ের জীবন নষ্ট করলি তুই জানোয়ার, তোর নিজের কোনো সংস্থান নেই, সে মেয়ে, তাকে বিয়ে করল কী করে, তুই তাকে কত মিথ্যে কথা বলেছিস?'

পার্থ শান্তমুখে বলল, 'মিথ্যে কিছু বলিনি। বলেছি আমার যা শাকভাত জোটে তাই ভাগ করে খাব।'

'কী বললি! এ কথা বলতে তোর লজ্জা করল না!' অলক এত চিৎকার করছিলেন যে সুধার মনে হল সারা পাড়ার লোক সবাই বোধ হয় শুনতে পাচ্ছে। দোতলায় রুম্পারা তো বটেই। ছি ছি, লোকটা যেন রাগে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

অলকের সত্যি রাগে সারা শরীর কাঁপছিল, ভাইয়ের বাড়িতে আজ তাঁকে যত কথা সহ্য করতে হয়েছে সে সমস্তই তাঁর মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি মুখ বিকৃত করে বললেন, 'শাকভাত? সেটাও তুই নিজে ব্যবস্থা করবি বলে দিলাম। বিয়ে

করেছ, নিজের পয়সায় শাকভাত খাওয়াও গে যাও। এখানে আর তোমার অন্ন জুটবে না।'

পার্থ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। সীমা ফিরে এসেছিল ইতিমধ্যে। সে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। এটা তার ঠিক কীসের কান্না বোঝা গেল না, তবে সুধার কান্না পাচ্ছিল না। তিনি খুব মাথা ঠান্ডা রেখে ভাববার চেষ্টা করছিলেন একটা কথাই—কী হবে!

১৩

তিথিদের স্টাডি লিভ পড়ে গেছে। টেস্ট পরীক্ষায় যে সে কীভাবে বসেছিল সেই জানে, ভাগ্যিস ভালো উতরে গেছে। সে অবশ্য শুনেছে টেস্টে সবাই এভাবেই পাশ করে, তারপর পড়াশুনা শুরু করে দেয়। তিথির পক্ষে সেটাও সম্ভব হয়নি। সে প্রায় রোজই বেরোয়, পার্থর সঙ্গে দেখা করে, এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়। মাথা ঠান্ডা করে পড়তে বসার পরিস্থিতি তার নেই, সেজন্যে যেটুকু মনঃসংযোগ দরকার সেটাই তার নষ্ট হয়ে গেছে।

আজ তিথি কলেজে এসেছিল। সহপাঠীরা কেউ নেই, তিথি একা একা ভূতের মতো লাইব্রেরিতে বসে রইল। লাইব্রেরিও একদম ফাঁকা। সেটাই অবশ্য তিথির পক্ষে স্বস্তিদায়ক। দেড়টাতে পার্থর আসার কথা, ততক্ষণ যেভাবেই হোক কাটিয়ে দিতে হবে।

দেড়টা বাজার একটু আগে তিথি কলেজের সামনে সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। তার সঙ্গের ব্যাগটা আজ ফুলে শক্ত টানটান হয়ে আছে। কাল রাত্রেই তিথি ওর মধ্যে ভরে রেখেছে দু-জোড়া অন্তর্বাস আর টুথব্রাশ। তবে ব্যাগটা ফোলা আর ভারী হয়ে উঠেছে ওতে তিন-চারটে মোটা বই ভরার জন্যে। তিথি মনে মনে এখনও আশা ছাড়েনি, যদি পরীক্ষাটা দেওয়া যায়। একটা এসপার ওসপার হয়ে গেলেই বোধ হয় সে পড়তে বসে যেতে পারবে।

দূর থেকে পার্থকে আসতে দেখেই তিথি ছুটে গেল তার দিকে। ঊর্ধ্বশ্বাসে বলল, ‘পার্থ, আমি চলে এসেছি পার্থ, আমি তোমার কাছে চলে এসেছি। আর আমি বাড়ি ফিরব না!’

পার্থ দাঁড়িয়ে পড়েছিল, মনে হল তার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে।

তিথি পার্থর বাঁ-হাত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখে তার কাঁধে মাথা রাখল। এত জোরে সে পার্থকে ধরে আছে যেন সে বহুদিন স্রোতে

ওলটপালট হওয়ার পর পাড়ের মাটি পেয়েছে। পার্থ কোনোরকমে বলল, 'চলো কোথাও গিয়ে বসি।'

ওরা ইডেনে এল। সেই ছায়াচ্ছন্ন সবুজ মাঠ, সেই প্যাগোডার মতো ছাউনিওয়ালা ঘর, সেই সাঁকো। তিথি আজ এসব কিছুই দেখছিল না। পার্থও কোনো কথা বলছে না। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঘটনার আকস্মিকতায় সে হকচকিয়ে গেছে।

'তুমি এরকম হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে আসবে আমি বুঝতে পারিনি।'

'মানে!' তিথি পার্থর কাঁধে মাথা রেখেই বসে ছিল, একটা ঝাঁকুনি খেয়ে সোজা হয়ে গেল।

'মানে, আমার মনে হয় আজ তুমি বাড়ি ফিরে যাও। আমায় দু-তিনদিন অন্তত সময় দাও ভাববার।'

তিথি নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস বন্ধ করে বসে থেকে সে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। চলতে শুরু করল।

'তিথি! কোথায় যাচ্ছ?'

তিথি জবাব দিল না। সে আর কাউকে কোনো জবাব দিতে বাধ্য নয়। যার জন্যে সে আজ সব কিছু ছেড়ে যে বাড়ি থেকে এক-কাপড়ে বেরিয়ে এসেছে, তার জন্যেও আর কি সেখানে ফিরে যাওয়া সম্ভব! তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তিথি হনহন করে হাঁটছিল।

পার্থ ছুটতে ছুটতে এসে তাকে ধরল, হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'শোনো শোনো তিথি, আমার কথা শোনো, একটু বুঝতে চেষ্টা করো, কাল বাড়িতে একটা বিশ্রী ঝামেলা হয়েছে...আমি...আমি একেবারে প্রস্তুত নই—'

'পার্থ!' তিথির গলা বিকৃত হয়ে গেছে কান্নায়। এই নিশুতি দুপুরে বাগানের এদিকটা একদম ফাঁকা, নইলে তিথির চিৎকারে লোক জমে যেত। তিথির অবশ্য সে খেয়াল ছিল না, রাগে দুঃখে তার গলা চিরে যাচ্ছিল, 'তুমি কোনোদিনই প্রস্তুত ছিলে না পার্থ, কখনোই না। তুমি শুধু আমাকে ডেকেছ, ডাকতে ডাকতে পাগল করে দিয়েছ। আজ যখন আমি সত্যি সত্যি সব ছেড়ে তোমার কাছে চলে এসেছি, তুমি পিছিয়ে যাচ্ছ—আমার ঘেন্না লাগছে পার্থ!...তোমাকে...আমার নিজের ওপরে ঘেন্না হচ্ছে....'

তিথিই কাঁদতে কাঁদতে কুঁজো হয়ে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। পার্থও হাঁটু গেড়ে বসল তার পাশে। নিঃশব্দে তিথির পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে, ভেবে পাচ্ছিল না কী বলে তিথিকে শান্ত করবে।

তিথির কান্নার বেগ নিজে থেকেই কমে আসছিল। এখনও সে একই ভঙ্গিমায় কুঁজো হয়ে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে বসে আছে, তার পিঠ থেকে থেকে কেঁপে উঠছে আটকে যাওয়া নিশ্বাসে। পার্থ তার চুলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে করুণ গলায় ডাকল—'তিথি'!

'উঁ?'

'আমার একটা কথা শুনবে?'

তিথি সাড়া দিল না।

পার্থ খুব আস্তে আস্তে বলল, 'আসলে বাবা সব জেনে গেছে, মেজোকাকুরাই বলে দিয়েছে, কাল বাড়িতে এই নিয়ে খুব অশান্তি হয়েছে...আজই যদি তোমায় নিয়ে যাই—'

তিথি মুখ তুলল, তার সমস্ত মুখ কান্নায় মাখামাখি। কিন্তু তার গলার স্বরে কান্না লেগে নেই, সে বলল, 'উনি তো জানবেনই। তুমি

যখন আমাকে চলে আসতে বলতে, তুমি কি জানতে না যে আমি এলেই উনি সব জেনে যাবেন? নাকি তুমি ভাবছ তখনও ওঁকে মিথ্যে কথা বলতে? বলতে আমি তোমার কেউ নই, এমনি এমনি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি? সেটাই ওর পক্ষে মেনে নিতে সুবিধে হত?'

তিথির পর পর করা প্রশ্নগুলোতে এমন শাণিত জ্বালা ছিল, পার্থ হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারল না। বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ, ঠিক আছে। বাড়িতে যা হয় ফেস করব। তুমি আমার স্ত্রী, আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে যাবে এতে অত ভাবনার কিছু নেই।' সে হাত বাড়িয়ে শক্ত করে তিথির কাঁধ চেপে ধরল, 'হ্যাঁ তিথি, তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাব...সব ঠিক হয়ে যাবে,...তুমি চিন্তা কোরো না।'

তিথি চোখ মুছল, চশমার কাচ মুছল, তারপর পার্থর দিকে তাকিয়ে হাসল। সেই হাসির মধ্যে আনন্দ বেদনা দুশ্চিন্তা স্বপ্ন ভয় মিলেমিশে আছে। হাসিটা দেখে মুহূর্তের জন্য পার্থর হঠাৎ মনে হল, তিথি যেন বড়ো হয়ে গেছে।

তিথি সারাদিন কিছু খায়নি, খাওয়ার কথা মনেও আসেনি একবারও। শুধু ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। পার্থকেও অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সে ঘাসের ওপর শুয়ে ছিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ সময় কাটানোর পর পার্থ উঠে বসে বলল, 'চলো, ওঠা যাক।'

তিথির বুকের মধ্য ধড়াস করে উঠল। সে ভেবেছিল এখনই তারা পার্থর বাড়িতে যাবে। কিন্তু বাসস্টপে পৌঁছোনোর পর চোখের সামনে দিয়ে একটা বেহালার বাস বেরিয়ে গেল, পার্থ সেটাতে উঠল না।

তিথি অবাক হল, 'কী হল, বাসটাতে খুব ভিড় ছিল না তো!'

'না।'

‘তবে উঠলে না যে?’

‘আমরা এখন বাড়ি যাচ্ছি না!’

‘কেন? তবে আমরা কোথায় যাচ্ছি!’ তিথি কিছু বুঝতে পারছিল না।

‘আজকের দিনটা খুব ভালো, মঙ্গলবার। কালীঘাটের মন্দির থেকে তোমাকে সিঁদুর পরিয়ে নিয়ে যাব, আমরা এখন কালীঘাট যাচ্ছি।’

তিথি হাঁ হয়ে গেল, এ ধরনের কোনো সম্ভাবনার কথা তার মাথায় আসেনি। বাসে উঠে কালীঘাটে নামা অবধি পার্থর সঙ্গে কোনো কথা হল না। বাসে খুব ভিড়, কথা বলার সুযোগ ছিল না। মন্দিরের দিকে হাঁটার সময় সে পার্থকে জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি বুঝি মা কালীর ভক্ত?’

‘ঠিক ভক্ত নই হয়তো, ওঁকে নিজের মায়ের মতোই মনে হয়, তাই তোমাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।’

তিথি আড়চোখে পার্থর দিকে দেখল। পার্থর মুখে তদগত ভাব, তিথির মনে পড়ল ওকে এ কথা সে আগেও বলতে শুনেছে। দেশের বাড়ির পুজোর কথা বলতে গিয়ে পার্থ ওকে বলেছিল মা দুর্গা তার সত্যিকারের মা হয়ে সেখানে ফিরে ফিরে আসেন। গত দু–বছর দেশের পুজোতে তাঁর কাছে যেতে পারেনি বলে পার্থর মনে মনে খুব কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু মা নাকি একদিন তার স্বপ্নে এসে বলেছেন, ‘তুই আমার কাছে যাসনি বলে আমারও কষ্ট হয়েছে। কিন্তু তুই তিথির কাছে আছিস, আমার কোনো চিন্তা নেই। ওকে কখনো ছাড়িস না।’ সত্যি কথা বলতে কি, তিথির যেসব কথা মাথায় ঢোকে না, বা বিশ্বাস হয় না, সেসব সে বেমালুম ভুলে যায়। এই কথাটাও সে সেইজন্যে ভুলেই গিয়েছিল।

কালীঘাটের মন্দিরে তিথি এই প্রথম এল। সে জানে এটা একটা বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র, বহু মানুষ এখানে পুজো দিতে আসেন। কিন্তু তাদের বাড়িতে সে কাউকে এখানে আসার কথা বলতে শোনেনি। সে মা-বাবার সঙ্গে বেলুড় দক্ষিণেশ্বর গেছে। সেই যাওয়াতে বেড়ানোই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, পুজো দেওয়া নয়। বেলুড়ের মন্দির তো ছবির মতো চোখজুড়ানো সুন্দর। তুলনায় দক্ষিণেশ্বর বেশ অপরিষ্কার। কিন্তু কালীঘাটের মন্দিরে এসে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল।

একটা জায়গায় জুতো খুলে রেখে ওরা এগোনোর চেষ্টা করছিল। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, মন্দিরে জনসমুদ্র। তার ওপর আজ মঙ্গলবার। সারা প্রাঙ্গণ জলে কাদায় থকথক করছে। মন্দিরের সামনে থেকেই ভিখিরিরা ছেঁকে ধরেছে মাছির মতো, তিথি চোখে অন্ধকার দেখছে।

অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। আওয়াজটার মধ্যে কোনো ভক্তির মাধুর্য নেই, উদ্দামতা আছে। তিথি ক্রমশ সিটিয়ে যাচ্ছিল। পার্থ তাকে হাত ধরে না হেঁচড়ালে সে বোধ হয় একজায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেই ভিড়ের ধাক্কা খেতে খেতে দম আটকে মরে যেত। ভিড়ের মধ্যে একটা লোক তার বুকে হাত দিতেই সে আরও কাঠ হয়ে গেল।

ভিখিরিরা তার জামা ধরে টানছে। ওরা ছাড়াও আর একদল লোক তিথিদের ঘিরে ধরল। তাদের প্রত্যেকের কপালে বড়ো বড়ো সিঁদুরের তিলক, প্রত্যেকের হাতে একটা করে ছোটো ঝুড়ি, ঝুড়িতে লাল জবাফুল, আরও কী কী সব। ওইগুলো নিশ্চয়ই পুজোর উপকরণ, লোকগুলো নিশ্চয়ই ওদের পুজো দিতে বলছে, পুজোর জিনিস বিক্রি করতে চাইছে। কিন্তু ওদের হাবভাব কীরকম ডাকাত ডাকাত, তিথির ভয় করছিল।

পার্থ ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে কী কথা বলল, তার হাতে কিছু গুঁজেও দিল। লোকটা সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের হটিয়ে দিল। তারপর খপ্ করে একহাতে পার্থর অন্যহাতে তিথির কবজি ধরে টানতে টানতে এগিয়ে চলল ভিড় ভেদ করে। লোকটার গায়ে অসম্ভব জোর, তার কাঁধের ধাক্কায় জমাট ভিড় ফেটে পথ হয়ে যাচ্ছিল। তিথি ঠিকঠাক পা ফেলতে পারছিল না, পায়ে পায়ে

জড়িয়ে হুমড়ি খেতে খেতে এগোচ্ছিল কিন্তু পড়েও যাচ্ছিল না। এত ভিড়ের মধ্যে পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, পড়ার জায়গাই নেই। তিথি ঘুমন্ত মানুষের মতো চলছিল।

লোকটা ওদের একটা ম্লান কমলা বালব জ্বলা প্রায়ান্ধকার ঘুপচি ঘরে এনে দাঁড় করাল। ঘরের মাঝখানে একটা কালো শিবলিঙ্গ, তার মাথায় আর চারপাশে স্তপীকৃত ফুল বেলপাতা। শিবলিঙ্গের পাশে ময়লা ধুতি পরা অসম্ভব রুগ্ন একটা লোক বসে বসে বিড়ি টানছে। এই নিশ্চয়ই শিবের পূজারি। ঘরের সমস্ত মেঝে ভিজে চটচটে। এটা যে মূল মন্দির নয় সেটা তিথি বুঝতে পারছিল, এখানে কালীঠাকুরের মূর্তি নেই। যে লোকটা ওদের এখানে নিয়ে এসেছে সে বলল, ‘মায়ের ঘরে ঢোকা যাবে না, ওখানে আজ বেজায় ক্যাঁচাল। এখানেই সেরে নিন। দাঁড়ান আসছি।’

লোকটা চলে গিয়ে একটু পরেই আবার ফিরে এল। তার হাতে একটা জবাফুলের মালা, আর শুকনো শালপাতায় লাগানো একতাল চটচটে সিঁদুর। সেগুলো শিবলিঙ্গের পাশে বসে থাকা লোকটাকে দিয়ে বলল, ‘দাও দেখি, চটপট সেরে দাও।’

পূজারি লোকটা বিড়িতে দুটো টান দিয়ে ফেলে দিল। তারপর উঠে ওগুলো নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ল, তিথি আর পার্থর মাথায় ফুলজল ছেটাল। তিথি জড়বুদ্ধি শিশুর মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল। পার্থর দিকে চোখ ফেলে দেখল পার্থ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছ। তার চোখ বন্ধ ঠোঁট নড়ছে অল্প অল্প।

তিথির মারাত্মক ভয় করে উঠল। এ তাকে কোথায় নিয়ে এসেছে পার্থ! এসব কী ঘটনা ঘটছে তার চারপাশে? তিথির মনে হল সে এক দৌড়ে এখান থেকে পালায়। কিন্তু তার আগেই পূজারি লোকটা জবাফুলের মালাটা পার্থর হাতে দিল। পার্থ সেটা তিথির গলায় পরিয়ে দিল। তারপর সিঁদুরের পাতাটা থেকে আঙুলে চটচটে সিঁদুর নিয়ে তিথির কপালে আর সিঁথিতে মাখিয়ে দিল। তার ঠোঁট তখনও বিড়বিড় করে নড়ছে। পুরোহিতও একটানা মন্ত্র বলে চলেছে। প্রবল কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ আর উদ্দাম জয়ধ্বনি এসে আছড়ে পড়ছিল মুহুর্মুহু। তিথির মনে হল যেন বলির বাজনা বাজছে। তার মাথা ঘুরে উঠল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অথই ঘুমে তলিয়েই গিয়েছিল তিথি। ভুস্ করে আবার ভেসে উঠল যখন, রেডিয়োতে রূপং দেহি জয়ং দেহি গানটা হচ্ছে। সমবেত সুরের প্রদীপ থেকে পবিত্র শিখার মতো উপরদিকে কেঁপে কেঁপে উঠছে পঙ্কজ মল্লিকের গলা, মধুর, গম্ভীর, বিষণ্ণ। বাইরে ভোর হয়ে এসেছে। কাক ডাকছে জানলার কার্নিশে। ঘরের ভেতরে ভোরের নরম আভা, তিথি নিজের হাত পা বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে। হু–হু করে উঠল তার বুক, কত গান শোনা হল না, মহালয়া শেষ হয়ে গেল। এ কোথায় চলে গিয়েছিল সে, কোন জন্মে? কত দূরে? সে কি তার জীবনেরই কোনো অংশ, নাকি অন্য কারও। নিজের ডান হাতটা তুলে চোখের কাছে নিয়ে এল তিথি—সেই মেয়েটি আর এই মেয়েটি এরা দুজন কি সত্যিই এক?

জীবনের বত্রিশটি মহালয়া পার হয়ে এসে আজ আবার তার স্মৃতি ছুটছে অন্য এক মহালয়ার দিকে। অন্য এক মহালয়ার ভোর, সেখান থেকে ট্রেন ছাড়ছে কাটোয়া-আজিমগঞ্জ লাইনে। ঝক্ ঝক্ করছে কয়লার ইঞ্জিন। পুরোপুরি লুপ্ত হওয়ার আগে এই লাইনেই তখনও শেষ কয়েকটা কয়লার ইঞ্জিন রয়ে গেছে।

তিথির চোখের সামনে দিয়ে আবার ছুটতে শুরু করল ছবি, দ্রুত পরিবর্তনশীল ফ্রেম, একটার পর একটা। তার সিট জানলার পাশে, চোখে উড়ে এসে পড়ছে কয়লার গুঁড়ো...তিথি তবু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে...

১

তিথির পরনে একটা লাল সুতির শাড়ি, আগাগোড়া লাল, কেবল পাড়ে একটা সরু সবুজ রেখা। এটা বলতে গেলে তার বিয়ের শাড়ি। শ্বশুরবাড়িতে আসার দু-তিন দিন পরে পাড়ার তিন-চারজন প্রতিবেশিনীকে ডেকে তার যে সামাজিক সিঁদুর পরার অনুষ্ঠান হয়েছিল, তাতে দোতলার ভাড়াটে রুম্পার মা তিথিকে এই শাড়িটা দিয়েছিলেন পরবার জন্যে। লাল ব্লাউজ কিনে এনেছিল পার্থ, তিথির টাইট হয়েছিল সেটা। শাড়ির নীচে যে কালো শায়া পরেছিল সে, সেটা সীমার। ওইদিনের পর শাড়িটা আর পরেনি তিথি, পাট করে রেখে দিয়েছিল তক্তপোশের গদির তলে। আজই আবার পরেছে।

মহালয়া শুনতে শুনতেই শাড়িটা জড়াচ্ছিল তিথি, সাদা শায়ার ওপরে। এই শায়াটা তার, পার্থ কিনে এনেছে। সীমাও তৈরি হচ্ছিল, তিথির দিকে তাকিয়ে খুশি খুশি গলায় বলল, ‘এই শাড়িটা পরছ? খুব ভালো, তলায় সাদা শায়া পরলে কেন, আমার কালোটা নাও না?’

‘থাক বড়দি, ওটা তুমি নিয়ে যাচ্ছ না?’ তিথির আর বদলানোর ইচ্ছে ছিল না। অলক খুব জোরে রেডিয়ো খুলে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দুলছেন। তিথিরও মনপ্রাণ মহালয়ার দিকে। কিন্তু সীমা বলেছিল, ‘না না, কেমন দেখতে লাগছে, সাদ ফুটে বেরোচ্ছে। আমি কালোটা বার করে দিই, তুমি পরো। তুমি পরলেও তো নিয়ে যাওয়াই হবে।’

সীমা আবার ব্যাগ খুলে শায়া বার করে দিল, তিথি বদলাল, আবার শাড়ি পরল। এসব করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল যে তিথি ভালো করে মাথা আঁচড়াবার সময়ই পায়নি। গত রাত্রের বাসি বিনুনিটাই রয়েছে, শুধু সামনের এলোমেলো জট চুলগুলোকে কোনোরকমে চিরুনি বুলিয়ে ভদ্রস্থ করেছে সে। চিরুনি ছুঁইয়ে সিঁদুর টানতে টানতেই শুনল পার্থ রেডিয়ো বন্ধ করে দিয়ে তাড়া লাগাচ্ছে, ‘চলো চলো বেরোও সব, আমি রুম্পাদের ঘরে চাবি দিয়ে আসছি।’

বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেশনে আসতে আসতেই তিথির শরীরে মনে আনন্দ উত্তেজনার ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল। ট্রেনে ওঠার পর যখন ট্রেন ছেড়ে দিল, তার মনে হল গত চার-পাঁচ মাসের জটিল ম্রিয়মাণ জীবনযাপনে আজকের দিনটিই সবচেয়ে আনন্দের, সবচেয়ে মুক্তির। জানলার পাশে বসে জানলার হিমঠান্ডা শিকে গাল চেপে আছে সে, খুব ভালো লাগছে এই স্পর্শটুকু। শহরের আওতা ছাড়িয়ে ট্রেন যখন মাঠেঘাটে নামল, রোদ উঠে গেছে।

সীমা তার উলটোদিকের জানলায় বসে আছে। তারও চোখ বাইরের দিকে। তার পাশে সুধা। সুধার পাশে অলক, এক হাটু ভাঁজ করে সিটের ওপর পা তুলে দিয়েছেন। চোখ বন্ধ করে ঝিমুচ্ছিলেন, হঠাৎ পার্থর দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, 'এত তাড়াহুড়ো করলি, স্টেশনে চা–টাও খাওয়া হল না।'

পার্থ তিথির পাশে বসে কাগজ পড়ছে, স্টেশনে কেনা ইংরেজি দৈনিক। অলকের কথার জবাব দিল না। সুধা বললেন, 'বাড়ি থেকে তো বেরোলে চা খেয়ে, আবার কী? ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমোও না, কে বারণ করেছে!'

তিথি উত্তেজিত হয়ে পার্থর ঊরু আঁকড়ে ধরল, 'ওই দ্যাখো, দ্যাখো কাশফুল, বড়দি, বড়োমা...দ্যাখো কাশফুল...ওই যে!'

সীমা উত্সুক হয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখছিল, তিথি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, 'দেখতে পেলে? কী সুন্দর বলো? এক্কেবারে ছবি...'

সুধা তিথির দিকে তাকিয়ে গম্ভীর সুরে বললেন, 'চিরুনি বের করে চুলটা একবার আঁচড়াও তিথি, বিচ্ছিরি দেখতে লাগছে।'

দেশের বাড়ির দু-তিনটে স্টেশন আগে সীমা হঠাৎ বলল, 'কী হবে মা? আমার কিন্তু খুব ভয় করছে।'

সুধারও মুখ শুকাচ্ছিল। তিনি নিরুত্তর রইলেন। চিন্তা হওয়ারই কথা। একে এ বছর তাঁদের পুজোর পালা। দুর্গাপুজো মানে তলকূলহীন খাটুনির কাজ। যদিও দায়িত্ব প্রতি দু-বছর অন্তরই পড়ে। প্রতিবার পালার বছরে এই মহালয়ার দিনটাতেই তাঁরা রওনা দেন। এর আগে যা টুকটাক কাজ থাকে সেসব তাঁর শ্বশুরই কিছুটা এগিয়ে রাখেন। কিন্তু একবার গিয়ে পড়ার পর পার্থর ওপর যেমন পুজোর বাজার থেকে যাবতীয় কাজের ভার পড়ে, তেমনই পুজোর গোছানোর দিকটা তাঁকে একা হাতেই সামলাতে হয়। সীমা সাধ্যমতো সাহায্য করে। এবার আবার সীমার মাসিকের তারিখ এগিয়ে আসছে। কিন্তু এ সমস্ত দুশ্চিন্তা ছাপিয়ে উঠছিল অন্য একটা উদ্বেগ, সীমাও সেই ভয়ের কথাই বলছিল।

পার্থর বিয়ের ব্যাপারটা দেশের বাড়িতে সেভাবে কেউ জানে না। মানে, তাঁরাই কাউকে জানাননি। অরূপরা জেনে যাওয়ার পর অন্যান্য ভাইরা সবাই জেনে গেছে এটাই স্বাভাবিক। কাজেই কথাটা দেশের বাড়িতে পৌঁছিয়েছে নিশ্চয়ই। তার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সুধা ভাবার চেষ্টা করছিলেন। বেহালার বাড়িতে তিথিকে একরকম লুকিয়েই রাখা হয়েছিল। শাস্ত্রমতে বিয়ে হয়নি যার, লোকের কাছে তাকে বউ বলে পরিচয় দিতেই লজ্জা লাগে। পাড়ার লোকেদের জানতে যদিও বাকি ছিল না, আত্মীয়স্বজন এলে সুধা তিথিকে দোতলায় রুম্পাদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল লোকজন ডেকে—যাঁদের না বললেই নয়, তাদের নেমন্তন্ন করে ব্যাপারটা সামাল দিতে। নেমন্তন্ন না করে তিনি কাকে বলবেন ছেলের বিয়ের কথাটা? অলক রাজি হলেন না, লোক খাওয়ানোর অবস্থা তাঁর নেই। এই করেই পুরো ব্যাপারটা আটকে রইল। তিথি আসার দিন কয়েকের মাথায় একটা দুপুরবেলায় সুধা অবশ্য পাড়ার কয়েক জন বউ-ঝিকে আসতে বলেছিলেন। তাদের সামনে লোহাসিঁদুর দিয়ে ওকে চলনসই ভাবে বরণও করে নিয়েছেন, যাতে পাড়ায় অন্তত হাসাহাসিটা না হয়। গত কয়েক মাস বাড়িতে তিথি সবার সঙ্গে মিলেমিশেই আছে, সিঁদুর শাঁখা-পলা সবই পরে। কিন্তু তাই বলে পুজোয় দেশের বাড়িতে, বাড়ি ভরতি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে—'না না, সে এক কেলেংকারি, ও...ওকে ওখানে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই!' সুধা বলেছিলেন।

'ওকে তবে কোথায় রেখে যাবে মা, ওর তো কোনো যাওয়ার জায়গা নেই!' পার্থ হতাশ গলায় বলেছিল।

সুধা আকাশপাতাল ভাবছিলেন। তিথি দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, এক একবার চোখ তুলছে, আবার নামিয়ে নিচ্ছে। খুব ভয় পেয়ে গেছে সে, সেই সঙ্গে অভিমানও ফেঁপে উঠছে তার বুকে। বিনা দোষে অপরাধীর মতো চুপচাপ অপেক্ষা করছে জুরিবোর্ডের রায় শোনার জন্যে।

অলক মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। ছেলের জন্যে জীবনে শান্তি নেই তাঁর, কিন্তু সেসব দুঃখ করার এটা সময় নয়। মেয়েটিকে তাঁর মনে মনে ভালো লেগেছে, সত্যি কথা বলতে কী, মেয়েটির মুখ চেয়েই তিনি পার্থকে বার করে দিতে পারেননি। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অলক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ‘তাই তো, তিথি কোথায় থাকবে? তার চেয়ে ও আমাদের সঙ্গেই চলুক, এই পুজোতেই সবার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে এখন। বোলো যে বিয়ে হয়ে গেছে—আর কী!’ অলক রাগের চোখে পার্থর দিকে তাকালেন, ‘মেয়েটা একটা ভুল করেছে ঠিকই, তবু আমরা থাকতে ওকে জলে ফেলে দিতে তো পারি না।’

তিথি তাই চলেছে পার্থর সঙ্গে, তার শ্বশুরবাড়ির মানুষদের সঙ্গে, তার আরও বৃহত্তর আদি শ্বশুরভিটায়। তার বুক গুরগুর করছে। সুধা আর সীমা থেকে থেকে আশঙ্কিত দৃষ্টি ফেলছেন তার দিকে, তাঁদের উত্‌কণ্ঠাও বুঝতে পারছে তিথি। অলকের মুখ দেখা যাচ্ছে না, তিনি মুখ ফিরিয়ে ওপাশের একজন যাত্রীর সঙ্গে গল্প জুড়েছেন অনেকক্ষণ থেকে। আর পার্থ ঘুমোচ্ছে। তিথি দেখল, পার্থর মাথাটা পিছনদিকে হেলে গিয়ে মুখটা হাঁ হয়ে আছে।

যে স্টেশনে তিথিদের নামতে হল, সেটা আসলে একটা বহু পুরোনো শহর। শহরের একটু দূরেই অজয় আর গঙ্গার সঙ্গম। স্টেশনে নেমে রিকশা স্ট্যান্ডের দিকে যেতে যেতে একবার ট্রেনটার দিকে ফিরে তাকাল তিথি। কোনো কারণে নয়, এমনিই। ধক ধক করে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাচ্ছে ট্রেনটা। একরাশ উদ্বেগ আর অস্বস্তিতে ডুবে থাকতে থাকতেও তিথির একটা অদ্ভুত কথা মনে হল সেই চলে যাওয়া ট্রেনটার দিকে তাকিয়ে। মনে হল, আহা রে, ট্রেনটা আরও কতদূর যাবে, সেই আজিমগঞ্জ—কী সুন্দর নামটা! ওই জায়গাটা কোথায়? ইশ্‌, তিথি যদি সেখানে যেতে পারত তো বেশ হত।

ব্যাগপত্র রিকশায় তুলে পার্থ আর তিথি একটা রিকশায় উঠল। আর একটায় সুধা আর সীমা। অলককে ধারকাছে দেখতে পাওয়া গেল না, তা নিয়ে তিথি অবশ্য কাউকে বিশেষ চিন্তা করতেও দেখল না। দেশে পা দেওয়ামাত্রই অলক নাকি এরকম করতে শুরু করেন। তাঁকে ধরে রাখা যায় না। পার্থ যখন রিকশায় মালপত্র তুলছে, তার আগেই অলক একা একটা রিকশায় চেপে গলা খুলে গল্প করতে করতে বাড়ির দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছেন। এই শহরের রিকশাওয়ালারাও সবাই তাঁর বন্ধু।

রিকশায় যেতে যেতে তিথি কৌতূহলের সঙ্গে চারদিকে দেখছিল। পার্থ চাপা গলায় বলল, ‘তিথি, মাথায় ঘোমটা দাও।’

২

এই শহরে সবচেয়ে বড়ো আর উঁচু বাড়িগুলো সবই এককালে মল্লিকদের ছিল। মল্লিকরা জাতিতে গন্ধবণিক, কিন্তু বেশ কয়েক পুরুষ ধরে তাঁদের পেশা ছিল লোহালক্কড়–বালি–সিমেন্ট–সুরকির কারবারের। সারা শহর জুড়ে অনেক দোকানও ছড়ানো ছিল তাঁদের। সেইসব বাড়ি আর দোকানের বেশিটাই এখন হাতছাড়া। মল্লিকদের অবস্থা এখন পড়ন্তবেলাও পেরিয়ে এসেছে।

তবু সব গিয়েও আঘোর মল্লিকের এখনও যা আছে তাতে তাঁর ভালোই চলে যায়। শহরের মাঝখানে দোতলা বড়ো বাড়ি, শহরের একপাশে একটা হার্ডওয়্যারের দোকান, আর কিছু জমানো টাকা। দোকানটা এখন আর খুব চালু নয়, কিন্তু ওই দোকানের আয়েই তাঁদের তিনটি প্রাণীর ভরণপোষণ চলে। তিনজন বলতে তিনি, স্ত্রী শিবানী আর ছোটো ছেলে অসীম। সাত ছেলের মধ্যে ওই একজনই তাঁদের কাছে আছে। আছে নিতান্ত নিরুপায় বলেই। অসীমের মাথাটা একটু খারাপ। ছোটোবেলা থেকেই ওইরকম। তাঁদের বেশি বয়সের সন্তান বলেই হয়তো, তার বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশটা একটু গোলমেলে। অসীম ঠিকঠাক হলে দোকানটা হয়তো সেই দেখতে পারত। দোকান চালানোর জন্যে অঘোরকে লোক রাখতে হয়েছে, এই বৃদ্ধ বয়েসে লাঠি ঠুক ঠুক করে তিনি নিজেও মাঝেমধ্যে গিয়ে বসেন। অসীমকে দিয়ে সংসারের কোনো সাশ্রয় হয় না, কিন্তু অঘোর জানেন, সে যদি তেমন করিতকর্মা হত, তাহলে সেও এতদিনে বিয়ে করে সরে পড়ত। হোক পাগল–ছাগল, তবু তো একটা ছেলে আছে কাছে। বাকিরা তো নিজেদের সংসার নিয়ে যে যার আলাদা। দূরে দূরে। মেজোছেলের সঙ্গে অঘোর কোনো সম্পর্ক রাখেননি, শিবানী তাই নিয়ে কান্নাকাটি করেন। অঘোর স্ত্রীকে বলেন, ‘মেজো খোকা এখানে আসতে পারে না বলে কাঁদো, আসতে পারলেই বা কী হত? আর পাঁচজন ক–দিন আসে বুড়ো বাপ মাকে দেখতে। শুধু পুজোর সময় বই তো নয়!’

অঘোর জানেন, আরও একসময় সবাই আসবে তাঁর কাছে, ছুটতে ছুটতে উঠতে–পড়তে এসে জুটবে, যখন খবর যাবে তিনি মৃত্যুশয্যায়। অঘোর মনে মনে ভাবেন, মৃত্যুর আগে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে যাবেন তিনি। দোকানটা অসীমকে লিখে দেবেন।

ওই দোকান থেকেই মায়ে-পোয়ে বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারবে। আর কাউকে তাঁর কিছু দেওয়ার ইচ্ছে নেই।

মল্লিকদেরই বিভিন্ন শরিক ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রাচীন শহরের সর্বত্র। এই শরিকদের পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ তেমন নেই, শুধু পুজোর সময়ই সবাই পুজোবাড়িতে একত্র হন। এই পুজোবাড়িটা অঘোর মল্লিকের মেজো ভাইয়ের ভাগে, তাঁর বসতবাড়ির লাগোয়া। মেজোভাই নেই, বহুদিন আগেই মারা গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রীই পুজোবাড়িতে কাঠামোর সামনে নিয়মিত সন্ধ্যে জ্বেলে আসছেন বছরভর।

মল্লিকদের রমরমা তলানিতে ঠেকলেও পুজো বন্ধ হয়নি, যদিও তার জাঁকজমক আর নেই। তা সত্ত্বেও, এখনও এই শহরের প্রধান পুজোই মল্লিকদের পুজো। পুজোর চারটে দিন পুজোদালানে ভিড় উপচে পড়ে। কয়েক বছর আগেও সবাইকে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হত, এখন সেসব বন্ধ হয়ে গেছে। ফলের কুচিই দেওয়া হয়। তবু শুধু পুজো দেখতে, এ বাড়ির মা দুর্গাকে প্রণাম করতেই লোকে আসে। তার একটা কারণ, এখনও এখানে বারোয়ারি পুজো বলতে গেলে নেইই। যা হয় তার বেশিরভাগই বাড়ির পুজো। একটা অলিখিত নিয়ম এখনও চালু আছে, ভাসানের দিন মল্লিকবাড়ির ভাসান হয় সবার আগে। এমনকী, এঁদের ভাসান হয়ে গেছে এই খবর পেলে তবে অন্যান্য ঠাকুর বেদি থেকে নামানো হয়। এসবই মল্লিকদের স্বর্ণযুগের ধুলোগুঁড়ো।

শিবানী থপথপ করে সারা বাড়ি ছুটে বেড়াচ্ছিলেন। উত্তেজনা হলে তিনি এমন করেন। তিনি মোটা নন, কিন্তু মোটা মানুষের মতোই থপথপ করে হাঁটেন, একটু পা ঘষে ঘষে। বয়স হয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাঁর চলাফেরায় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই লাঠি ব্যবহার করবেন না। তার ওপর শাড়ি পরেন আলুথালুভাবে, লম্বা আঁচল লুটিয়ে থাকে মেঝেতে। তিনি চললেন আর তাঁর পেছন পেছন তাঁর আঁচলও চলল ঘর থেকে বারান্দা, বারান্দা থেকে উঠোন, উঠোন থেকে রান্নাঘর। পায়ের কাছে শাড়ির ঝুলও মাটিতে লুটোয়। পায়ে বেধে হুমড়ি খেয়ে পড়েনও মাঝেমধ্যে। বেশি চোট লাগলে পড়ে পড়েই কুঁইকুঁই সুর তোলেন মুখে, অসীম এসে গালাগাল করতে করতে তাঁকে ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। অল্পের ওপর দিয়ে গেলে তিনি নিজেই উঠে

আবার থপথপ করে দ্রুতবেগে চলতে থাকেন।

আজ তাঁর উত্তেজনার কারণ, তাঁর বড়ো ছেলে আসছে। সকালের ট্রেনেই আসার কথা, এখন ন-টা বাজে। এর মধ্যেই কি পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল না? শিবানী অসীমকে খুঁজছিলেন তাকে কথাটা জিজ্ঞেস করবেন বলে। স্বামীর সঙ্গে তিনি খুব একটা বাক্যালাপ করেন না।

অসীম বারান্দার কোণে উবু হয়ে বসে তেল মাখছিল। তার গা খালি, সে একটা নোংরা পাজামা পরে আছে। ওই একটাই পাজামা বোধ হয় সে তিন মাস ধরে পরে। তার সামনে একটা সরষের তেলের বাটি। বাটিতে ডান হাতের ঠিক দুটি আঙুল ডুবিয়ে সে সারা গায়ে ফোঁটা কাটছে আর ঘষছে। অত্যন্ত ধীরগতিতে। এটা একটা অতিদীর্ঘ প্রক্রিয়া। রোজ স্নানের আগে সে প্রায় অনন্তকাল ধরে গায়ে মাথায় তেল মাখে।

শিবানী তাকে দেখতে পেয়ে বললেন, ‘ও অসীম! তোর বড়দারা যে এখনও এল না!’

অসীম শুনতে পেল কি না বোঝা গেল না। সে নিমগ্ন হয়ে তেল মাখছিল।

শিবানী পা ঘষতে ঘষতে তার কাছে এসে দাঁড়ালেন। যথারীতি তাঁর আঁচল লুটোচ্ছে। উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ‘ও অসীম, ন-টা যে বাজল!’

অসীম মায়ের দিকে তাকাল, তাঁর লম্বা আঁচলের দিকে তাকাল, তারপর দাঁত খিঁচিয়ে বলল, ‘ওই জন্যেই সকাল থেকে ঘরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে বেড়াতে হবে? বলি শাড়িটাও ঠিক করে পরতে পারো না নাকি!’

শিবানী আহত হলেন না। অসীম তাঁর সঙ্গে এইরকমই ব্যবহার করে। তা সত্ত্বেও, অসীমই শিবানীর একমাত্র আশ্রয়, তাঁর বুকের কাছে আগলে রাখা ধন। তিনি আবার বললেন, 'বড়ো খোকাদের দেরি হচ্ছে কেন বল তো!'

অসীম কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি আবার পা ঘষে ঘষে রান্নাঘরের দিকে চললেন। অসীম ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নাকের মধ্যে একটা আওয়াজ করল। বিড়বিড় করে বলল, 'ইঃ, ন–টার মধ্যেই ছটফটানি দ্যাখো না, কলকাতা যেন বাড়ির পাশে।'

অলক বাড়ি পৌঁছোলেন এগারোটা নাগাদ। অসীম তখনও তেল মাখছিল। রিকশা থেকে নেমেই অলক হাঁকডাক শুরু করলেন। রিকশাওয়ালাকে বললেন, 'দাঁড়া বাবা, পেছনের রিকশাগুলো এলেই একসঙ্গে ভাড়া পাবি।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই চিৎকারকরতে লাগলেন অলক, 'ও মা, ও বাবা...কেমন আছ সব—কোথায় গেলে গো—'

শিবানী থপথপ করেই ছুটে আসছিলেন, 'অ্যাতো দেরি করলি হ্যাঁ বাবা অলক, আমি সেই কখন থেকে পথ চেয়ে রয়েছি!—বড়ো বউমা কই? পার্থ সীমা ওরা?'

'আসছে, সব আসছে। আমি চলে এলাম তাড়াতাড়ি, বলি যাই আমি আগে আগে। কতদিন তোমাকে দেখিনি—' অলক গদগদ স্বরে কথাগুলো বলতে বলতেই ঢিপ করে মাকে প্রণাম করলেন। শিবানী আহ্লাদে চোখের জল ফেলছিলেন। আঘোরও ততক্ষণে লাঠি ঠুক ঠুক করে ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝের উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছেন। প্রণাম নিতে নিতে বললেন, 'এলে? সব কুশল তো?'

অলক মাথা নাড়লেন, 'তোমার শরীর কেমন?'

'আর আমার শরীর! খোঁজখবর তো রাখে না কেউ, কোমরটা ভোগাচ্ছেই, তা ছাড়া আজকাল প্রায়ই জ্বর হয়।'

এটা অঘোরের একটা বাতিক, তাঁর এই জ্বর আসাটা। আজ বলে নয়, অনেক দিন আগে থাকতেই তাঁর কেবলই মনে হয় জ্বর আসছে। সত্যিকারের জ্বর নয়, এই জ্বর তাঁর মনের ব্যাপার। তিনি থার্মোমিটার বগলে চেপে পাঁচ মিনিট বসে থাকেন, যেন বেশিক্ষণ থার্মোমিটারটাকে শরীরের সঙ্গে ঠেসে রাখতে পারলেই তাতে বেশি তাপমাত্রার পাঠ উঠবে। কিন্তু পারার সুতোটা পারতপক্ষে সাড়ে সাতানব্বই ছাড়ায় না। অঘোর তখন থার্মোমিটারটাকে আরও দশ মিনিট বগলে নিয়ে বসে থাকেন। তাই বলে জ্বর যে সত্যি সত্যি তাঁর কখনো হয়নি তা নয়, কিন্তু কেউ আর ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেয় না। অলকও দিলেন না। অসীম তেল মাখা বন্ধ করে এদিকে তাকিয়ে ছিল, এখনও সে একই জায়গায় একইভাবে উবু হয়ে বসে আছে। অলক তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী রে, তোর কী খবর?’

অসীম সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে অলককে দেখছিল। এটা নতুন কিছু নয়। বছরে একবার ছাড়া দাদাদের কিংবা তাদের পরিবারের সঙ্গে তার বলতে গেলে দেখাই হয় না। এ বাড়িতে আসেও না কেউ। সে একাই পড়ে থাকে বৃদ্ধ বাবা–মায়ের সঙ্গে। এতে অবশ্য তার অভ্যাসই হয়ে গেছে। কিন্তু পুজোর সময় যখন সবাই একে একে আসতে থাকে, অসীম অত্যন্ত বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করে, যেন তার নিশ্চিন্ত নিরিবিলি জীবনের মধ্যে কারা না বলেকয়ে অনুপ্রবেশ করছে। অনেককে অনেক সময় সে প্রথমটায় চিনতেও পারে না। এসব সময়ে তার পাগলামির লক্ষণগুলো বাড়ে। দু-একদিন পরে সে ক্রমশ একটু একটু করে মানিয়ে নেয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ঈর্ষাকাতর হয়ে থাকে। তার মা বাবা, এই বাড়ি, এইটুকু ঘিরে তার যে একান্ত নিজস্ব জগতটুকু, সেখানে কারা যেন এসে অন্যায় উপদ্রব শুরু করেছে বলে মনে হয় তার। প্রবাসী দাদারা, যাদের সবারই নিজস্ব সংসার আছে, এবং প্রায় সবাইই প্রতিষ্ঠিত, তাদের প্রতি মায়ের আকুলতা দেখে তার মনে হয় আদিখ্যেতা। তাই দাদারা যখন এখানে এসে থাকে, মায়ের সঙ্গে আরও খারাপ ব্যবহার করে অসীম। তার অন্যায় অত্যাচার দেখে দাদারাও তাকে ধমকধামক দেয়, মাঝে মাঝে মারধরও খায় সে। তখন আবার শিবানীই তাকে আগলান। মায়ের আঁচল আঁকড়ে ধরে ফুঁসতে থাকে অসীম, বিড়বিড় করে, ‘হুঁ, এখন সব কত পিরিত, পিরিত তো উথলে ওঠে, সারাবছর মা–বাপ মরল কি বাঁচল কেউ তো দেখতেও আসে না, সব শালা সুখের পায়রা।’

অসীমের দৃষ্টিটা ক্রমশ সন্দেহ থেকে ঘৃণার দিকে এগোচ্ছিল, অলক সেটা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে বললেন, 'তুই কি এখন চান করতে ঢুকবি নাকি, তাহলে তো সব্বোনাশ। খবরদার, বড়ো বাথরুমে তুই ঢুকবি না বলে দিচ্ছি। ওটাতে আমি চান করব।'

অসীম জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল, এটা তার প্রতিবাদ। রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেছে, হড়বড় করে বলল, 'ইঃ, বললেই হল। ওটায় আমি যাব।' রেগে গেলে কথা বলার সময় তার মুখ দিয়ে থুতু ছিটকায়।

অলক তার দিকে চোখ পাকাতেই শিবানী পড়িমরি করে অসীমের কাছে সরে এলেন। মিনতির গলায় বললেন, 'ও অসীম, বড়োদাদার সঙ্গে অমন করে নাকি, লক্ষ্মীসোনা আমার, ছিঃ বাবা, ও অসীম!'

অঘোর আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। বাড়িতে শিবানী আর অসীম নিত্যি হুটোপাটি লাগিয়ে রাখেন, পুজোর সময় লোকজন এলে এটা আরও বাড়ে। তাঁর এখানে কিছু করার নেই। অলকরা এসে গেছে, তিনি নিশ্চিন্ত। অঘোর আরামকেদারায় বসে থার্মোমিটার বগলে চেপে ঘড়ি দেখতে লাগলেন।

অলক শার্টটা খুলতে খুলতে বললেন, 'মা তুমিই অসীমকে আদর দিয়ে দিয়ে এরকম বেয়াড়া করে তুলেছ। দু-একটা চড়চাপড় না খেলে ওর—'

এই অবধি বলেই তিনি স্থির হয়ে গেলেন। বাড়ি আসার আনন্দে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই তাঁর একেবারে খেয়াল ছিল না। এখন দেখলেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠে একে একে উঠোনে এসে দাঁড়াল ব্যাগ–ট্যাগ সমেত পার্থ, সীমা, সুধা,...আর ওদের সবার পেছনে, ঘোমটা দিয়ে, মাথা নীচু করে, জড়সড় তিথি।

অলকের শার্ট খোলা সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন শিবানী এগিয়ে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর

বিস্মিত চোখ তিথিরই দিকে। অসীম উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার পাজামার পা দুটো ঊরু পর্যন্ত তোলা। একটা আটকে থাকল, আরেকটা নেমে এল পায়ের গোছ অবধি। নাকের মধ্যে ঘড়ঘড় আওয়াজ করে অসীম বলল, ‘হুঃ, এই মেয়েছেলেটা আবার কে!’

৩

তিথির এ বছর পার্ট ওয়ানটা আর দেওয়া হয়নি। কিন্তু তার পরীক্ষা আর ফুরোচ্ছিল না। স্কুল কলেজের পরীক্ষা একটা না দিলে, বা পাশ না করলে সেইটাই আবার দিতে হয়। জীবনের পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হচ্ছে কি না বুঝতে না পেরেও তিথি দেখছিল, তাকে পর পর পরীক্ষা দিয়ে যেতে হচ্ছে, যেগুলো ক্রমশ কঠিনতর।

যেদিন তিথি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিল, কালীঘাটের মন্দিরে গিয়ে বোধ হয় একটু অসুস্থই হয়ে পড়েছিল সে। পার্থর কাছে সেদিন টাকা ছিল। মন্দির থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিল সে। তিথি তখন প্রায় টলছে।

জবাফুলের মালাটা মন্দির থেকে বেরোনোর সময়ই খুলে ফেলেছিল তিথি। ট্যাক্সিতে উঠে কপালের মাখামাখি সিঁদুর ওড়না দিয়ে ঘষে ঘষে মুছছিল। ট্যাক্সির মধ্যের অন্ধকারে পার্থ চোখ সরু করে তিথির সিঁথির দিকে তাকাল, ‘আর না, আর ঘোষো না। ওটুকু থাক!’

তিথি সত্যিই এমন ক্ষিপ্তভাবে হাত চালাচ্ছিল যেন পুরো সিঁদুরটাই মুছে নিশ্চিহ্ন করে দেবে সে। পার্থর কথায় তার সংবিৎ ফিরল।

‘খুব শরীর খারাপ লাগছে তিথি?’

তিথি মাথা নেড়ে না বলল, তার মাথা ট্যাক্সির জানলায় হেলে আছে, তার চোখ বাইরে। রাস্তা থেকে রাস্তায় বিপরীতে ধাবমান আলো, কী জ্বলন্ত কী দ্রুত কী অর্থহীন!

‘আসলে সারা দিন খাওনি তো! আমার একবার মনে হয়েছিল, তারপরে ভাবলাম মায়ের মন্দিরে গিয়ে সিঁদুরটা পরিয়ে নিই, তার আগে উপোস থাকলেই ভালো।’ পার্থ জিভ দিয়ে আপশোসের শব্দ করল, ‘ওটাই ভুল হয়ে গেছে।...তিথি? খুব খিদে পেয়েছে, না? বাড়ি গিয়েই কিছু খেয়ে নেব!’

তিথির কানে তেমন কিছু ঢুকছিল না। পার্থও যেন অনেকটা নিজের মনেই বকছে। একবার তিথি শুনল সে বলছে, ‘জানো তিথি, আমি ঠিক এরকমই একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে আমায় ভালোবাসবে সে ঘর ছেড়ে, সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াবে। সঙ্গে একটা সুতোও আনবে না।’

তিথি ঠিক বুঝতে পারছিল না তার মাথার মধ্যে কী হচ্ছে। বুকের মধ্যে, সারা শরীরেই বা কী হতে চাইছে। খুব প্রবল একটা আলোড়নই হতে চাইছে হয়তো, কিন্তু সেই আলোড়ন ধারণ করার মতো কোনো শক্তিই তিথির আর ছিল না। অপরিসীম ক্লান্তিতে প্রায় মূর্চ্ছাহতের মতোই ট্যাক্সির সিটে তলিয়ে ছিল সে।

পার্থ হঠাৎ তিথির কাছে সরে এসে তার হাত ধরে তাকে বুকের কাছে টানতে যেতেই তিথি যেন ইলেকট্রিক শক খেল। তার ভেতরে ভেতরে যে তীব্র ওলটপালটটা হতে চাইছিল কিন্তু ক্লান্তিতে ঠেকে যাচ্ছিল, পার্থর সামান্য স্পর্শে সেইটাই জ্বলে উঠে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ‘না, ছোঁবে না!’

পার্থ অসম্ভব আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল সে খুব ভয়ও পেয়েছে। তিথি তাকে চেয়েই এইভাবে সব কিছু ছেড়ে চলে এসেছে না? তার এ কেমন আচরণ!

তিথি কথাটা এভাবে বলে ফেলে যেন আরও পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। তার ওপর তার শেষ প্রাণরসটুকু নিংড়ে নিংড়ে তার চোখে আবার জল আসছে। প্রথমবার যতটা তীব্রস্বরে বলেছিল, দ্বিতীয়বার ততটাই ক্ষীণ শোনাল তার স্বর, ‘না, আমাকে এখন

ছুঁয়ো না তুমি...আমাকে...অন্তত কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও...পার্থ...আজ আমি আমার মাকে ছেড়ে এসেছি...আমার মা...' তার নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছিল। বুকে যেন কথা বলার মতো হাওয়া অবশিষ্ট নেই। 'আমার মা' কথাটা বলতে গিয়ে তার বুকে আর গলার কাছে এমন সুতীব্র যন্ত্রণা হচ্ছিল যেন কেউ সেখানে ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে পোঁচ দিচ্ছে।

পার্থ আর কোনো কথা বলেনি।

বাড়িতে সুধা তখন সন্ধ্যে দিচ্ছিলেন। সীমা কলতলায়। বাড়ির কাছে ট্যাক্সি আসে না, বেশ একটু দূরেই ট্যাক্সিটা থামল। ট্যাক্সি থেকে নেমে পার্থ যখন তিথিকে নিয়ে ঘাসজঙ্গল ডিঙিয়ে সরু পথ বেয়ে বাড়ির দিকে আসছে, তখন চারিদিকে অন্ধকার। পাড়ার লোকেরা তিথিকে দেখতে পায়নি।

পার্থ যখন তিথির হাত ধরে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, তখন সুধা ধূপ হাতে ভেতরের প্যাসেজ দিয়ে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাচ্ছিলেন। সীমাও কলতলা থেকে উঠে এসে দরজার সামনে পাতা ন্যাকড়ার ফালিতে পা মুছছিল। এক মুহূর্তের মধ্যেই দুজনের বুঝতে বাকি রইল না কী ঘটেছে। তিথির সমস্ত কপাল এখনও দগদগে লাল, কিছুটা প্রাণপণ ঘষার চোটে, কিছুটা উঠে যাওয়া সিঁদুরের আভায়। তার চুড়িদারের ওড়নায় চাপচাপ রক্তের মতো তেল–সিঁদুর মাখামাখি। তার ব্যাগটা পার্থর হাতে থলের মতো ঝুলছে।

'কী সর্বনাশ! সীমা, শিগগির ওপরে গিয়ে রুম্পার মাকে ডাক।' সুধা চাপা গলায় বলে উঠলেন। সীমার চোখ বিস্ফারিত হয়ে আছে, সে হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ির দিকে দৌড়োল।

পার্থ দ্বিধার স্বরে বলল, 'রুম্পার মাকে কেন?'

সুধা তিথিকে আপাদমস্তক দেখছিলেন। পার্থর কথা শুনে তার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'তিথিকে এখানে নিয়ে এসেছিস তো?'

'হ্যাঁ। ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। ওই বাড়িতে থাকতে পারবে না, ওর মা যা-তা শুরু করেছেন, কাল ওকে মেরেওছেন।'

'সে যাই হোক, আমার শোনার দরকার নেই।' সুধা কঠিন হলেন, 'ও এখানে এসেছে যখন এখানেই থাকবে। কিন্তু ওকে তো এমনি এমনি ঘরে তুলতে পারি না, বরণ তো করতে হবে?'

রুম্পার মা এলেন তড়িঘড়ি। দশাসই চেহারা। বয়স বেশি নয়। একেকজন মানুষ থাকেন যাঁরা যে কোনো অবস্থার সামাল দিতে পারেন সহজে। ইনি সেইরকম মহিলা। সুধা তাই এঁকে ডাকতে পাঠিয়েছিলেন।

রুম্পার মায়ের নাম মাধবী। পাড়ার লোকে তাঁকে মাধু, মাধুদি, কিংবা মাধুবউদি বলেই ডাকে, আড়ালে বলে রুম্পার মা। তিথি এখনও প্যাসেজে দাঁড়িয়ে। মাধবী এসেই তিথির হাত ধরলেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওকে তো আমি চিনি। আহা, মুখ একেবারে শুকিয়ে ফেলেছে মেয়েটা। দাঁড়িয়ে কেন? বোসো বোসো। ও সীমা, তোর বউদিকে নিয়ে গিয়ে বসা একটা কোথাও?...নিজের বরের কাছেই এসে পড়েছ মা, নিজের শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদ—সব তোমার আপনার লোক, চিন্তা কী?'

তাঁর গলায় একটা সহজ স্নেহের স্পর্শ ছিল। তিথির যেন ধড়ে প্রাণ এল একটু। মাধবী তাকে নিজেই হাত ধরে ঘরে এনে বসালেন। বসার পর তিথি দেখল তার উঁচু হয়ে থাকা হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে।

আচ্ছন্নের মতো একাই বসেছিল তিথি। এমনকী পার্থকেও দেখতে পাচ্ছিল না সে। পার্থ কোথায় গেছে কে জানে। মাধবী আর সুধা পাশের ঘরে চলে গেছেন বরণডালা গোছাতে, সীমাকেও দেখা যাচ্ছে না। তিথির এক-একবার মনে হচ্ছিল কারা যেন

দরজার কাছ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে তাকে দেখে যাচ্ছে। তার দরজার দিকে ঘাড় ঘোরানোর শক্তিও ছিল না।

সুধা এসে দরজার সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে পিতলের পুজোর থালা। তাতে ধূপ আর প্রদীপ জ্বলছে। থালায় সিঁদুরের প্যাকেট, শাঁখা-পলা। শাঁখা-পলাগুলো মাধবীই চটজলদি জোগাড় করে এনেছেন কোত্থেকে। মাধবী ঘরে ঢুকে তিথির কাঁধে হাত দিলেন, 'ওঠো, ও তিথি, তোমার শাশুড়ি-মা তোমাকে বরণ করবেন।'

তিথি মুখ তুলল। অপরিসর দরজায় একটা ঠাসাঠাসি ভিড় চোখে পড়ল তার। এরা কারা, কখন এসেছে, তিথি কিছুই জানে না। নিশ্চয়ই পাড়ার মহিলারা, এ বাড়িতে কিছু একটা ঘটেছে—সেই আঁচটুকু পেয়ে ছুটে এসেছেন। তিথি শুধু দেখল জোড়া জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ স্থিরদৃষ্টিতে তাকে দেখছে। তার মাথার মধ্যে আবার গোলমাল হয়ে গেল। তা ছাড়া, কালীঘাটের ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন থেকে সে তখনও মুক্ত নয়। তার মনে হল, আবার সেরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

তিথি আবার জ্ঞান হারাতে পারত। দু–হাতে মুখ ঢেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠতে পারত। কিন্তু সে সেসব কিছু করল না। যা করল সেটা সে নিজেও করতে পারবে বলে ভাবেনি। অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে মুখে সে একবার সুধার দিকে তাকাল, একবার চারিদিকে তাকাল, বোধ হয় পার্থকে খুঁজছিল সে। তারপর সুধার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'বড়মা, আজ আমি আমার মাকে ছেড়ে এসেছি...আর কোনোদিনও মায়ের কাছে যেতে পারব না...আজ আমাকে ছেড়ে দাও...আজ আমি এইসব পারব না...আমাকে ছেড়ে দাও বড়মা...প্লিজ!...'

যে মায়ের পিছুডাক অগ্রাহ্য করে সে আজ সকালেই ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসেছে, সেই মায়ের কথা বলেই সে আজ সবার কাছ পরিত্রাণ ভিক্ষে করছে, সামান্য একটু একা থাকার অবকাশ, একটু ব্যক্তিগত নিভৃতি। সে ওই ফেলে আসা জীবনের কথা, বিশেষত মায়ের কথা মনে করে নির্জনে নিজের মতো করে একটু কাঁদতে চায়। সেই সময়টুকুই পাচ্ছে না।

সুধা পাথরের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর পেছনে জনতাও স্থির। কৌতূহলী চোখগুলো বিস্ময়ে নড়ছে। এ ভারি নতুনরকমের নাটক দেখছে তারা। দুর্বোধ্য কিন্তু টানটান।

মাধবী কথা বলে উঠলেন, ‘তাই তো তাই তো—দিদিভাই ওসব বরং আজ থাক। মেয়েটা সত্যিই আর পারছে না। সিঁদুর তো মাথাতে আছেই দেখছি, তুমি বরং থালা রেখে ওই শাঁখা-পলাগুলোই দাও ওকে পরিয়ে—’ সুধাকে হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন তিনি। নিজেই সুধার হাত থেকে থালাটা নামিয়ে রাখলেন। তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত স্বরে বললেন, ‘ও সান্যাল-মাসিমা, ও ইলাদি—তোমরাও এখন এসো না বাপু, ভিড় হালকা করো। কী যে দেখছ দাঁড়িয়ে বুঝি না। তিথি তো থাকতেই এসেছে, ইচ্ছে হলে দু-দিন পরেই এসো আলাপ করতে। আজ দেখছ না মেয়েটার শরীর অসুখ করছে?’

তাঁর কণ্ঠস্বরে রীতিমতো দাপট ছিল। ভিড় ছত্রভঙ্গ হল। নিঃশব্দে নয়, বিভিন্নরকম কথাবার্তা বলতে বলতে তাঁরা সরে যেতে থাকলেন। যাওয়ার আগে কেউ কেউ আবার উঁকি দিয়ে দেখে যাচ্ছিলেন তিথিকে। একজনকে তিথি বলতে শুনল, ‘মাগো, মেয়েটা বুঝি এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছে? সন্ধ্যেবেলা এ কী বিপদ!’

তিথি তখনও হাঁটু গেড়ে মেঝেতে বসে আছে। সুধাও ছবির মতো নিশ্চল। মনে হয় তাঁরও যেন নিশ্বাস পড়ছে না, চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে। মাধবী সুধার হাতে শাঁখা-পলা তুলে দিতে দিতে বললেন, ‘ও কী! ও দিদিভাই, ওদের কথায় কান দাও কেন? ওরা সব মজা দেখতে এসেছে। কিন্তু টের পেল কী করে তাই ভাবছি।...নাও নাও, এগুলো পরিয়ে দাও। তারপর বউকে কিছু খেতে-দেতে দাও। মুখ দেখে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ কিছু খায়নি, কেমন মা-মা করছে দ্যাখো, আহা, আজ থেকে তুমিই তো ওর মা!’

সুধা যন্ত্রের মতো তিথির হাতে শাঁখা-পলা পরালেন। তার রোগা হাতে দুটোই বড়ো হল, কিন্তু ভারী নয়। শাঁখা বা পলা কোনোটাই সত্যিকারের নয়, প্লাস্টিকের। তিথি সুধাকে প্রণাম করল। সুধা বিড়বিড় করে কী বললেন বোঝা গেল না। তিথি মাধবীকেও

প্রণাম করল। মাধবী তার চিবুক ধরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আহা, ছেলেমানুষ!’

তিথির চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছিল চোখের জলে। মাধবী সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ও একটু শুয়ে বিশ্রাম করুক, নাকি, দিদিভাই?’

কিন্তু তিথির তখনও বিশ্রামের সময় হয়নি।

পার্থ এতক্ষণ পাশের ঘরের খাটে পা ঝুলিয়ে বসে ছিল। সে বরণডালা সাজানো দেখেছে, তিথিকে মা কীভাবে বরণ–টরণ করেন তা দেখার জন্যেও তার অদম্য কৌতূহল হচ্ছিল। কিন্তু তার লজ্জা করছিল। সেই সঙ্গে অবশ্য চোরা গর্বও হচ্ছিল তার। তারই জন্যে জলজ্যান্ত একটি মেয়ে বাড়ি ছেড়ে তার কাছে চলে এসেছে, সেই মেয়েটিকে বরণ করার আয়োজন করছেন তার মা বউদি প্রতিবেশিনীরা, এই সিনেম্যাটিক ঘটনাটিকে সে উপভোগ করছিল খুব। তা ছাড়া, তার মন বলছিল এখন ওঘরে যাওয়াটা বোধ হয় ঠিক নয়। ওখানে যা ঘটবে সেটা একেবারেই মেয়েলি ব্যাপারস্যাপার। আর তিথিও একটু অস্বাভাবিক রয়েছে। পার্থ ভেবেছিল, এ অবস্থায় সে ওঘরে গিয়ে দাঁড়ালে আরও জটিলতার সৃষ্টি হবে, পাড়ার লোকে হাঁ করে দেখবে। তার চেয়ে মা যা পারে করুক। রুম্পার মা-ও আছে। ঝামেলাঝঞ্ঝাট সামলাতে মাধুবউদি একাই একশো।

এখন, লোকজন সব চলে যেতেই পার্থ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। নিজের ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে পাশের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে শুনতে পেল মাধবী তিথির বিশ্রামের প্রস্তাব করছেন। সে ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘না না, তিথি আমার সঙ্গে একটু বেরোবে।’

‘যাঃ, এখন আবার ও বেরোবে কী? দেখছিস ও দাঁড়াতে পারছে না।’ মাধবী মুখঝামটা দিলেন।

পার্থ উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ‘না মাধুবউদি, একটু কেনাকাটা আছে। তিথিকে আমার সঙ্গে যেতে হবে—তিথি চলো—’ সে আর

একমুহূর্তও যেন দেরি করতে রাজি নয়। তিথির অবাক হওয়ার অবস্থা ছিল না। বরং তার খুব ক্ষীণভাবে মনে হচ্ছিল, এখন এই বাড়িটা থেকে একটু বেরোতে পারলে সে বোধ হয় স্বস্তিই পাবে।

মাধবী বারণ করছিলেন, পার্থ সে-কথায় কান না দিয়ে তিথির হাত ধরে টান লাগাল, 'আহ্, চলো তিথি, চলো—'

সুধার কিছু বুঝতে বাকি ছিল না। তিনি স্থিরদৃষ্টিতে পার্থকে দেখতে দেখতে ক্লান্ত প্রাণহীন গলায় বললেন, 'দাঁড়া, ওকে টানাটানি করিস না। বেরোলে কিছু খেয়ে বেরোক। সীমা, ঝুড়ি থেকে একটা কলা এনে তিথিকে দে তো—!'

কলাটা খেতে গিয়ে তিথি বুঝল তার ভয়ংকর খিদেই পেয়েছিল। কিন্তু সে দ্রুত খেতে পারছিল না। গিলতে গিয়ে তার গলার মধ্যে একটা ধাক্কা লাগছিল উলটোমুখে। পার্থও কলা খাচ্ছিল, কিন্তু তিথির মনে হচ্ছিল সবাই যেন তার দিকেই তাকিয়ে তার খাওয়া দেখছে। অবচেতনেই সে খুব সচেতন হয়ে উঠল। খুব সতর্কভাবে মুখ বন্ধ করে চিবোনোর চেষ্টা করছিল সে, কিন্তু নরম কলার টুকরোটাও মুখের মধ্যে যেন কিছুতেই জব্দ হচ্ছে না।

পার্থ তিথিকে নিয়ে গেছিল বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে, বাসরাস্তা পেরিয়ে একটা মাঠের ধারে। মাঠটা খাটো পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পার্থ পাঁচিলে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, 'বোসো।'

'এখানে? এখানে এলে কেন?' তিথি চারপাশটা দেখছিল। জায়গাটা বেশ অন্ধকার। ফাঁকা। দূরে ডায়মন্ডহারবার রোডের লালচে হ্যালোজেন আলোর আভা ছড়িয়ে আছে। তিথির গা ছমছম করছিল।

পার্থ একটা সিগারেট ধরাল। সিগারেটে টান দিয়ে কাশল দু-বার, বলল, 'বোসো না একটু। একটু পরেই বাড়ি ফিরে যাব। মশা কামড়াচ্ছে?'

'এখানে কেন নিয়ে এলে আমাকে?'

পার্থ তবু সময় নিচ্ছে। চুপচাপ সিগারেটে বেশ কয়েকটা টান দেবার পর সে বলল, 'তিথি, বাবা বাড়ি আসার পর একটা ঝামেলা হবে। ওই ঝামেলার সময়টা অ্যাভয়েড করছি। আমার বাবার রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না, খুব ইনডিসেন্ট হয়ে যান। তুমি তো বাবাকে আগে দ্যাখোনি, তুমি নিতে পারবে না। তার চেয়ে, মা ব্যাপারটা সামলে নিক, তারপর আমরা যাব।'

তিথির ঘেন্না লাগছিল। পার্থর তাকে নিয়ে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসাটা যে পালানো, এটা বুঝে তিথির মনে হল তার চোখ ফেটে জল নয়, বোধ হয় আগুন বেরোতে চাইছে। এ কার জন্যে পাগলের মতো ছুটে এসেছে সে, কাকে ভালোবেসে? ও কি একজন পুরুষ? তিথি খুব ভালো করেই জানে সে যেভাবে এ বাড়িতে এসে উঠেছে সেটা একটা বিরাট বিড়ম্বনা। পার্থ তাকে বিয়ে করেছে অথচ সে নিজেই বহুলাংশে বাবার ওপরে নির্ভরশীল, কিন্তু আবার তাঁকেই বিয়ের ব্যাপারে কিছু জানানোর প্রয়োজন মনে করেনি। এত অপরাধের একটাও হয়তো ক্ষমার যোগ্য নয়। কিন্তু বাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে না পেরে তাকে নিয়ে পার্থর এই পালিয়ে আসা, অন্ধকারে লুকিয়ে বসে থাকা, এ যেন তার সমস্ত অযোগ্যতাকে ছাপিয়ে গেল।

তিথি কোনোরকমে বলল, 'তুমি বলেছিলে বাড়িতে যা হবে তুমি ফেস করবে, সেই ভার একা মায়ের ওপর ফেলে পালিয়ে এলে?'

পার্থ নির্বিকার গলায় বলল, 'মা একা নয় তো, রুম্পার মা-ও আছে। ঝামেলা ট্যাকল করতে মাধুবউদি ওস্তাদ। ও-ই বাবাকে ঠান্ডা করে দেবে দেখো। চিন্তা কোরো না তিথি, আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তিথির গা পাক দিচ্ছিল। কলাটা হয়তো হজম হয়নি। একটা উদ্যত ওয়াক চেপে সে বলল, 'মাধুবউদি তোমাদের কে হন?'

'কেউ না তো? এমনি, ওপরে থাকে। তবে আমাকে আর সীমাকে খুব ভালোবাসে। সীমা রুম্পাকে পড়ায়। মাধুবউদির হৃদয়টা খুব বড়ো। জানো, উনিও বাড়ির অমতে সলিলদাকে বিয়ে করেছিলেন। মাধুবউদি বোধ হয় এখনও বাপের বাড়িতে যেতে পারে না।'

তিথির মনে হচ্ছিল, ভাগ্যিস এই জায়গাটা এতই অন্ধকার যে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পাচ্ছে না।

সত্যিই সেদিন অলক বাড়ি ফিরে আসার পর মাধবীই তাঁকে বুঝিয়ে–সুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছিলেন। একজন গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলে অন্যেরা একপাশে দাঁড়িয়েই দেখে। সুধাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। সীমা শুয়েছিল দেওয়ালের দিকে মুখ করে। সেই যে সে দৌড়ে দোতলায় গিয়ে মাধবীকে ডেকে এনেছিল, তারপর থেকেই সে অন্যমনস্কভাবে কী যেন ভেবেই চলেছে।

অলক কোনো কথাই শুনতে চাইছিলেন না। তবে লাফঝাঁপ করে পরের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। পার্থ আর তিথি যখন দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল মাধবী তখনও নীচেই রয়ে গেছেন। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে তিনি জল খাচ্ছিলেন। সুধা রান্নাঘরে। অলক টিভি খুলে বসেছেন। তিথিরা ঢুকতেই মাধবী পার্থর দিকে তাকিয়ে গাল ফুলিয়ে ওই ঘরের দিকে ইশারা করলেন। মৃদুস্বরে বললেন, 'তুই আগে যাস না। তিথি গিয়ে আগে প্রণামটা সেরে নিক।'

পার্থ যে তার আগে যাবে না, তা তিথির বোঝা হয়ে গেছে। সে সোজা ঘরে ঢুকে অলকের সামনে গিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল। অলক তক্তপোশের ওপর বসে হাঁটু ভাঁজ করে তুলে টিভি দেখছিলেন, তাঁর লুঙ্গিটা গরমের জন্যে গুটিয়ে তোলা। তিথিকে দেখে তিনি প্রথমে চমকে উঠলেন। তারপর তটস্থ হয়ে লুঙ্গিটাকে ঊরুর ওপর থেকে টেনে নামিয়ে ভদ্রস্থ হওয়ার চেষ্টা করলেন। তিথির দিকে তাঁর আর চোখ ছিল না, তাঁর ভয়ংকর দৃষ্টি তখন পার্থকে খুঁজছে।

তিথি কখন নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে অলকের পা ছুঁয়েছিল, অলক বুঝতেই পারেননি। দরজায় পার্থ এসে দাঁড়ানোমাত্রই তিনি

গর্জন করে উঠলেন, ‘বেরিয়ে যা—বেরো...এক্ষুনি দূর হয়ে যা কুলাঙ্গার—এই মুহূর্তে তুই এই বাড়ি ছেড়ে বেরোবি—’

মাধবী ছুটে এসে যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন, ‘ও কী দাদা, তিথি আপনার পায়ের ধুলো নিল, ওকে আশীর্বাদ করলেন না? ওর তো কোনো দোষ নেই।’

অলক গলার শিরা ফুলিয়ে চেঁচাচ্ছিলেন। মাধবী কৌশলে তাঁকে থামিয়ে দিলেন। অলক তিথির দিকে এক ঝলক দেখেই অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘হ্যাঁ? অ, তাই বুঝি? কই...আমি তো...তা হ্যাঁ, আচ্ছা, ও—ওকে আশীর্বাদ করব না কেন?...’ আবার জ্বলে উঠে বললেন, ‘কিন্তু ওই পাপিষ্ঠটা যেন আমার সামনে না আসে, আমি ওর মুখদর্শন করতে চাই না—’

সুধা কাঁদছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে যেন নিজের মনেই বলছিলেন, ‘আর আমার সহ্য হয় না, কোন অপরাধে এত শাস্তি কপালে ছিল ভগবান!’

পার্থ ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়েই ছিল। সে জানে এভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই তাকে পার পেয়ে যেতে হবে। মাধবী তাকে এক ঠেলা মারলেন, ‘মাথা গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছিস কীরে, বিয়ে করে বউ এনেছিস, বাবার পায়ের ধুলো নে।’

তাঁর বলার মধ্যে একটা ইঙ্গিত ছিল। পার্থ এক মুহূর্ত ইতস্তত করে এগোল। অলকের পা লক্ষ্য করে ঝুঁকতেই অলক ক্ষিপ্ত স্বরে বললেন, ‘নেই না, নেই না, নেব না আমি ওর প্রণাম যাঃ—’ বলেই পা ছুড়লেন। পা-টা এসে লাগল পার্থর ঊরুতে।

পার্থ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সুধার দিকে তাকিয়ে হুমকির ভঙ্গিতে বলল, ‘মা! আমার বাক্সটা খালি করে দাও, আমরা চলে যাব।’

সুধা হাঁ–হাঁ করে কেঁদে উঠলেন আরও জোরে, অলকের দিকে ধেয়ে গিয়ে পাগলের মতো মাথায় হাত চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন, 'তাই যা, তাই যা—এই না হলে বাপ! ঘরে যেদিনই বউ এল সেদিনই ছেলে-বউকে তাড়ালে? দু–দিন সবুরও করলে না?'

পার্থ অর্ধমৃত তিথির হাত ধরে টানতে টানতে প্যাসেজে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি আসছি।' সে অন্য ঘরটাতে ঢুকে বাক্স হাঁটকাতে লাগল। তার এখন অন্য চেহারা।

মাধবী সুধাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সুধাকে যেন সামলানো যাচ্ছিল না। মাধবী ব্যাকুল স্বরে অলককে বলেছিলেন, 'ও দাদা, আমি তবে কী বোঝালাম আপনাকে এতক্ষণ ধরে? এত অধৈর্য হলে চলে?...কী মুশকিল, কেউ যে দেখি কোনো কথা শুনছে না, শেষে কি একটা অনর্থ হবে নাকি আজ! ও দাদা, মেয়েটাকে যে মরতে হবে তাহলে—'

অলক হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছিলেন। পার্থ যে নাটকের রাশ এভাবে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেবে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। মাধবীর কথাগুলো শুনে তিনি বিহ্বলের মতো বললেন, 'অ্যাঁ? কী? না, তা আমি তো শুধু ওই ওকে বলেছি চলে যেতে...কই ওর বউকে তো কিছু বলিনি—এই যে, শুনছ? তোমাকে যেতে বলিনি আমি, দ্যাখো কাণ্ড, তোমার নামটা যেন কী—তুমি ঘরে এসে বোসো, শুনছ?'

তিনি তিথিকে ডাকছিলেন। পার্থ অন্য ঘরের ভেতর থেকে শাসানির সুরে গলা তুলে বলল, 'তিথি! যাবে না বলে দিচ্ছি। আমরা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।'

তিথি কর্ণপাত করল না। ধীরে ধীরে অলকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। স্পষ্ট গলায় বলল, 'আমার নাম তিথি। আমাকে যদি দয়া করে এখানে থাকতে দেন, তাহলে ওকেও থাকতে দিন প্লিজ। ওকে তাড়িয়ে দিলে আমি তো এখানে থাকতে পারি না, আমাকে

আমার স্বামীর সঙ্গেই যেতে হবে।'

ঘর নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিথি নিজেও জানত না সে ওইভাবে কথাগুলো বলেছিল কী করে। ওগুলো যেন তার নিজের কথা নয়। যেন মুখস্থ সংলাপ কোনো। তিথি যেন অন্য কারও ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে।

অলক তিথিকে দেখছিলেন। মাধবী চোখ মুছে বললেন, 'ঠিকই তো। দাদা, আর রাগ করবেন না। শান্তি মনে ওদের আশীর্বাদ করুন। ও সীমা, পার্থকে ডাক তো, দুজনে মা-বাবাকে এসে প্রণাম করুক ভালো করে।'

সীমাকে দেখা যায়নি, কিন্তু পার্থ এসেছিল। তিথি আর সে একসঙ্গে প্রণামও করেছিল অলক আর সুধাকে। তিথি মাধবীকেও আবার প্রণাম করতে গিয়ে দেখল, পার্থ মাধবীকে প্রণাম করল না।

রাত নিশুতি হয়ে আসছিল ক্রমশ। মাধবী ওপরে চলে গেছেন। খাওয়া–দাওয়ার পাট সারা। অলক খাটে শুয়ে পড়েছেন। সুধার তখনও কাজ ফুরোয়নি। তিথির চোখ ভেঙে ঘুম আসছিল। কিন্তু সেদিনের মতো তার পরীক্ষা শেষ হতে তখনও কিছু বাকি।

খানিকক্ষণ থেকেই পার্থকে হঠাৎ খুব অধৈর্য দেখাচ্ছিল। যেন সে ভেতরে ভেতরে কী একটা উত্তেজনায় ছটফট করছে। সেটা সে চেপে রাখতে চাইছে কিন্তু পারছে না, তার আচরণের মধ্যে প্রকটভাবে ফুটে উঠছে। তিথি প্রথমে তেমন খেয়াল করেনি। হঠাৎ পার্থ তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অদ্ভুতভাবে একটুখানি হাসতেই তার কাছে একঝলকে সব পরিষ্কার হয়ে গেল।

সীমা তার পাশে বসে বিমর্ষভাবে কালো সরু ফিতে দিয়ে টেনে টেনে চুল বাঁধছিল। তিথি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল,—'বড়দি, আমি, তুমি আর বড়োমা একসঙ্গে শোব, হবে না?'

সীমার মুখটা পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ, কেন হবে না? তাহলে আমরা ওই ঘরের খাটটায় শুই, বাবা আর দাদা এই তক্তপোশে—’

সীমা যেন অনুমোদনের আশায় তিথির দিকে তাকিয়ে হাসল। তিথি এমন নিশ্চিতভাবে মাথা নাড়ল, যেন সে এই বাড়িরই অনেকদিনের লোক।

সীমা ত্বরিত পায়ে উঠে যেতে যেতে বলল, ‘ইশ, বাবা ওঘরে শুয়ে পড়েছে, আসলে আমরা ভেবেছিলাম ওঘরে আমরা তিনজনেই— দাঁড়াও বাবাকে এঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার খুব ঘুম পেয়ে গেছে, এক মিনিট দাঁড়াও, এক্ষুনি শুয়ে পড়বে—’

সীমা চলে যাওয়ার পরে সে-ঘরে পার্থ আর তিথি ছাড়া কেউ ছিল না। পার্থর সারা মুখে কে যেন কালি লেপে দিয়েছিল। তিথি মুখে কিছু বলেনি, তবে তার সারা শরীর দিয়ে একটাই শব্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—ছিঃ!

৪

ছেলেদের মধ্যে ছোটোর ওপরের জন, অনিলই নিয়মিত চিঠিপত্র লেখে। তিন মাস, চার মাস অন্তর হলেও, তার চিঠিতেই শিবানী কলকাতার খবরাখবর পান। অনিলই তাঁকে লিখেছিল, অলকের ছেলে পার্থ নাকি লুকিয়ে বিয়ে করেছে, পাত্রী অরূপের মেয়ে মৌসুমীর বন্ধু। ফলাও করে কিছু লিখতে পারেনি, পোস্টকার্ডে যতটুকু ধরে সেইটুকুই।

চিঠিটা হাতে নিয়ে শিবানী থপথপ করে স্বামীর কাছে গিয়েছিলেন, তবে চিঠি পড়ে অঘোর ব্যাপারটাকে তেমন আমল দেননি, শুধু বলেছিলেন, 'অরূপের মেয়ের বন্ধু? তাহলে অরূপের মেয়ের বিয়ের বয়েস হয়ে গেছে?'

আজ দালানের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই লাল শাড়িপরা ঘোমটা মাথায় মেয়েটিই যে পার্থর বউ, সেটা হিসাব করতে শিবানী যেটুকু সময় নিলেন, সেটা তাঁর বয়সের কারণে। আজকাল তাঁর মাথা তেমন খেলে না। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'ও সুধা, কে?'

বাড়ি ছেড়ে আসার পর কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা তিথিকে অনেক ধাতস্থ করে দিয়েছে, যেন তার বয়স বেড়ে গেছে হঠাৎই। সেদিন মুহুর্মুহু বিশাল ঢেউয়ের ধাক্কায় সে এতদূরে ভেসে গেছিল, যেখানে জল তার বয়সের তুলনায় অনেক বেশি গভীর।

আজ এ বাড়িতে পা রাখবার সময়েও সে মনে মনে প্রস্তুত ছিল। তবু অসীমের মন্তব্যে তার কানে সুচ বিঁধল। আসলে, তিথিকে কেউ বলেনি অসীমের মাথা খারাপ।

তিথি বুঝতে পারছিল, অলক কিংবা সীমা নয়, তার পরিচয় দেওয়ার ভার সুধা কিংবা পার্থর ওপরই বর্তাবে। কিন্তু ওই দুজনের কেউই যেন ঠিক এগোতে সাহস পাচ্ছেন না।

শিবানী সুধাকে প্রশ্নটা করেই তিথির দিকে এগিয়ে আসছিলেন। বাকিরা সবাই যেন নাটকের পার্ট ভুলে যাওয়া অবস্থায় নিথর। কিংবা এই নীরবতাই হয়তো তাদের ভূমিকা, কে জানে। তিথি আর কালবিলম্ব করল না, সে শিবানীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। অন্যরা তখনও যেন শ্বাসরুদ্ধ করে কীসের অপেক্ষাই করে চলেছে।

শিবানী ফিক করে হাসলেন, পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিবিনে, ও দাদুভাই?'

তাঁর ওই একটি বাক্যে কী জাদু ছিল, মূর্তিগুলো সব প্রাণ ফিরে পেল। পার্থ দ্রুত একটা প্রণাম করেই তাঁকে জড়িয়ে ধরল, কানে কানে বলল, 'বিয়ে করে ফেলেছি ঠাকুমা, তুমি রাগ করোনি তো?'

'ও আমার গোপাল! তুমি নাতবউ এনেছ আমার, আমি রাগ করতে পারি? ওর নাম কী?'

'ওর নাম তিথি, মা! আপনার শরীর ভালো তো?' সুধা শাশুড়ির পায়ের পাতা হাতড়াচ্ছিলেন। সীমা ঠাকুমার লুটোনো শাড়ি একটু তুলে ধরে হাসতে হাসতে বলল, 'মা এই নাও ঠাকুমার পা, ঠাকুমা তুমি বুঝি পায়ে ধুলো পড়বে বলে এমনি ঢেকে, চেপে রাখো, আর সবাই তোমার পায়ের ধুলো খোঁজে।' সীমা ঠাকুমার গলা জড়িয়ে ধরল, 'আমি তোমায় শাড়ি পরিয়ে দেব, হ্যাঁ ঠাকমা!'

'বাবা কেমন আছেন?' সুধা ঘরের দিকে মুখ ফেরালেন। অঘোরের জ্বরমাপা তখন শেষ হয়েছিল, আজকেও থার্মোমিটারের পারা আটানব্বই ছোঁয়নি, তিনি একটু নিরাশ মুখে বাইরে এলেন।

সুধা তাঁকে প্রণাম করার আগে মাথায় ভালো করে ঘোমটা তুললেন। এতক্ষণে কেবল তাঁর খোঁপাটাই ঢাকা ছিল। প্রণাম করে বললেন, 'বাবা একটা অপরাধ হয়েছে আমার, আপনি বোধ হয় জানেন—আপনার নাতি বিয়ে করেছে।'

পার্থ তিথির দিকে ইশারা করে দাদুর দিকে এগোল। অঘোর নির্নিমেষে দেখছিলেন, আস্তে আস্তে বললেন, ‘তা ভালোই, নিজে নিজে বিয়ে করেছ? কাগজের বিয়ে?’

পার্থ ঘাড় নাড়ল। তিথি তাঁর পা স্পর্শ করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি অরূপের মেয়ের সঙ্গে পড়তে? বাবার নাম কী?’

তিথি নাম বলল।

অঘোর একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ‘উচ্চ অবসর্ণ, তাও ভালো। কাউকে জানালে না কেন তোমরা?’ তাঁর প্রশ্নটা অলকের উদ্দেশে। অলক কপালে হাত দিলেন, কী বলতে চাইলেন সেটা অঘোর হয়তো ঠিক বুঝলেন না, কিন্তু নিরুৎসাহ গলায় বললেন, ‘ও, তা যাও সব হাতমুখ ধোও, পরে কথা হবে।’

‘উফ্, নিশ্চিন্ত!’ সীমা ফিসফিস করল। সে এখন তিথির পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, ‘চলো, তোমায় আমাদের বাড়িটা ঘুরিয়ে আনি।’

তিথি সীমার সঙ্গে যেতে রাজি ছিল, সুধা বললেন, ‘ও কী! আগে চানটান করে সুস্থ হও সব?’

‘বাথরুমে তো তিনটে, তোমরা ঢুকে পড়ো।’ সীমা চটপট উত্তর দিল, ‘আমরা পরে চান করব, আমার দেরি লাগবে।’ সে তিথির দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমিও নিশ্চয়ই পরে চান করবে?’

দেশের বাড়িতে এসে সীমাও যেন মন্ত্রবলে বদলে গেছে। সে এখন একটি আগাপাশতলা ছটফটে বাচ্চা মেয়ে। তিথির খুব ভালো লাগছিল। সে ঘোমটার আড়ালে হাসল।

উঠোন পেরিয়ে যেতে যেতে অসীমের দিকে চোখ পড়ল তিথির। অসীম তার দিকেই দেখছে। এই লোকটিই তাকে দেখে ওইরকম মন্তব্য করেছিল। তিথি নিজের সম্বন্ধে 'মেয়েছেলে' কথাটা কখনোই শোনেনি। তার ধারণা, কথাটা খুবই অশিষ্ট, অপমানকর। তিথি দেখল, লোকটি ভারি অদ্ভুত। ময়লা চিরকুট একটা পাজামা পরে হাতে তেলের বাটি নিয়ে এমনভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, যেন বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়ানোটা তার এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সীমা আবার তার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করল, 'আমার ছোটোকাকা, মাথায় একটু গোলমাল আছে, তা হোক, তুমি প্রণাম করো।' তারপর অসীমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী গো ছোটকা, চান করতে গেলে না এখনও? এই দ্যাখো দাদার বউ, তোমায় প্রণাম করবে।'

তিথি প্রণাম করতেই অসীম প্রথমটায় চমকে উঠে জড়সড় হয়ে গেল। তারপর তার তেল ছপছপে ডান হাত তিথির ঘোমটা দেওয়া মাথায় জোরে চেপে রেখে স্পষ্ট উচ্চারণে বলল, 'চির সৌভাগ্যবতী হও।'

সীমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তিথি বাড়িটা দেখছিল। বিরাট বাড়ি। ঘরগুলোর মধ্যে কয়েকটা বড়ো বড়ো, তাতে তক্তপোশ জুড়ে জুড়ে ঢালাও বিছানা পাতা। বাকি ঘরগুলো মাঝারি। সব ঘরে কালো হয়ে যাওয়া কাঠের পুরোনো আসবাবপত্র। দেয়ালে বিভিন্ন সারিতে মোটা মোটা ফ্রেমে বাঁধানো ফটো ঝুলছে। ফটোগুলো বেশিরভাগই হলুদ আর ঝাপসা হয়ে গেছে, কোনোটায় কারও কোনো মুখ দেখা যায় না। ঘরগুলোতে অদ্ভুত প্রাচীন গন্ধ পাচ্ছিল তিথি। কিছুটা মিষ্টি, কিছুটা কটু, কিছুটা ঝাঁঝালো। পুরোনো, ঘন হয়ে আসা মাথার তেলের মতো।

দক্ষিণদিকে দুটো বড়ো ঘর, তার একটায় অঘোর থাকেন। তার পরে একটা খোলা উঠোন। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে এই উঠোনেই প্রথমে পা রেখেছিল তিথি। উঠোনের একপাশে অলকের ঘরের লাগোয়া একটা বাথরুম। এটাই সবচেয়ে বড়ো। উঠোনের পর দুটো মাঝারি আকারের ঘর, ঘরের পুবদিক দিয়ে একটা প্যাসেজ, এদিকে দু-ধাপ উঠে আবার ওদিকে দু-ধাপ নেমে আর

একটা খোলা উঠোনে গিয়ে পড়েছে। এই প্যাসেজটা আসলে বারান্দারই একটা ভেতরে ঢুকে আসা অংশ। ওপাশের উঠোনটা অপেক্ষাকৃত ছোটো। এটাকে ঘিরেও আরও কয়েকটা ঘর। এখানেই একটা ঘরে থাকে অসীম, তার সঙ্গে শিবানীও। রান্নাঘর আর খাওয়ার ঘর আলাদা, দুটোই বেশ বড়ো। রান্নাঘরে বিশাল মাটির উনুন, তিথি আগে কখনো এত বড়ো উনুন দেখেনি। লোকজন এলে এইটাতে রান্না চাপে। অন্যসময়ের জন্য ছোটো উনুনও আছে। আর একদিকে ঠাকুরঘর। ঠাকুমা নাকি বৈষ্ণববাড়ির মেয়ে, ঠাকুরঘরে তাঁর পিতলের গোপাল দোলনায় দুলছে। এই সব ঘর আর উঠোনের সামনে দিয়ে পুবমুখো টানা বারান্দা। বারান্দাটা দক্ষিণ দিকে ক্রমশ সরু হয়ে ত্রিভুজের কোণের মতো মিলে গেছে। এই টানা বারান্দাই ঘুরে গেছে উত্তর–পশ্চিম কোণে, সেখানে পাশাপাশি আরও দুটো বাথরুম।

সীমা উৎসাহের সঙ্গে তিথিকে সব ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে বলল, ‘দেখেছ? কত বড়ো বাড়ি না? আমাদের এখানেই জন্ম। আর কলকাতায় কেমন ভাঙা বাড়িতে পড়ে আছি। শুনলে কেউ বিশ্বাসই করে না দেশে আমাদের এত বড়ো বাড়ি আছে!’ সীমার কথা বলার মধ্যে এমন একটা ছেলেমানুষি গর্ব আর নৈরাশ্য মিশে ছিল, তিথিকে খুব স্পর্শ করল। সত্যিই, ভাবা যায় না, কী বিশাল বাড়ি! দোতলার তুলনায় একতলাটা অদ্ভুত ফাঁকা। সেটাও সীমা পেছনদিকের একটা ছোটো সিঁড়ি দিয়ে নেমে তিথিকে দেখিয়ে এনেছে। সেখানে বড়ো বড়ো দরজা বন্ধ ঘর। সীমা বলল এগুলোর মধ্যে পুরোনো বাসন–কোসন, বাতিল আসবাব আর বিছানা, ভাঁড়ারের চালডাল, দোকানের জিনিসপত্র ভরতি। তিথির দমবন্ধ লাগছিল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে বলল, ‘এসো বড়দি। আচ্ছা, ছাদে যাওয়া যায় না?’

খোলা উঠোনে দাঁড়িয়েই তিথি দেখেছিল এ বাড়ির তিনটে আলাদা আলাদা ছাদ, ছাদের ধারে কোনো রেলিং নেই। ছাদে যাওয়ার কোনো সিঁড়িও চোখে পড়েনি তার।

সীমা বলল, ‘ছাদে? একটা মই বোধ হয় আছে। ওইটে লাগিয়ে যাওয়া যায়। আমি কখনো যাইনি।’

শিবানী মহাব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করছেন। বাড়িতে একজন রাঁধুনি আছে, শিবানী এক–এক বার রান্নাঘরে এসে তাকে নানান নির্দেশে উদব্যস্ত করে তুলছেন, আবার দু-দুটো উঠোন পেরিয়ে সুধার কাছে যাচ্ছেন। অঘোরের ঘরের পাশের ঘরটাতেই সুধারা থাকবেন। এখনও স্নান করতে যায়নি সুধা, তিনটে বাথরুমে অলক, পার্থ আর অসীম ঢুকেছে।

পুরো বাড়িটা চক্কর দিয়ে ফিরতে ফিরতে তিথির শিবানীর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। চোখাচোখি। শিবানীর আঁচল এখন বেশ করে কোমরে পেঁচিয়ে গোঁজা, সীমা গুঁজে দিয়েছে। তাঁর মুখে হাসি। তিথি এমন হাসি আগে দেখেনি। শিবানীর মুখে অজস্র ভাঁজ, তাঁর হাসি যেন সেই ভাঁজে ভাঁজে জমে আছে, ভাঁজ থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামছে। তিনি তিথিকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন।

সীমা এগিয়ে গেল, ‘কী বলছ ঠাকমা?’

শিবানী হাসি হাসি মুখে গোপন কথা বলার মতো চাপা গলায় বললেন, ‘হ্যাঁরে সীমা, পার্থ বুঝি ঘরটর তুলে নিয়েছে?’

‘না, তো?’ সীমা ঠাকুমার প্রশ্নের গতিপ্রকৃতি বুঝতে পারছে, বলল, ‘আমরা ভাড়া বাড়িতে থাকি ঠাকমা, ঘর তুলবে কোথায়?’

‘তবে ও বউ নিয়ে কোন ঘরে থাকে রে? তোদের ওখানে তো দুটোই মাত্তর ঘর।’

তিথির কানমাথা গরম হয়ে উঠছিল। সীমা পরিতৃপ্তির হাসি হেসে বলল, ‘না গো, তিথি আমাদের সঙ্গেই শোয়। আমি, মা আর তিথি একটা ঘরে, আর বাবা-দাদা আরেকটায়।’

শিবানী বোকার মতো তাকিয়ে ছিলেন। তিথির এত অপ্রস্তুত লাগছিল যে নিজের হাত দুটো নিয়ে যেন কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। অকারণে ঘোমটা টানছিল, আঁচল গুছাচ্ছিল। এভাবে সবসময় শাড়ি পরার অভ্যাস আগে না থাকলেও তার শাড়িতে

অসুবিধে হয় না। শুধু মাঝে মাঝে খুব গরম লাগে।

শিবানী হঠাৎ খুব নরম গলায় বললেন, ‘আমার কাছে আর অত মাথায় কাপড় দিতে হবে না। তুই বুঝি আমার নাতির সঙ্গে ভালোবাসা করেছিস?’ শিবানী পা ঘষে ঘষে তিথির আরও কাছে চলে এলেন, মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, ‘আমায় কিন্তু সব গল্প বলতে হবে, হুঁ!’

তাঁর মুখে পানদোক্তার গন্ধ। তিথির হাসি পেয়ে গেল।

৫

তিথি চলেফিরে বেড়াচ্ছে, কথাবার্তা বলছে, খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, এমনকি হাসছেও। কিন্তু সে ভেতরে ভেতরে একটুও স্বাভাবিক নেই। সে যেন ধীরে ধীরে কেমন ভূতগ্রস্তের মতো হয়ে উঠেছে। বাইরে থেকে দেখে বোঝার উপায় নেই, তিথি নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না।

এ বাড়িতে আসার পর দু-দিন হয়ে গেছে। তিথি যেন কেমন নিরাপত্তার অভাবে ভুগতে শুরু করেছে। তার সঙ্গে কেউই খারাপ ব্যবহার করছে না। শুধু অসীম তার দিকে মাঝে মাঝে ভুরু কুঁচকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকায়, যেন তাকে চিনতে পারছে না। এর মধ্যে একদিন দুপুরে তার বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল, কিন্তু এদিককার বাথরুমটা বন্ধ থাকায় সে বারান্দা দিয়ে ওদিককার উঠোন পেরিয়ে ওপাশের বাথরুমে যাচ্ছে, অসীম তার ঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, ‘কে রে? কে রে?’ বলে। তিথির বুক ধড়াস করে উঠেছিল, ভাবছিল সাড়া দেবে, না দেবে না। তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে শুকনো গলায় বলেছিল, ‘আমি তিথি!’

অসীম চিনতে না পেরে আবার রাগের গলায় বলল, ‘কী তিতি, তিতি কে? এখানে এসেছিস কেন, শোন এদিকে, শোন!’

অসীম তার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, তার পরনে আজও সেই পাজামাটা। গায়ে একটা হাফহাতা শার্ট। তিথি উঠোনের মাঝখানে। তার ভয়ের চোটে আরও জোরে বাথরুমে পেয়ে গেছে, কিন্তু ভয় হচ্ছে বাথরুমের দিকে যেতে গেলেই অসীম যদি তেড়ে আসে।

শিবানী অসীমের ঘরেই বেশিরভাগ সময় শোন, কিন্তু সেদিন তিনি কী কারণে ঠাকুরঘরের মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলেন। অসীম আর একবার চিৎকার করতেই তাঁর ঘুম ভাঙল। তিনি শুয়ে শুয়েই দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, তিথি ফ্যাকাশে মুখে

উঠোনে দাঁড়িয়ে। তার চোখ অসীমের ঘরের দিকে।

‘কী হয়েছে রে, ও তিথি! কী হয়েছে?’ শিবানী প্রশ্নটা করতে করতেই বুঝে গেছিলেন কী হয়েছে। তিনি ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে সোজা অসীমের ঘরের দিকে চললেন, তাঁর শাড়ির প্রান্ত ঠাকুরঘরেই রয়ে গেল।

‘কী হয়েছে, ও অসীম! কী বলছিস তুই পার্থর বউকে?’

‘পার্থর বউ, পার্থর বউ কোত্থেকে এল? আমারই তো বিয়ে হয়নি এখনও—’

শিবানী অসীমের গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে কীসব সান্ত্বনার কথা বলছিলেন। তিথি আর দাঁড়ায়নি। তাড়াতাড়ি বাথরুমে চলে গিয়েছিল।

কিন্তু অসীম তো প্রকৃতিস্থ নয়। সে ছাড়া বাড়ির অন্য মানুষেরা তিথিকে যেভাবে বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করেছে, তাতে বরং তিথির নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়ার কথা। এতটা সে নিজেই আশা করেনি। কিন্তু তিথি মানসিক স্বস্তি পাচ্ছে না। তার শুধুই মনে হচ্ছে এ কোথায় এসে পড়েছে সে? এরা কারা? সে নিজেই-বা কে? এই বিরাট বাড়ি যেন তাকে পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে ক্রমশ, এর পুরোনো গন্ধমাখা ভারী বাতাস-ভরতি ঘরদোর, অসংখ্য চিড়ের আঁকিবুকিময় লাল শানের উঠোন, এই বাড়ির লোকজন—সবই তার কাছে যেন জন্মান্তরের স্বপ্নের মতো লাগছে।

তার নিজেকে আরও অসহায় মনে হওয়ার কারণ, এখানে আসার পর পার্থর সঙ্গে সারাদিন তার প্রায় কথাই হচ্ছে না। পার্থ সকালে উঠেই বেরিয়ে যাচ্ছে পুজোর জোগাড়যন্ত্রে। দুপুরে ফিরতে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাচ্ছে তার। খাওয়া-দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার বেরোয় সে, ফেরে সন্ধ্যের পর।

তৃতীয় দিন দুপুরে খাওয়ার পর তিথি পার্থর কাছ ঘেঁষে এল। ঘরে তখনও আর কেউ আসেনি।

‘তুমি এত দূরে দূরে থাকছ কেন আমার থেকে?’ তিথির গলায় করুণ অভিযোগ।

পার্থ চিত হয়ে শুয়েছিল। মুখ ফিরিয়ে তিথির দিকে তাকিয়ে হাসল, ‘কই না তো? দূরে দূরে যাব কেন? তোমার খুব একা লাগছে, না!’ পার্থ পাশ ফিরল। তিথির কোলের ওপর একটা হাত রেখে বলল, ‘অনেক কাজ, তিথি! সব একা দেখতে হচ্ছে। এমনিই হয় প্রতিবার। দুর্গাপুজো করা তো চাট্টিখানি কথা নয়!’

‘আমাকে তোমার সঙ্গে নাও না, আমি হেল্প করব?’

পার্থ মাথা নাড়ল, ‘এসব তোমার কাজ নয় তিথি, এসব বাইরের কাজ। সারাদিন চরকিপাক ঘুরতে হচ্ছে। তারচেয়ে, বাড়িতেও তো অনেক পুজোর কাজটাজ আছে। মা বোধ হয় এখনও ওসবে হাত লাগায়নি। আমি মাকে বলছি, তুমি মাকে হেল্প কোরো।’

তিথি ঘাড় নাড়ল। সে তার কোলের ওপর রাখা পার্থর হাতটা নিজের আঙুলে জড়িয়ে রেখেছিল, তার মুখে একটা ক্লিষ্ট করুণ ছায়া। পার্থ আন্তরিক স্বরে বলল, ‘তিথি? তোমার শরীর ঠিক আছে তো?’

তিথি আবার নীরবে ঘাড় নাড়ল। শরীর তার খারাপই। থেকে থেকে জিভ শুকনো হয়ে ওঠে, নিশ্বাস গরম লাগে। এই মুহূর্তে সেরকম কিছু হচ্ছে না। কিন্তু শরীরটা সবসময়ই খুব দুর্বল মনে হয়। তার বোধ হয় রাত্রে ভেতরে ভেতরে জ্বর আসে। সে পার্থকে কিছু বলল না। একেই ওর কাজের চাপে নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই, ওকে সামান্য শরীর খারাপের কথা বলে ব্যস্ত করাটা ঠিক না। কিন্তু মনে মনে তিথির খুব ইচ্ছে করছে আজ দুপুরবেলাটা পার্থ না বেরোক, সে একটু পার্থর কোলে মাথা রেখে শোবে।

রাত্রে শুতে শুতে এখানে বেশ রাত হয়ে যায়। দক্ষিণের বড়োঘরে ঢালাও বিছানায় সবাই একইসঙ্গে শোওয়ার বন্দোবস্ত। জানলার ধারে অলক, তারপর সুধা, তারপর সীমা। সীমার পরে তিথি, তিথির পাশে পার্থ। একসঙ্গে শোওয়ার এই ব্যবস্থাপনায় তিথি প্রথমে একটু অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরে ভেবে দেখল, পুজোর সময় এ বাড়িতে রীতিমতো ভিড় লেগে থাকে। এক–একটি পরিবারের জন্য এক–একটি ঘরই সমীচীন।

সীমা যখন শিবানীর প্রশ্নের উত্তরে বলছিল তিথি আমাদের সঙ্গে শোয়, তখন তিথি একটা অন্যরকম লজ্জায় অভিভূত হয়ে যাচ্ছিল। সে বিবাহিত অথচ স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে না, এ যে খুব গর্ব করে বলার কথা নয়, সীমা তা বোঝেনি। কিন্তু তিথির এই সিদ্ধান্তের পেছনে যে অতিসূক্ষ্ম শালীনতা বোধ কাজ করেছে, সেও কি কেউ বুঝেছে! কলকাতার বাড়িতে বিয়ের পরের সেই দুঃস্বপ্নের প্রথম দিনটিতে তার সঙ্গে রাত্রিযাপনের আগ্রহে পার্থর যাবতীয় ছটফটানিকে সে ঘৃণার সঙ্গে নস্যাৎ করে দিয়েছিল। কেননা, সে আর পার্থ একঘরে থাকলে অলক, সুধা আর সীমাকে আর একটি ঘরে একখাটে গাদাগাদি করে শুতে হত। ওই বাড়ির মেঝে এত নীচু আর ড্যাম্পধরা যে মাটিতে বিছানা পেতেও শোয়া যায় না। একটি অনতিপরিসর খাটে তিনজন পূর্ণবয়স্ক নারীপুরুষ, যাঁদের মধ্যে তার শ্বশুর–শাশুড়ি আছেন, তাঁরা কষ্ট করে শুয়ে রাত কাটাবেন, আর তারা দুজন অন্যঘরে দরজা দিয়ে মধুনিশি যাপন করবে এই সম্ভাবনাকেই তিথির মনে হয়েছিল চূড়ান্ত অশ্লীল, অশোভন। তাই সে যেচে সুধা আর সীমার সঙ্গে শোয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এক্ষেত্রেও তিনজনকে একখাটে শুতে হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু তিথির মনে হয়েছিল সে নিজেকে, আর অন্যদেরও, একটা পীড়াদায়ক অশোভনতা থেকে বাঁচাতে পেরেছে।

সে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল, যখন দেখল এই ব্যবস্থাই গত চার-পাঁচ মাস ধরে স্থায়ী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। সীমা আনন্দে আছে, অলকের এসব ব্যাপারে মাথা ঘামানোর কথাই নয়, সুধাও কিছু বলেন না। পার্থ আড়ালে তাকে সিদ্ধান্ত বদলানোর জন্য জোর করে, সে চায় তিথি তার সঙ্গে রাত্রে একঘরে থাকুক, যদিও সেজন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করতেও সে রাজি নয়। তিথিও নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকল।

তিথি মনে মনে বুঝতে পারে যা ঘটছে তা পুরোটাই অত্যন্ত গোলমেলে, জটিল। বিয়ের পর সে স্বামীর সঙ্গে রাত্রিবাস করে না, এ কোনো স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। এ ছাড়া তার আর করারও কিছু নেই। বিয়ের আগেই সে জানত, তাদের কোনো আলাদা ঘর নেই। এ বিষয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে পার্থকে প্রশ্নও তো করেছিল সে। পার্থর আশ্বাসবাণীই তার কাছে যথেষ্ট মনে হয়েছিল। কিন্তু ওই মিথ্যে আশ্বাসটুকু ছাড়া পার্থর আর কিছু দেওয়ার ছিল না।

এর মধ্যে একদিন সে আর পার্থ রাত্রে একসঙ্গে শুয়েছিল বটে, তবে তাদের সঙ্গে সুধাও ছিলেন। পার্থ সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে দু-বার বমি করল, বাইরের খাবার হজম হয়নি। তিথি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল, সুধাও। হঠাৎ তিথি শুনল পার্থ সীমাকে বলছে, ‘এই, আজ তুই আর বাবা ওঘরে শো তো। আমি, মা আর তিথি এঘরে শোব। আমার শরীর খারাপ, রাত্রে উঠতে–টুথতে হবে।’

পার্থ হয়তো সত্যি কথাই বলেছিল। কিন্তু তিথির কেমন সন্দিগ্ধ লাগছিল। পার্থর জন্যে উদ্বিগ্ন মনটা গুটিয়ে শক্ত হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে।

তার মনে হওয়াটা ঠিকই ছিল। সুধা শুয়েছিলেন খাটের একধারে পাশ ফিরে, পার্থ মাঝখানে, অন্যপাশে তিথি। সে রাত্রে তার বুকের মাংসে আর বুকের মধ্যে, কোমরের ওপরে ও নীচে নিঃশব্দে এত জ্বালা আর চাপ সহ্য করতে হয়েছিল, যে বলার নয়। পার্থ তার শরীর থেকে একমুহূর্তের জন্যেও হাত নামায়নি। সুধাও একবারের জন্যেও ওপাশ থেকে এপাশে ফেরেননি। তিথি প্রাণপণে বিশ্বাস করার চেষ্টা করছিল এও তার একটি বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা।

ভোরের দিকে পার্থ তাকে মুক্তি দিয়েছিল। সে শাড়ি ব্লাউজ গুছিয়ে নিয়ে পার্থর পায়ের দিকে মাথা রেখে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়েছিল। পার্থ এখন পড়ে পড়ে ঘুমোবে, কিন্তু তাকে তো ঠিক সময়ে বিছানা ছাড়তে হবে। তার আগে অন্তত একটু ঘুম তার প্রয়োজন।

এই ঘটনার পর সে কিছুদিন পার্থর সঙ্গে কথা বলেনি। সীমা কথা বন্ধ করে দিয়েছিল তার আর পার্থর সঙ্গে। সুধা স্বাভাবিক ছিলেন। পরে সব কিছুই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

দেশের বাড়িতে শোওয়ার এই ব্যবস্থা দেখে তিথি প্রথমে সংকুচিত বোধ করলেও সে ভীষণ অবাক হয়ে গেল, যখন দেখল তার গোপনে খুব আনন্দ হচ্ছে। আসলে, সে তৃষিত হয়ে উঠেছিল। সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায়, অচেনা পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে সে যেন খেই হারিয়ে ফেলছে, এখনই পার্থকে তার নিবিড় প্রয়োজন। অথচ পার্থকেও যেন হঠাৎ কেমন দূরের, ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে মনে হচ্ছে তার। রাত্রিটুকু তাকে কাছে পাওয়া যাবে জেনে, হোক না আরও সবার উপস্থিতিতেই, তিথির নিশ্চিন্ত লাগছিল।

পার্থও তাকে রাত্রে বিরক্ত করেনি। বোধ হয় সে খুব সতর্কভাবেই সংযত হয়ে আছে। তা ছাড়া সারাদিন খাটাখাটনিতে ক্লান্তও। তিথি বালিশ থেকে মাথা নামিয়ে এনে পার্থর বুকের কাছে রাখে, পার্থও সেই মাথাটা আলতো হাতে জড়িয়ে নেয়। অন্ধকারেও তিথি বুঝতে পারে, তার পাশে শোয়া সীমা ঘুমোচ্ছে না। পার্থর বুকের কাছে একঘুম ঘুমোনোর পর তিথি বালিশে উঠে আসে। পার্থ তখন ঘুমে অচেতন। তিথি কান খাড়া করে সীমার নিশ্বাসের শব্দ শোনার চেষ্টা করে। মনে হয় সীমা তখনও জেগে।

সীমা প্রথমদিন দেশের বাড়িতে এসে তিথিকে সঙ্গে নিয়ে যেভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল, তার সেদিনের সেই উৎসাহ যেন হঠাৎ নিভে গেছে। তিথির খুব মনখারাপ লাগে। ভাবে, আজ রাত্রে সে আর পার্থকে ছোঁবে না। কিন্তু পার্থর জন্যেই সারাদিন আকুল প্রতীক্ষা করে সে, আর তার খুব একা একা লাগে। রাত্রে পার্থর বুকে মাথা রাখার জন্যে মুখিয়ে থাকে সে।

দুপুর গড়িয়ে আসছিল। পার্থ বেরিয়ে গেছে। অঘোর আর অসীম যে যার ঘরে ঘুমোচ্ছেন। অলকও। শিবানী আজ বড়োঘরে এসে সীমার পাশে শুয়েছেন। একটু আগে সীমা তাঁর সঙ্গে বকবক করছিল, এখন আর কারোরই সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। ওরাও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তিথি খাটের ধারে বসে বসে শাড়ির আঁচল মুড়ছিল। এই শাড়িটা শিবানী তাকে দিয়েছেন। নাইলনের শাড়ি। সে এখানে আসার পরের দিন শিবানী কাউকে দিয়ে শাড়িটা কিনে আনিয়েছিলেন। তিথির হাতে দিয়ে বললেন, ‘তোর শাশুড়ি এমন করে বউ নিয়ে এল, কিছু কিনেকেটেও রাখতে পারিনি। দ্যাখ দেখি, এইটে পছন্দ হয় কি না?’

তিথি শাড়ির কিছু বোঝে না। সে শুধু রং দেখে। হালকা গোলাপি রং। তাকে এ রং মানায় না, কিন্তু রংটা সুন্দর। সে ঘাড় নাড়ল—পছন্দ। প্রণাম করে শাড়িটা নিয়ে ঘরে আসতেই সীমা বলল, ‘এমা, ঠাকমাটা যেন কী! দিল তো একটা সুতির শাড়িও তো দিতে পারত। নাইলনের শাড়ি ভদ্রলোকে পরে! ঠাকমা বোধ হয় ভেবেছে নাইলনের শাড়ি খুব হালফ্যাশন!’

অতশত কিছু বোঝেনি তিথি। শ্বশুরবাড়িতে এসে অবধি তাকে শাড়ি পরতে হয়। কিন্তু তার শাড়ি প্রায় নেই বললেই চলে। এমনিতে সে সুধা আর সীমার শাড়িই পরে। এখানে আসার আগে সুধা পুজোয় পরার জন্যে তাকে আর সীমাকে দুটো পাড়ওয়ালা তাঁতের শাড়ি আর ব্লাউজ কিনে দিয়েছেন। মাধুবউদি একটা শাড়ি দিয়েছিলেন যেটা পরে সে এসেছে। আর এই একটা শাড়ি হল। শাড়িটা মন্দ কী! শুধু ধারগুলোয় বড্ড সুতো উঠছে। ওইটুকু মুড়ে নিতে হবে। শিবানীর কাছ থেকে সুচসুতো চেয়ে নিয়ে আজ ওই শাড়িটাই মুড়ছিল সে।

সুধা ঘরে ছিলেন না। দরজার কাছে এসে তিথিকে ডাকলেন, ‘তিথি, এসো তো আমার সঙ্গে। চলো ঠাকুরঘরে যাই। আস্তে আস্তে গোছগাছ শুরু করতে হবে।’

তিথি শাড়ি রেখে ঘোমটা ঠিক করে সুধার সঙ্গে চলল। বাড়িতে সবাই ঘুমোচ্ছে, সুধার সামনে তার ঘোমটা দেওয়ার কোনোই কারণ নেই। তবুও তিথি দিচ্ছে। অভ্যাস করা ভালো। দু-দিন পরে লোকজন আসতে শুরু করবে, এখানকার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা হবে। সুধাই বলেছেন, তাঁদের সামনে ঘোমটা দিয়ে থাকতে। তা ছাড়া, তিথি নিজেই বুঝতে পারছে, সে আর পাঁচটা স্বাভাবিক বিয়ে হওয়া বউদের থেকে আলাদা। তার স্বীকৃতির চারপাশে একটা অদ্ভুত শূন্যতা ভাসছে। ওই শূন্যতাটুকু ভরানোর

চেষ্টা তাকে করে যেতে হবে।

পুজোর কাজ করতে করতে তিথি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। তার বুকের মধ্যে হু–হু করে ওঠে থেকে থেকে। বাড়ির কথা, মা-বাবার কথা সে একেবারে ভাবতে চায় না আজকাল। ভাবতে গেলে ভয় করে তার। এ ভাবনার কোনো তলকূল নেই। বাড়ি ছেড়ে চলে আসার পর একদিনও যোগাযোগ হয়নি, কোনো খবরও পায়নি সে। তারও কোনো খবর নেননি মা-বাবা, মৌসুমীদের বাড়িতেও কোনো খোঁজ করেননি। তিথিও প্রাণপণে ভাবতে চেয়েছে তার আগের কোনো জীবন ছিল না, জীবনের প্রথম উনিশ-কুড়ি বছর যেন কবে মুছে গেছে তার অস্তিত্ব থেকে, আর এখন এই বাড়িতে আসার পর থেকে একথাটাকে সে যেন কেমন বিশ্বাস করতেই শুরু করেছে। পুজোর কাজ করতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হল, তার মায়ের কিংবা বাবার দিকের কোনো বাড়িতে দুর্গাপুজো হয় না। মা একবার কথায় কথায় বলেছিলেন, বাড়িতে দুর্গাপুজো হওয়া, সেই পুজোর কাজে অংশ নিতে পারা একটা ভাগ্যের কথা, একটা বিরাট অভিজ্ঞতা। আজ সে তার শ্বশুরবাড়ির পুজোর কাজে অংশ নিচ্ছে, তিথি ভাবল, এই কথাটা জানতে পেলে মায়ের কি একটুও আনন্দ হত না!

রঙিন কাপড় দিয়ে ছোটো ছোটো পতাকা বানাচ্ছিল তিথি। সে আগে জানতই না, দুর্গাপুজোয় এরকম পতাকা লাগে। সুধা তাকে কাপড় ভাঁজ করার কায়দাটা দেখিয়ে দিয়েছেন। তারপর একটা সিন্দুক খুলে তার মধ্যে থেকে বিভিন্ন সাইজের কৌটো বার করে কোনোটা ঝাঁকিয়ে কোনোটা ঢাকা খুলে দেখছেন। ওই পুরোনো কাঠের সিন্দুক আর তার ভেতরের কৌটোগুলো থেকেও একটা বিচিত্র গন্ধ বেরিয়ে ঘরের বাতাস ভারী করে তুলেছে। বাইরে শরতের রোদে মুচমুচে দুপুর, ঠাকুরঘরের ভেতরটা অদ্ভুত ঠান্ডা। তিথির কেমন নেশাচ্ছন্ন লাগছিল। তার নিশ্বাসও আবার গরম হয়ে উঠেছে।

সুধা তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, ‘পারছ? হ্যাঁ ওই তো হচ্ছে। ওরকম হলেই চলবে। এগুলো অন্যবার সীমাই করে।’ সুধা আবার সিন্দুকে মন দিলেন, খানিকটা নিজের মনেই বললেন, ‘তা ওর যে আবার কী হল, দেখছি তো শুধু গড়াচ্ছে। শরীর

খারাপের তারিখটাও এগিয়ে আসছে অবিশ্যি...' সুধা সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করলেন। তিথির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সীমার শরীর খারাপ হয়ে গেলে শুধু তুমি আর আমি—ব্যাস! আর সবাই আসবে আর কেবল গল্প করবে। দেখো না, এসে তো পড়ল বলে সবাই। আমাকে আর সীমাকেই খেটে মরতে হয়, যেন পুজো শুধু আমাদেরই।'

তিথির পতাকা বানানো হয়ে গিয়েছিল। সে মুখ তুলে বলল, 'আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে সব কাজ করব, হ্যাঁ বড়োমা? আমাকে কাজ দাও, আর কী করতে হবে?'

'আজ আর থাক। এবার ওঠো, আস্তে আস্তে হবে'খন।'

কিন্তু তিথির আরও কাজ করতে ইচ্ছে করছে, কাজে ডুবে থাকতে ইচ্ছে করছে নেশার মতো। সে জেদ ধরে বলল, 'না বড়োমা, কাজ বলো। দেখো আমি ঠিক পারব, তুমি একটু শিখিয়ে দিলেই পারব। বলো না, কী করব আর?'

সুধা তিথির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে দেখলেন, সে সত্যিই আন্তরিকভাবে কাজ করতে চাইছে। খুশি হয়ে একটা কুলো পেড়ে তাতে ধান ঢাললেন, 'তাহলে এগুলো বেছে রাখো। গোটা ধানগুলো বেছে সরিয়ে এই কৌটোয় তুলে রাখবে। খোসাওঠাগুলো কুলোয় থাকবে, কেমন?'

সুধা চলে গেলে তিথি একা একা একাগ্র হয়ে ধান বাছছিল। তার সমস্ত মন বড়ো অস্থির হয়ে আছে। অস্থির মনকে শাসন করবার এই একটিই উপায়, তাকে কোনো এক বিন্দুতে জড়ো করা। অস্থিরতার ভয়ে তিথি যেন নিশ্বাসও চেপে রাখতে চাইছিল।

জ্বর আসছে। সেইসঙ্গে পুজোও। এই প্রথম পুজোর সময় জ্বর হচ্ছে তিথির। এই প্রথম সে পুজোয় কলকাতার বাইরে, বাড়ির বাইরে—। তিথি নিজেকে সামলে নিল। বাড়ি বলতে এখনও কোন বাড়ি বোঝে সে? যে বাড়ি সে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে চলে

এসেছে, সেই বাড়ি!

৬

বাড়ি–ভরতি লোক। অলকের ভাইরা সবাই এসে গেছেন। তাঁদের স্ত্রীরা, ছেলেমেয়েরা। বাড়িটা যেন আমূল বদলে গেছে। সেই ফাঁকা ফাঁকা ঘর, খাঁ–খাঁ বারান্দা এখন হাঁকেডাকে, কথাবার্তায়, ঝগড়ায়, হাসিতে, বাচ্চাদের ছুটোছুটিতে মশগুল। কোথাও, এমনকী তিথির মাথার মধ্যেও যেন একচিলতে নিরিবিলি নেই। এই ক–দিনে তাকে এতরকম প্রশ্নের উত্তর এতবার করে দিতে হয়েছে যে বলার নয়। তার বিয়ের কথা সবাইই জেনে গিয়েছিলেন, এখানে আসার পর জলজ্যান্ত তাকে দেখে তাঁদের কৌতূহল আর বাধা মানছে না।

পার্থর সেজোকাকা অমল আর ভালোকাকা অনিল এলেন একই সঙ্গে, সপরিবারে। তাঁরা যখন এসে পৌঁছোলেন, তিথি তখন বাথরুমে স্নান করছে। উঠোনের পাশেই বাথরুম। তিথি যখন স্নান সেরে বেরোল, তখনও সবাই উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছেন।

বাথরুমের মধ্যে শাড়িটা ভালো করে পরতে পারেনি তিথি, কেবল গায়ে জড়িয়ে রেখেছে। এটা সেই শিবানীর দেওয়া গোলাপি নাইলনের শাড়িটা। তার বাঁ–হাতের ওপর জলকাচা ছাড়া শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ আর ভিজে গামছার বোঝা। ডান হাতে চশমা। বাথরুম থেকে বেরিয়েই সামনে উঠোন ভরতি লোক দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল তিথি। তার ওপর চশমা ছাড়া সে তখন রীতিমতো ঝাপসা দেখছে। চশমাটা জলের ফোঁটায় ভরতি, ভালো করে না মুছে পরাও যাবে না। তিথি চশমা ছাড়াই বুঝতে পারছিল, আগন্তুকদের সবার মাথা তার দিকেই ঘোরানো। সদ্যআয়ত্ত রিফ্লেক্সে সে মাথায় শাড়ি টানল।

কয়েক মুহূর্তের রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতা ভেঙে দিলেন শিবানী। একগাল হেসে বললেন, ‘বলো দেখি কে?’

তাঁর প্রশ্নটা তিথির উদ্দেশে নয়, তাঁর পুত্র–পুত্রবধূদের উদ্দেশে। তিনি পা ঘষে ঘষে তিথির দিকে এগিয়ে আসছিলেন। যাঁদের

তিনি প্রশ্নটা করলেন তাঁরা জানেন উত্তরটাও শিবানীই দেবেন। তাঁরা সেই অপেক্ষাই করছেন।

‘এইটাই তো পার্থর বউ!’ শিবানী তিথির কাছে পৌঁছে তার হাত ধরলেন।

‘অনিল যখন আমায় চিঠিতে লিখেছিল, আমার তো প্রথমটায় বিশ্বেসই হয়নি। তারপর দেখি ও মা! এ যে সত্যিকারের বউ! তা দ্যাখ, তোরাই অ্যাদ্দিন দেখিসনি, আমি কেমন তোদের বউ দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিলুম!’

অমলের স্ত্রীর নাম দীপ্তি, তিনি বলে উঠলেন, ‘খবরটা তাহলে সত্যি! আমাকেও সুমিতা যখন বলেছিল আমিও বিশ্বাস করতে পারিনি। তার পরে মেজদাদের কাছে শুনেও—’

দীপ্তি কথাটা সম্পূর্ণ করার আগেই চকিতে একবার অঘোরের ঘরের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। অঘোর একটু আগেই উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন ঘরে ঢুকে গেছেন। কিন্তু দীপ্তির মনে হল এখানে দাঁড়িয়ে অরূপদের কথা বলা হয়তো ঠিক নয়।

সুমিতা অর্থাৎ অনিলের স্ত্রীর যদিও এরকমটা মনে হয়নি। তিনি তিথিকে আগাপাশতলা দেখছিলেন, বললেন, ‘ও! এই তাহলে মৌয়ের সেই বন্ধু!’

তাঁর বলার ভঙ্গিতে একটা বাঁকা সুর ছিল। তিথির মনে হল উনি ভেবেছিলেন মৌয়ের বন্ধু নিশ্চয়ই সুন্দর দেখতে হবে।

শিবানী তিথির পিঠে হাত রাখলেন, ‘ও তিথি! এঁরা তোর খুড়শ্বশুর খুড়শাশুড়ি। যা মা, পায়ের ধুলো নে। আর ওরা সব তোর ননদ আর দেওর।’

তিথি চশমা ছাড়া সবার অবয়বের আন্দাজই শুধু পাচ্ছে, তার বেশি ভালো করে তেমন বুঝতে পারছে না। শিবানী যাঁর নাম বললেন অনিল, তিথি জানে, ইনিই পার্থর ভালোকাকু। তিথি পার্থদের বাড়িতে চলে আসার পর ইনি একবার সেখানে গিয়েছিলেন। তিথি তখন সুধার সঙ্গে রান্নাঘরে। সীমা ছুটে এসে বলেছিল, 'মা! ভালোকাকু এসেছে, কী হবে?'

সুধা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'বসা গে যা, বল আমি আসছি। আর তিথি তুমি শিগগির রুম্পাদের ঘরে চলে যাও। আমি না ডাকলে নামবে না।'

তিথি তাই করেছিল। ওপরে মাধুবউদির কাছে বসে থাকতে থাকতে তার নিজেকে মনে হচ্ছিল ফেরারি আসামি।

শিবানীর কথা শুনে তিথি অনিশ্চিত পদক্ষেপে এগোল। অনিলের কাছে এসে প্রণামের জন্যে ঝুঁকতেই তিনি একটু সরে গেলেন, 'না না, পরে হবে। স্নান করে বেরিয়ে আর পায়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই।'

তিথি একটু থমকে গিয়েছিল। সোজা হয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে শুনল কোনো একজন কাকিমা তাকে প্রশ্ন করছেন, 'এরকম ঘোমটা দিচ্ছ কেন? আমরাই তো ঘোমটা দিই না!'

তিথি কারও দিকে তাকাল না, মাথা নীচু রেখেই বলল, 'বড়োমা বলেছেন এখানে ঘোমটা দিয়ে থাকতে।...আমি একটু আসি? এসে প্রণাম করব।'

তার হাত ধরে যাচ্ছিল ভিজে কাপড়ের ভারে। শিবানী বললেন, 'আচ্ছা, তাই আয়। একেবারে কাপড়-টাপড় পরে চুলটুল আঁচড়ে সিঁদুর দিয়ে—'

তিথি চলে আসতে আসতে শুনল আরও একটা প্রশ্ন ছুটে আসছে, ‘বড়োমা কে?’ সে দ্রুতপদে ভিজে কাপড়গুলো বারান্দার তারে রেখে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। নিজেকে গুছিয়ে নেবার জন্যে তার একটু সময় দরকার।

তারপর অন্য দুই কাকাও এসে পড়লেন। অরুণ আর অশোক। এঁরা পার্থর ন–কাকু আর রাঙাকাকু। অরুণ অবশ্য একাই এসেছেন, তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছেন। অশোকের স্ত্রীর নাম মল্লিকা। দীপ্তি, সুমিতা আর মল্লিকা গত কয়েক দিনে তিথিকে একটুও একা থাকতে দেননি।

‘তুমি তো বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছ?’

‘পালিয়ে আসিনি। চলে এসেছি।’

সুমিতা তাঁর প্রশ্ন আর তিথির উত্তরের পার্থক্যটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু পরবর্তী প্রশ্নে চলে গেলেন।

‘বড়দিভাই, মানে তোমার শাশুড়ি, তোমায় কিছু দেননি?’

এবার তিথিই প্রশ্নটার মানে বুঝতে পারছিল না। সে সুমিতার দিকে অবাক চোখে তাকাল। দেখল, সুমিতা প্রশ্নটা করে তার সর্বাঙ্গে চোখ বুলাচ্ছেন। তিথি প্রশ্নটা ধরতে পারছে না দেখে মল্লিকা একটু ব্যাখ্যা করে দিলেন, ‘তুমি কানে গলায় হাতে–টাতে কিছুই পরে নেই দেখছি, মানে, সোনা–টোনা কিছু দেয়নি তোমায়?’

তিথি চোখে অন্ধকার দেখল, এ সমস্ত বিচিত্র প্রশ্নের সামনে সে কখনো পড়বে ভাবেনি, এর উত্তরে কী বলতে হয় তাও তার অজানা। সে নিজের দু–হাত দেখল, সেখানে লোহা আর প্লাস্টিকের শাঁখা-পলার সঙ্গে দুটো করে সরু সরু ব্রোঞ্জের চুড়ি।

এগুলো দেশের বাড়িতে আসার আগের রাত্রেই সুধা তাকে পরিয়ে দিয়েছিলেন। তার কানেও এতদিন কিছু ছিল না, মায়ের কাছে থাকার সময় যে সোনার রিং দুটো পরত সেগুলো ওই বাড়িতেই খুলে রাখা ছিল। ক-দিন আগে সীমা তাকে একজোড়া লালপাথরের টপ পরতে দিয়েছে। তার গলা এখনও খালি। কিন্তু এসব নিয়ে সে নিজের মধ্যে তো কোনো প্রশ্নের সামনে পড়েনি? এতগুলো তীক্ষ্ণ কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে আজ তার হঠাৎ মনে হল—সে কি নগ্ন? তার গায়ে কোনো আবরণ নেই! তার খোলা গায়ে দৃষ্টিগুলো যেন তীরের মতো বিঁধছে। তীরের আগায় কী যেন আদিম গুল্মের রস মাখানো...কৌতূহল ব্যঙ্গ অবজ্ঞার ঝাঁঝালো দ্রবণ, প্রাণঘাতী।

তার ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ দেখে দীপ্তি নিজের মুখটা করুণ করলেন, সুমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আহা!' কিন্তু তাঁর চোখে কোনো দুঃখ ছিল না। মল্লিকা সাড়ম্বরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রসঙ্গ চাপা দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন, 'যাকগে যাকগে। কিন্তু তুমি এমন মনমরা হয়ে আছ এটাও তো ঠিক না! নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করেছ, হাসবে গল্প করবে আড্ডা মারবে—' মল্লিকা মুখে হাসি টেনে চোখ নাচালেন, 'তোমার বরটা তো মিষ্টি ছেলে, এবার ওকে একটা চাকরি-বাকরি করতে বলো।'

তিথি মুখ তুলছিল না। দীপ্তি তার চিবুকে হাত দিয়ে টানলেন, 'দেখি দেখি, ওর তো মনখারাপ হবেই, মা বাবার জন্যে প্রাণ কাঁদছে, তাই না?'

তিথি আর সহ্য করতে পারছিল না। সব কিছু যেমন চলছে তেমনই চলুক। এর মধ্যে আবার মা-বাবার কথা মনে করানো কেন? ও তো তার গত জন্মের কথা, সে ওসব কিচ্ছু মনে রাখতে চায় না।

মল্লিকা উদাস উদাস গলায় বললেন, 'তাও বটে! ওর মা-বাবারও এবারের পুজোটা খুব কষ্টে কাটবে।'

ওঃ ঈশ্বর! তিথি এবার ঠিক পাগল হয়ে যাবে। যা সে প্রাণপণে ভুলে থাকতে চায়, এরা সেটা নিয়েই এমন নাড়াচাড়া শুরু করল কেন! সে মা-বাবাকে চায় না। সে পার্থকে চায়। তিথির মাথা ঝুঁকে পড়েছে তার বুকের কাছে, তার চারপাশে সবাই কে কী কথা বলে চলেছে, অনবরত আরও কী প্রশ্ন করে চলেছে সেসব সে যেন আর শুনতেই পাচ্ছে না। প্রবল জ্বরের প্রলাপের মতো সে মনে মনে চিৎকারকরে বলে যাচ্ছে, 'পার্থ পার্থ পার্থ তুমি কোথায় কোথায় কোথায় আমাকে বাঁচাও আমি মরে যাচ্ছি-ই-ই-ই...'

এখানে আসার পর থেকে তিথি একদিনও বাইরে বেরোয়নি। বেরোনোর সুযোগই হয়নি। তার খুব ইচ্ছে ছিল প্রতিমা গড়া দেখবে। পুজোবাড়িতেই প্রতিমা গড়া হচ্ছে। কিন্তু পুজোবাড়িটা এই বাড়ি থেকে বেশ একটু দূরে, মেজোতরফের বাড়ির লাগোয়া। পার্থকে সেখানে দু–বেলাই যাতায়াত করতে হচ্ছে। তিথি পার্থকে একবার বলেছিল তাকে নিয়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু পার্থ বলল, 'আমি তো সোজা পুজোবাড়ি যাচ্ছি না, দোকানবাজার পুরোহিত মশাইয়ের বাড়ি এখানে–সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কোনো দরকারে একবার হয়তো গেলাম, পরক্ষণেই আবার বেরিয়ে গেলাম অন্য কাজে। কী করে এখন তোমায় নিয়ে যাই বলো! তার চেয়ে পরেই যেয়ো।'

তিথির তাও ইচ্ছেটা মরেনি। সে ভাবছিল কথাটা আর কাউকে বলা যায় কি না। সীমাকে হয়তো বলা যেত, কিন্তু তিথি লক্ষ করেছে সীমা তাকে এড়িয়ে চলছে। বিশেষ কথাবার্তাও বলে না তার সঙ্গে। এটা হয়তো রাত্রের ব্যাপারটার জন্যেই। কিংবা এও হতে পারে তার শরীর ভালো নয় বলে বিশেষ কাজকর্ম করতে পারছে না, এদিকে সুধা পুজোর গোছগাছে তিথিরই সাহায্য নিচ্ছেন এতে সীমার দুঃখ হচ্ছে। সে সীমার মনের চলন সবসময় পুরোপুরি বুঝতে পারে না, তার একটু জটিলই লাগে।

কাকুদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিথির মোটামুটি ভাব হয়েছে। অনেকেই তার চেয়ে বেশ ছোটো। দু-তিনজন তার প্রায় সমবয়সি বা একটু বড়ো। এদের মধ্যে সেজোকাকুর মেয়ে বান্টির সঙ্গে একটু বেশি কথাবার্তা হচ্ছে তার। বান্টি তিথির থেকে এক বছরের ছোটো, এ–বছর ইংরেজি অনার্সে ভরতি হয়েছে। একফাঁকে বান্টির সঙ্গে দেখা হতে তিথি বলল, 'বান্টি, তুমি পুজোবাড়ির

রাস্তাটা চেনো?’

‘হ্যাঁ! কেন বউদি?’

‘চলো না, আমরা পুজোবাড়িতে গিয়ে ঠাকুর গড়া দেখে আসি?’

‘মাই গড!’ বান্টি চোখ কপালে তুলল, ‘পুজোর আগে পুজোবাড়িটা বিচ্ছিরি হয়ে থাকে। ফাঁকা, আলো নেই, ভেতরে ঢুকলে ভয় করে। তা ছাড়া রাস্তা চিনি মানে কি আর এমনি এমনি চলে যেতে পারব? বাবা কিংবা কাকু-জেঠুদের সঙ্গে যেতে হবে।’

তিথি আর কিছু বলেনি। কাকু-জেঠুদের আশা করা বৃথা। তাঁদের সঙ্গে তিথির যথেষ্ট দূরত্ব। তা ছাড়া, এখানে এসে অবধি তাঁরা শুধুই নিজেদের মধ্যে গল্প করে, তাস খেলে, খেয়েদেয়ে আর ঘুমিয়ে কাটাচ্ছেন। তিথির খুব অবাক লাগে দেখে। যাঁদের বাড়ির পুজো, তাঁরাই পুজো সম্বন্ধে এত উদাসীন কী করে? পার্থ একাই ছুটে ছুটে খেটে মরছে।

ঠাকুরঘরের সামনে ছোটো উঠোনের একপাশে বসে একরাশ তামা পিতলের পিলসুজ ধূপদানি কোশাকুশি নিয়ে তিথি তেঁতুল দিয়ে ঘষে ঘষে মাজছিল। সুধা এগুলো ঠাকুরঘরের সিন্দুক থেকে বার করে দিয়ে নীচে গেছেন। বাসনের ঘর খুলিয়ে পুজোর বড়ো বড়ো পিতলের থালা বালতি গামলা, কাঠের বারকোশ-টারকোশ বার করতে। তাঁর নিশ্বাস ফেলার ফুরসত নেই। তিথি নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করত না, কিন্তু সত্যিই এ বাড়ির এত লোকের মধ্যে আর কেউই পুজোর কোনো কাজ করছে না। যদিও কাকিমাদের দেখে মনে হচ্ছে তাঁরা নিজেদের স্নানের জলগরম, কাপড় কাচা, নিজের ছেলেমেয়ের জলখাবার নিয়ে সারাদিন দারুণ ব্যস্ত। তাও তাঁরা এত গল্পের সময় কোত্থেকে পাচ্ছেন ওঁরাই জানেন। আর সীমা সারাদিন মনখারাপ করে শুয়ে থেকে কিংবা ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিচ্ছে। তিথি খেয়াল করেছে, সীমার সঙ্গে, এমনকি সুধার সঙ্গেও অন্যান্য কাকিমা বা তাঁদের ছেলেমেয়েদের তেমন মাখামাখি নেই। এসবই নিশ্চয়ই অলকের আর্থিক অবস্থার জন্যে। তিথি এক

ভালোকাকু ছাড়া অন্য কাউকে পার্থদের বাড়িতে তো যেতেও দেখেনি। অরূপ বা মিতাও যে তাদের ওখানে খুব যাতায়াত করেন তা নয়, তবু যেন ওঁদের সঙ্গেই পার্থদের হৃদ্যতা আছে। সেটা হয়তো মিতা কাকিমা মানুষ হিসেবে খুব ভালো, সেই জন্যে। তিথি যেটুকু বুঝেছে, এই সব কাকিমাদের থেকে শিক্ষায়-দীক্ষায় রুচিতে, মনে হয় সচ্ছলতাতেও মিতাকাকিমারা অনেক এগিয়ে। তিথি একটা নিশ্বাস গোপন করল। ওই মিতা কাকিমাই এই দেশের বাড়িতে কোনোদিনও আসতে পারলেন না।

সীমা যে তার সঙ্গে কথা-টথা বলছে না, এ ব্যাপারটা কাকিমাদের চোখ এড়ায়নি। তিথি জানে তাঁরা সীমাকেও তার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করতে ছাড়েননি। এই তো গতকালই সকালে সে ঠাকুরঘরে বসে সলতে পাকাচ্ছিল, তার আগে একরাশ মাটির প্রদীপ ধুয়ে উঠোনে উপুড় করে শুকোতে দিয়ে গেছে। সলতে পাকানো শেষ হয়ে যেতে সে বাইরে এসেছিল প্রদীপগুলো চিত করে রাখতে, যাতে তার ভেতরটাও শুকোয়। সে উবু হয়ে বসে সেটাই করছিল, কানে এল, ‘যাই বল, মেয়েদের এত লম্বা হওয়া ভালো না, মন ছোটো হয়, তাই না সীমা?’

‘এই আস্তে, শুনতে পাবে!’

গলা দুটো সুমিতা আর মল্লিকার। তিথি শুনতে পেয়েও না শোনার ভান করছিল। জটলাটা হচ্ছিল বারান্দার কোণে। একটু পরে সে চোখ তুলে দেখল সেখানে কেউ নেই।

সকালের এই ঘটনার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু তারপর সন্ধ্যেবেলায়ই সুমিতা যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সীমার সঙ্গে তোমার ঝগড়া হয়েছে?’ তিথি ভেতরে ভেতরে জ্বলে উঠেছিল। সে সোজা সুমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘না তো! ঝগড়া কেন হবে?’

‘ও যে তোমার সঙ্গে কথা বলে না দেখি?’

'বড়দির শরীর খারাপ।' তিথি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে আসছিল, সুমিতা বললেন, 'শরীর খারাপ না, আসলে মনখারাপ। বুঝতে পারো না, ওর তো কিছুতেই বিয়েটা হচ্ছে না, তোমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তো?'

তিথির আবার শরীর খারাপ লাগছিল। মাথা ঝাঁ–ঝাঁ করছে, কানের মধ্যে গরম হাওয়া বইছে। তার মনে হল আবার জ্বর আসছে। আসুক। এই জ্বরটাই তার পালানোর, আত্মগোপনের, মুক্তির একমাত্র উপায়। জ্বর এলে মাথার মধ্যে রক্তগুলো ঝিমঝিম করে, কাঁপে, সে কোনো কথা শুনতে পায় না।

পিলসুজের খাঁজে খাঁজে জোরে জোরে তেঁতুল ঘষতে ঘষতে তিথি মন থেকে এইসব কথা তাড়ানোর চেষ্টা করছিল। তার সামনে একটা ছায়া পড়তেই মুখ তুলে দেখল বান্টি দাঁড়িয়ে আছে।

'হাই বউদি!' বান্টি তার সামনে ঝুপ করে বসে পড়ল, 'একটু তেঁতুল দাও তো।'

তিথি ডান হাতের উলটোদিক দিয়ে তেঁতুলের বাটিটা ঠেলে দিল, 'আমার হাত নোংরা। কী করবে তেঁতুল দিয়ে?'

'কী আবার করব? খাব!' বান্টি জিভ বার করল, 'এই দ্যাখো বিট নুন, ঠাম্মার কাছ থেকে ম্যানেজ করেছি। মাকে বোলো না যেন, তেঁতুল খেলে আমার কাশি হয়।'

তিথি উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'তবে খাচ্ছ কেন? তা ছাড়া ওটা থেকে হাত দিয়ে বার বার নিয়ে নিয়ে এইসব মাজছি, ওই নোংরা জিনিসটা মুখে দেবে?'

'ছাড়ো তো! তেঁতুল দেখেই আমি ঠিক করে ফেলেছি খেতেই হবে। উফফ্ কতদিন যে খাইনি। মা এইমাত্র স্নান করতে ঢুকল,

মানে মিনিমাম ফর্টি ফাইভ মিনিটস্! তার আগেই আই মাস্ট ফিনিশ।'

বান্টি এক খাবলা তেঁতুল উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল।

বেশ খানিকক্ষণ পরে, তিথির তখনও মাজাঘষা শেষ হয়নি, ওপাশের উঠোন থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকারশুনে তিথির প্রথমেই মনে হল—এই রে! বান্টি নিশ্চয়ই মায়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে কেউ এমন চিৎকারকরতে পারে বলে তার বিশ্বাস হল না। তা ছাড়া চিত্কারটা ক্রমশ একটা গোলমালে পরিণত হচ্ছিল। মিনিট খানেকের মধ্যেই তিথির মনে হল বাড়িতে একটা প্রলয় চলছে।

চিত্কারটা বান্টির মা দীপ্তিই করছিলেন বটে, তবে তার কারণ বান্টি নয়, অসীম। বাড়িতে লোকজন আসার পর যথারীতি অসীমের উপদ্রব বেড়েছে। তার সঙ্গে নিত্য ঝামেলা লাগছে সবারই। সে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকে। বাড়িতে এতগুলো লোক। বিনা কারণে একটা বাথরুম এতক্ষণ আটকে রাখলে সবারই অসুবিধে। এই নিয়ে সকাল থেকে রাগারাগি চিৎকারচেঁচামেচি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আজকের ঘটনা আরও গুরুতর।

ব্যাপার হচ্ছে এই, অসীম রোজ সকাল থেকে বড়ো বাথরুমটা আটকে রাখে বলে দীপ্তি আজ তক্কে তক্কে ছিলেন। অসীমের তেল মাখা শেষ হতেই তিনি একরাশ জামাকাপড় নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেছিলেন। এতে অসীম খেপে গেছিল। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি। দীপ্তি যথেষ্ট সময় নিয়ে জামাকাপড় কেচে স্নান করে বেরোনো অবধি সে অপেক্ষা করেছে।

দীপ্তি কাচা জিনিসগুলো একটা বালতিতে নিয়ে বাইরে এসেছিলেন। বালতিটা উঠোনে রেখে তিনি সবে তারে একটা জামা মেলেছেন, বালতি থেকে আর একটা তুলতে যাবেন, এমনি সময় হঠাৎ অসীম কোত্থেকে এসে বালতি কেড়ে নিয়ে জামাকাপড়গুলো উঠোনে ছুড়ে ফেলে বলেছে, 'এটা আমার চানের বালতি, তুমি হাত দিয়েছ কেন?' শুধু তাই নয়, দীপ্তির

বক্তব্য অসীম তাঁকেও এত জোরে ধাক্কা দিয়েছে যে তিনি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

তিথি যখন ঘটনাস্থলে এসে দাঁড়াল তখন অবশ্য দীপ্তি নয়, অসীমই মাটিতে পড়ে। চারপাশে ভিজে জামাকাপড়গুলো ছড়ানো, সারা উঠোনও ভিজে। এত জল কোত্থেকে এল, তিথি ভাবল, সেজোকাকিমা কি জামাকাপড়গুলো কেচে ভালো করে নিংড়াননি?

উঠোনে ভিড়, তিথি ভিড়ের ফাঁক দিয়েই দেখল, অমল ঝাঁপিয়ে পড়লেন অসীমের ওপর, তাঁর উদ্যত হাতে একপাটি চটি। অসীম একটা জান্তব চিৎকারকরে মার বাঁচাতে দু–হাতের মধ্যে মুখ আর মাথা লুকাল।

তিথি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিল। মারের শব্দ শোনা যাচ্ছে। অমলের গর্জনও। পাগলটাকে তিনি আজ মেরেই ফেলবেন। তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত তোলে, এত দুঃসাহস! দীপ্তিও সমানে পাগলের চোদ্দোগুষ্টি উদ্ধার করে যাচ্ছেন পরিত্রাহি চিৎকারকরে। কিন্তু আশ্চর্য, অত মার খেয়েও অসীম আর একটাও শব্দ করছে না, একটা কাতরোক্তিও আর বেরোচ্ছে না তার মুখ দিয়ে।

শিবানী পাগলের মতো ছুটে এলেন। তাঁর চিৎকারআর কান্না কানে যেতেই চোখ খুলল তিথি। শিবানী আসীমের ওপর লুটিয়ে পড়েছেন। তাঁর শরীর থেকে এখন শাড়িটা প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন। শুধু কোমরের গিঁটটা কোনোক্রমে লেগে আছে। শায়া আর ব্লাউজপরা অবস্থায় তিনি নিজের অক্ষম শরীর দিয়ে অসীমকে আপ্রাণ আড়াল করতে চাইছিলেন। আরও অন্যরাও তখন অমলকে নিরস্ত করার চেষ্টা করছেন। তিথির মনে হল অসীম নয়, মারতে মারতে অমলই যেন উন্মাদ হয়ে উঠেছেন। তাঁকে থামানো যাচ্ছে না। অসীমকে বাঁচাতে গিয়ে শিবানীও মার খাচ্ছেন। তিথি অস্থির হয়ে উঠছিল। বাড়ির এতগুলো লোক কেউ কিচ্ছু করতে পারছে না! শেষে কি একটা বীভত্স কাণ্ডই ঘটবে নাকি এখানে?

শিবানী বুকফাটা চিৎকারকরে কাঁদছিলেন, ‘আমায় মার, আমায় মার, ও অমল আমায় মার! ওকে আর মারিসনি, মরে

যাবে—পাগল ছাগলের ওপর এত রাগ করে না, ও বউমা আমায় মেরে ফ্যালো—ওগো, এ কী সব্বোনাশ হল গো—'

তিথির চোখ ফেটে জল আসছিল। তার মনে হল ছুটে গিয়ে শিবানীকে জড়িয়ে ধরে। তার আগেই দেখতে পেল, শিবানী হামাগুড়ি দিয়ে অমলের পা জড়িয়ে ধরলেন।

তিথি কয়েক মুহূর্ত নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। তারপর ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এল সে। দেখা ছাড়া তার আর কিছু করার নেই। সবাইই তাই দেখছে। কিন্তু তার পক্ষে আর দেখাও সম্ভব নয়। তিথির আবার মনে হল, এখানে যা ঘটছে সবই খুব অলীক। সে আসলে এখানে কোথাও নেই সত্যি সত্যি। সে যেন একটা দুর্বোধ্য জটিল স্বপ্নের মধ্যে ভাসছে।

তিথি সরে এল বটে, কিন্তু তার চোখের সামনে থেকে দৃশ্যটা মুছল না। শিবানী তাঁর সেজোছেলের পায়ে পড়ছেন, তিথির মনে হল—এই দৃশ্য সে কোনোদিনই ভুলতে পারবে না। হয়তো পরে তার মনে হবে এরকম কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেনি কখনো, পুরোটাই তার উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা।

আসলে, তিথি ভাবছিল, এটা তার কাছে যত অসম্ভব বলেই মনে হোক না কেন, শিবানীর এ ছাড়া আর কিছু করার নেই। সে নিজে শিবানীর মতো পরিস্থিতিতে পড়লে, যা একইসঙ্গে ভয়াবহ আর করুণ, হয়তো এরকমই করতে বাধ্য হত।

এখানে আসার পর থেকেই সে দেখেছে, শিবানী প্রতি মুহূর্তে অসীমের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে আছেন। তাকে নিয়ে গোলমাল বাধলে তিনি একবার অসীমকে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে শান্ত করছেন, আবার পা ঘষে ঘষে অন্য ছেলে বউদের কাছে গিয়ে হাত ধরে মিনতি করছেন। পুজোর সময়টাই তাঁর সবচাইতে ভয় আর অশান্তির সময়, কিংবা তাও হয়তো নয়, এই পুজোর সময়টাই তাঁর হয়তো সবচাইতে সুখের সময়। এ সময় তাঁর ঘর ছেলেপুলেতে ভরে ওঠে, তারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি

করে, তিনি ওদের শান্ত করেন, সামলান।

তাঁর সাত ছেলে, কোনো মেয়ে নেই। ছেলেরা বড়ো হয়ে তাঁর থেকে এত দূরে সরে গেছে যে শিবানী তাদের নাগাল পান না। শুধু ছোটো ছেলেটিই রয়ে গেছে তাঁর স্নেহের গণ্ডির মধ্যে। এমনকি তার যেন আর বয়স বাড়েনি। আজও সে একটা বাচ্চারই মতো মায়ের ওপর অসহায়ভাবে নির্ভরশীল। পক্ষীমাতার মতো শিবানী তাকে ডানার তলায় ঢেকে রেখে যাবতীয় ঝড়ঝাপটা থেকে রক্ষা করেন। তিথির হঠাৎ মনে হল, আচ্ছা শিবানীর কি একটা ছেলে পাগল হয়ে ভালোই হয়েছে? তাঁরও কি তাই মনে হয়? অসীমের পাগলামি বাড়লে শিবানী তাকে কোলের ছেলের মতো স্নান করিয়ে মাথা আঁচড়ে দেন, জামাকাপড় পরিয়ে দেন, খাইয়ে মুখ ধুইয়ে দেন। এই উন্মাদ যুবকটিই হয়তো তাঁর আহত পরিত্যক্ত মাতৃহৃদয়ের একমাত্র চরিতার্থতা। তাঁর অন্য অন্য ছেলেরা, যারা বড়ো বেশি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে জ্ঞানে বুদ্ধিতে যাবতীয় উচ্চতায় তাঁর স্নেহের নাগাল ছাড়িয়ে গেছে, অসীমকে বাঁচাতে গিয়ে তাদের পায়ে পড়া শিবানীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। বরং শিবানীর পক্ষেই সম্ভব।

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা যে কীভাবে মিটবে তিথি বুঝতে পারছিল না। সে ছোটো উঠোন পেরিয়ে চলে এসে একেবারে বারান্দার উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে ছিল। ঘটনাস্থল থেকে যতটা সম্ভব দূরে। শিবানীর কান্না আর গোলমাল ছাপিয়ে একবার যেন মনে হল অঘোরের গলা পাওয়া যাচ্ছে। তিথি জায়গাটায় যতক্ষণ ছিল অঘোর ঘর থেকে বেরোননি। তিনি সাধারণত এসব অশান্তিতে মাথা গলান না। আজ তাঁর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছে।

তিথি বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বিশেষ কিছু দেখবার নেই। যতদূর চোখ যায় ঘেঁষাঘেঁষি পুরোনো পুরোনো বাড়ি, তাদের উঁচু–নীচু ছাদ। গাছপালাও তেমন চোখে পড়ে না। দক্ষিণ দিকে একটা টানটান পিচের রাস্তা লম্বালম্বি পুব-পশ্চিমে বিছিয়ে আছে। ওই রাস্তাটা নাকি সোজা গঙ্গার ধারে গিয়েছে। তিথির খুব ইচ্ছে করে ওই পথটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে গঙ্গা দেখে আসতে। কিন্তু সে কী করে যাবে। আজ অবধি পুজোবাড়িতেই যাওয়া হল না তার। ভোররাতে যখন ঘুম ভাঙে শরীরটা ভীষণ

অবসন্ন লাগে, বোধ হয় রাত্রে জ্বর আসার জন্যেই। সে চুপচাপ বালিশে মাথা রেখে চোখ বুজে পড়ে থাকে। তখন শুনতে পায় কারা ওই রাস্তা ধরে খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে চলেছে, ‘রাই জাগো রাই জাগো বলে শুকশারি গাহে রে...’ ওরা বোধ হয় অত ভোরে গঙ্গাস্নানে যায়। গভীর ভালো লাগা আর দুঃখবোধ মিশিয়ে তার মনটা আবার দুমড়ে যেতে থাকে, তিথি দু-হাতে সেই মনটাকে ধরে কোঁচকানো কাগজের মতো চেপে চেপে টেনে সমান করে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়। মনে খুব টান পড়লে উদাস হয়ে যেতে পারাটাই কাজের কাজ, তিথি এ বাড়িতে এসে বেশ বুঝতে পারছে।

এখনও তার মনটা একটা সাদা কাগজের মতোই হাওয়ায় ভাসছিল। হঠাৎ সে চোখে সত্যি সত্যি অন্ধকার দেখল। কে যেন পেছন থেকে তার চোখ চেপে ধরেছে।

হাঁকপাক করে উঠতেই পেছনে হাসির শব্দ শুনতে পেল তিথি। —পার্থ!

তিথি আনন্দ বিস্ময়ে পার্থকে প্রায় জড়িয়েই ধরতে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে নিল। দমবন্ধ হওয়া গলায় বলল, ‘তুমি!’

‘উরিব্বাস, বাড়িতে কী ভয়ংকর অবস্থা গো। ছোটকাকে নিয়ে নিশ্চয়ই? কার সঙ্গে লাগল?’

তিথি এ কথার কোনো উত্তর দিল না। বলল, ‘তুমি কোত্থেকে এলে?’

‘আর বোলো না। আমি সত্যি একা হাতে আর পারছি না। মনে হয় তোমাকেই হেল্প করতে হবে।’

‘সত্যি!’ তিথি নেচে উঠল।

‘ওইজন্যেই তো এলাম।’ পার্থ মাথা নাড়ল, ‘পুজোর কাপড় এসে গেছে। এ বাড়ির নিয়ম হল নতুন কাপড়ও গঙ্গায় কেচে

শুকিয়ে তবে মাকে দেওয়া হয়। তুমি চলো আমার সঙ্গে।'

'গঙ্গায়?' তিথি বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে এই মুহূর্তে যেতে রাজি কিন্তু উঠোনের পাশে তেঁতুলমাখা কোশাকুশি পিলসুজ পড়ে রয়েছে, ওগুলো ধোয়া হয়নি। পার্থকে সে–কথা বলতেই সে বলল, 'আরে ওসব এসে কোরো। চলো এখন তাড়াতাড়ি। পেছনের সিঁড়ি দিয়ে চলো, ওদিকে সিঁড়ির মুখে বহুত ভিড়।'

পেছনের সিঁড়ি দিয়ে শাড়ির কুঁচি তুলে ধরে তিথি লাফিয়ে লাফিয়ে নামছিল। অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তির আনন্দে, উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে রক্ত লাফাচ্ছে। সে যেন বন্দিনী রাজকুমারী, রাক্ষসের পুরী থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে পার্থ, তার রাজকুমার। তারা যেন গোপনে পালিয়ে যাচ্ছে দুজনে, সবার চোখে ধুলো দিয়ে। আহ্ কী রোমাঞ্চকর!

নীচে একটা হুডতোলা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশার পাদানিতে কাপড়ের বিরাট গাঁঠরি। পা রাখবার জায়গা নেই। তিথি কোনোরকমে উঠে বসতেই পার্থ তার পাশে উঠে বসে রিকশাওয়ালাকে বলল, 'চলো।'

তিথির মনে হল রিকশাটা যেন উড়ে চলেছে নদীর দিকে।

৭

এবারের পুজো পড়েছে খুব সকালে। সুধা চিন্তা করছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতায় এত আগে পুজো কখনো পড়েনি। ষষ্ঠীর দিনটাতে তাও একটু সময় পাওয়া যাবে। ওইদিন পুজো সাতটা নাগাদ। তার পরের দিনগুলোতে পুজোর সময় ক্রমশ এগোচ্ছে। অত ভোরে উঠে সব কাজ গুছিয়ে পুজোর আয়োজন সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে। সব ঠিকঠাক সময়ের মধ্যে করতে পারবেন কি না এই নিয়ে সুধা খুব উদ্বেগে ছিলেন।

তিথির ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। পুজো এত ভোরে বলে ঠিক হয়েছে পুজোর ক-টা দিন রাত্রে পুজোবাড়িতেই থেকে যাওয়া হবে। থাকবে শুধু সে, পার্থ আর সুধা। আর কেউ নয়। সীমার জন্যে অবশ্য তিথির কষ্ট হচ্ছিল খুব। বেচারি তাদের সঙ্গে থাকতে পারবে না, তার পিরিয়ড শুরু হয়ে গেছে। অন্তত সপ্তমী অষ্টমীর আগে তার নিষ্কৃতি নেই। সীমা কান্নাকাটিও করেছে। পুজোর জায়গায় উঠতে পারবে না, এমনকি অঞ্জলিও দিতে পারবে না। তিথির খুব আপশোস হচ্ছিল। তাদের বাড়িতে মাকে সে এতকিছু মানতে দেখেনি। অদিতি পিরিয়ড হলেও ঠাকুরের জল দিয়েছেন, সন্ধ্যে দিয়েছেন। তিথিকেও কখনো কিছু ছুঁতে বারণ করেননি। তিনি বলতেন, মন আর শরীর পরিষ্কার রেখে সবসময়ই ঠাকুরের কাজ করা যায়। পিরিয়ড হওয়াটা মেয়েদের একটা স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় ঘটনা, ঈশ্বরেরই তৈরি করা নিয়ম, কাজেই ওই সময় নিজেকে অচ্ছুত মনে করার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এইসব কথা পার্থদের বাড়িতেই কেউ মানে না। আর এটা তো দেশের বাড়ি।

পুজোবাড়িতে তিথি প্রথম এল পঞ্চমীর সকালে। তখন প্রতিমা গড়ার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, সাজপোশাকও সারা। কেবল হাতে অস্ত্র দেওয়া বাকি। তিথি মুগ্ধ হয়ে প্রতিমা দেখছিল।

একচালার ঠাকুর। দুর্গাঠাকুরের গায়ের রং কাঁচা হলুদ, ঠিক অতসী ফুলের মতো। তাঁর ঠোঁটে হাসি নেই, কিন্তু সারা মুখ যেন

এক অপূর্ব হাসির ছটায় মাখামাখি। মা দুর্গা আর তাঁর ছেলেমেয়েদের সবার সাজ ঝলমলে, এমনকি সিংহের মাথাতেও একটা ছোট্ট মুকুট পরানো।

পার্থ তিথির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে হঠাৎ তিথির হাত ধরল, 'তিথি, ইনিই আমার সেই মা যিনি তোমাকে আমার হাতে দিয়েছেন', তার গলার স্বর ভারী হয়ে এল, 'মাকে বলো, তিথি—পৃথিবীর কোনো শক্তি যেন আমাদের আলাদা না করতে পারে।'

মা দুর্গার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তিথির একটা অদ্ভুত অনুভূতি হচ্ছিল। নিজেকে খুব শান্ত লাগছিল হঠাৎ। এ সময়ে পার্থর ওই কথাগুলো তার কাছে খুব অর্থহীন শোনাল। সে ঠাকুরের কাছে খামোখা আলাদা হওয়ার কথা তুলতে যাবে কেন। সে তো চলেই এসেছে পার্থর কাছে। তিথি গভীর মনঃসংযোগের সঙ্গে দু-হাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এভাবে প্রণাম করতেই তার খুব আরাম হচ্ছে, কিছু চাইতে ইচ্ছে করছে না।

এই পুজোবাড়িটা অত্যন্ত প্রাচীন। মল্লিকদের কোনো সুদূর পূর্বপুরুষের আমলের। নিয়মিত পুজো হচ্ছে বলে সংস্কার করা হয়, কিন্তু তাতে তার গা থেকে প্রাচীনতার গাম্ভীর্যটুকু মুছে যায়নি। পুরো বাড়িটাই একটা বিরাট হলঘরের মতো মণ্ডপ। বাইরের দরজাটা বেশ চওড়া, তার দু-দিকে থাম আর বাঁধানো বসার আসন, দরজা দিয়ে ঢুকে ঘরের অপরপ্রান্তে একটা মঞ্চের মতো উঁচু জায়গা। এটাই পুজোর বেদি। বেদিতে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। বেদি থেকে পাঁচ-ছ ধাপ সিঁড়ি নেমে এসে একটা চাতাল, চাতাল থেকে আবার সিঁড়ি নেমে এসেছে ঘরের প্রশস্ত মেঝেতে। এই মেঝেতেই পুজোর সময় সাধারণ লোকে পুজো দেখতে ভিড় করে। মেঝের দু-পাশে উঁচু টানা রোয়াক দু-দিক থেকে পুজোবেদির সামনে চাতালে গিয়ে মিলেছে। চাতালের দু-পাশে দুটি ছোটো ছোটো ঘর। এই ঘর দুটির ওপরেও একটি করে ঘর রয়েছে যার সিঁড়ি নেমে এসেছে দু-পাশের রোয়াকে। পুজোবেদি, চাতাল আর রোয়াক থেকে বড়ো বড়ো থাম উঠে গেছে ঘরের সিলিং-এ। তিথি মাথা পেছনে হেলিয়ে মুখ উঁচু করে দেখল বিশাল উঁচু সিলিং-এর মাঝখানে একটা ঝাড়লণ্ঠনের কঙ্কাল ঝুলছে। তাতে একটাও বাতিদান নেই। সারা ঘরে একটা আবছা অন্ধকার

ভাসছে, থোকা থোকা অন্ধকার জমে আছে ঘরের কোণগুলোতে, থামের পেছনদিকে। কিন্তু ছাদের কাছাকাছি কোথা থেকে যেন মৃদু আলো আসছে ঘরে। তিথি ভালো করে লক্ষ করে দেখল, দু-দিকের দেওয়ালের একদম ওপরে সারি সারি ছোটো ছোটো জানলা। জানলাগুলো রঙিন কাচের, যার অধিকাংশই ভাঙা। ওই জানলাগুলো দিয়েই বাইরের রোদ আসছে, রঙিন কাচের আভা মিশে সেই রোদটুকু বড়ো মায়াময়। তিথি চমত্‌কৃত হয়ে গেল। সমস্ত ঘরে একটা অদ্ভুত ভিজে ভিজে গন্ধ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এই বাড়িটা যাঁর, তিনি পার্থর মেজোঠাকুমা। মেজোঠাকুরদা অনেকদিন হল মারা গেছেন। সুধা আর পার্থর সঙ্গে তিথি পঞ্চমীর সকালেই মেজোঠাকুমার বাড়ি গিয়েছিল। মেজোঠাকুমার বাড়ি যাওয়ার পথটাও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

পুজোবাড়ির একদিকের রোয়াক আর চাতালের সংযোগস্থলে একটা ঘরের বাইরে যাওয়ার দরজা আছে, তিথি আগে খেয়াল করেনি। এই দরজা দিয়ে বেরিয়েই একট গলি। গলিটা রাস্তার গলি নয়, বাড়ির ভেতরেরই গলি। দু-দিকে উঁচু দেওয়াল। তিথি খালি পায়ে হাঁটছিল বলে গলির বাঁধানো মেঝেটা পায়ে খুব ঠান্ডা লাগছিল। হাঁটতে হাঁটতে কতকিছু পেরোল সে। বাঁ-দিকে একটা গোয়ালঘর, সেখানে একটা বাছুর বাঁধা। গোবর আর খড়ের একটা ঘন গন্ধ জমে আছে সেখানে। দেশের বাড়িতে এসে তিথির গন্ধের বোধ খুব প্রখর হয়ে উঠেছে। তার মনে হল এই গোয়ালের গন্ধটা খুব শান্ত, আর আন্তরিক। আরও খানিকটা যেতে একটা বড়ো কুয়ো। এসবই কিন্তু বাড়ির মধ্যে। এ ছাড়াও আরও কত রোয়াক, কত সিঁড়ি, কত উঠোন পেরিয়ে, এ বারান্দা সে বারান্দা দিয়ে, দু-দুটো খিল লাগানো দরজা খুলে, একটা খোলা বাগান পেরিয়ে তিথি যখন মেজোঠাকুমাদের বাড়ি এসে পৌঁছোল, তখন তার ঘোর লেগে গিয়েছে। এই পুরো পথটাই অসম্ভব নির্জন, এখানে কেউ থাকে বলে বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিক, সে শুনল এই বিরাট বাড়িতে জনপ্রাণী বলতে শুধু মেজোঠাকুমা আর তাঁর অবিবাহিত ছেলে বিলাস। তাও বিলাসও পুজোর সময় ছাড়া বাইরে বাইরেই থাকেন। মেজোঠাকুমা একপাশে তিন-চারটে ঘর নিয়ে আছেন, বাকি পুরো বাড়িটাই ফাঁকা। উনি নাকি রোজ সন্ধ্যেবেলা এই পথেই পুজোবাড়িতে সন্ধ্যে দিতে আসেন।

পার্থ ফিসফিস করল, ‘মেজোঠাকুমা কিন্তু খুব রাগি। কটকট করে কথা বলেন, ওঁর জ্ঞানদা নামটা সার্থক।’

সুধা চাপা গলায় ধমকে উঠল, ‘চুপ কর। কথা আবার কী? আমাদের সঙ্গে বছরে একবার দেখা, ওঁর আবার বলার কী আছে!’

পার্থ আবার ফিসফিস করল, ‘ভয় করছে, তিথি? মেজোঠাকুমা তাড়া করলে একা এই পথে পালাতে পারবে তো?’ সে খিকখিক করে হাসছিল।

তিথি শিউরে উঠল। মেজোঠাকুমার তাড়ার ভয়ে নয়। এই পথে একা যাওয়ার কথা ভেবে। এ তো জাদুকরের প্রাসাদ, রহস্যময় গোলকধাঁধা! এই পথ চিনে যাওয়া তার কর্ম নয়। সে কলকাতার বড়ো রাস্তাতেও একদিন হেঁটে পরের দিন আবার গুলিয়ে ফেলে।

মেজোঠাকুমা জ্ঞানদা তিথিকে মোটেও তাড়া লাগালেন না, তার সঙ্গে দু-একটা ছাড়া কোনো কথাই বললেন না। শুধু জিজ্ঞেস করলেন, ‘বাড়ি ছেড়ে চলে এলে, পড়াশোনাটা শেষ করতে পারবে তো!’

তিথি বলল, ‘এবার পার্ট ওয়ান দিতে পরিনি। সামনের বার নিশ্চয়ই দেব।’

মেজোঠাকুমা খুব নিরাসক্ত গলাতে বললেন, ‘সেটা বেশ কঠিন। যাই হোক, পড়াশুনা ছেড়ো না।’

ব্যাস ওইটুকুই। তিনি তিথির সঙ্গে আর কোনো কথা বলেননি। এমনিতেও কথা বলছিলেন খুব কম। তিথি দেখল, এই বৃদ্ধা অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময়ী, আর তাঁর কোনো কৌতূহল নেই।

মেজোঠাকুমার ছেলে বিলাসের সঙ্গেও তিথির আলাপ হয় সেখানে। ইনিই সেই বিলুকাকা, যাঁর সঙ্গে কয়েক বছর আগে পার্থর

ঝামেলা হয়েছিল। বিলুকাকা খুব আলগা আলগাভাবে সবার সঙ্গে দু-একটা কথা বললেন, মনে হল ঝামেলার ব্যাপারটা তিনি সেভাবে মনে রাখেননি। তাঁর গলার স্বর খুব গম্ভীর। তিথি শুনল বিলুকাকা নাকি খুব ঘুরে বেড়ান, পাহাড়ে চড়েন। শুধু এই পুজোর সময়টুকু তিনি বাড়িতে থাকেন। তিথির খুব কৌতূহল হচ্ছিল জানতে তিনি কোথায় কোথায় গেছেন, কোন কোন পাহাড়ে চড়েছেন। কিন্তু সে বিষয়ে আর কোনো কথা হল না। তিথি আবার একঝলক মুখ তুলে দেখল বিলুকাকা বেশ লম্বা। বয়স হয়তো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ, কিন্তু পেটানো চেহারা। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, তাঁর হাতে একটা বই। বইটা পড়তে পড়তে উঠে এসেছেন বলে পাতার ফাঁকা আঙুল ঢোকানো। তিথির মনে হল মল্লিকবাড়ির মধ্যে এই লোকটি খুব আলাদা।

পুজোর আগে থাকতেই কাজের কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু পুজো শুরু হতেই আর যেন দিশা পাওয়া যাচ্ছে না। তিথির অবশ্য ভীষণ ভালো লাগছে এই তলকূলহীন খাটুনি। সে চেয়ে চেয়ে কাজ নিচ্ছে, পাগলের মতো খাটছে। কিছু কিছু নেশার জিনিস আছে যা শরীরে ঢুকলে মানুষের কর্মক্ষমতা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। তিথির যেন সেরকমই কোনো নেশা হয়েছে। তার কোনো ক্লান্তিবোধ হচ্ছে না। বিশ্রামের কথা ভাবতে তার ভয় করছে। নিশ্ছিদ্র কর্মব্যস্ততা একটা বর্মের মতো, মন আর মস্তিষ্ককে চাপা দিয়ে রাখে।

পুজোবাড়িতে আলোর ব্যবস্থা হয়েছে। ঢাকিরাও এসে গেছে। কাল রাত পোহালেই পুজো। সব কাজ গোছাতে গোছাতে এগারোটা বাজল। সুধা বাজার থেকে কিনে আনা ফুলগুলো বেছে ধুয়ে তার ওপর একটা ভিজে কাপড় চাপা দিয়ে রাখলেন। কাল ভোর অবধি ফুলগুলো তাজা থাকবে। পার্থ রোয়াকের একপাশে আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে। এখন এখানে বেশ ঠান্ডাই পড়ে গেছে। তিথি একটু আগে সুধার সঙ্গেই ছিল। এইমাত্র সে পুজোবেদিতে আলপনা দিতে শুরু করেছে।

সুধা ডাকলেন, ‘তিথি! আর না। এবার শুয়ে পড়ো। কাল অনেক ভোরে উঠতে হবে।’

তিথি মুখ তুলল, 'তুমি শুয়ে পড়ো বড়মা। আমি একটু পরে শোব।'

সুধা একটু বিরক্ত হলেন, 'আর কত দেরি করবে? আর আলপনা দিতে হবে না। ঠাকুরের সামনেটাতে তো দেওয়া হয়ে গেছে, আবার কী?'

তিথি আলপনা দিয়ে যাচ্ছিল। এবার মুখ না তুলেই বলল, 'এই, জাস্ট আর একটু বড়োমা। এক্ষুনি হয়ে যাবে।'

সুধা শুয়ে পড়লেন। অদ্ভুত নিশুতি একটা রাত। তিথির ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। তার ইচ্ছে করছে আজ সারারাত্রি ধরে আলপনা দিয়ে সে এই সমস্ত দালানটাকে ভরিয়ে দেবে।

তিথির ক্রমশ মনে হতে লাগল সে যেন একটা নিস্তব্ধ সমুদ্রের তলায় বসে আসে। নিস্তব্ধ, কিন্তু সেই নিস্তব্ধতারও একটা কেমন নিজস্ব ধ্বনি রয়েছে। মনে হচ্ছে নৈঃশব্দ্য যেন ঝম ঝম করে বাজছে তার চারদিকে। কিংবা, ঝম ঝম শব্দটা তার মাথার মধ্যেই হচ্ছে কি? তিথি ঠাহর করার চেষ্টা করল। তার আবার জ্বর এসেছে। জ্বরটা রোজই আসছে তার। অন্য সময় হলে এইরকম একটানা জ্বরে সে নিশ্চয়ই দুর্বল হয়ে পড়ত, বিছানা ছেড়েই উঠতে পারত না। কিন্তু এখন ওই জ্বরটাই তার নেশার বস্তু, যা তাকে পাগলের মতো খাটার শক্তি জোগাচ্ছে। যে-কোনো কাজে তার মনঃসংযোগ বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তিথি দেখেছে, তার নিশ্বাস যত ঝাঁঝালো গরম হয়ে ওঠে, তার একাগ্রতাও তত বাড়ে।

সুধা পাশ ফিরতে ফিরতে ঘুমন্ত গলায় আর একবার ডাকলেন, 'তিথি—এখনও শুলে না!'

তিথি চমকে উঠল, 'হ্যাঁ, এই আসছি বড়োমা। তুমি ঘুমোওনি?'

সুধার আর কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তিথি সতর্কভাবে তাঁর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার গোলার বাটিতে ন্যাকড়া ডোবাল। তার বুকের মধ্যে রক্ত ছমছম করছে। কী অদ্ভুত একা লাগছে। কিন্তু কী রোমাঞ্চকর এই একা লাগা। কী অদ্ভুত এই পঞ্চমীর রাত, কী অদ্ভুত এই জীবন! ওই যে দুজন ঘুমন্ত মানুষ শুয়ে রয়েছে ওরা কারা? মানুষকে আলো-জ্বলা ঘরে ঘুমন্ত দেখলে কেমন অচেনা লাগে! যে মেয়েটি আলপনা দিচ্ছে সে কে? কোথায় আলপনা দিচ্ছে সে? এ তার কোন জন্মের পুজো আসছে কাল?

তিথি যেন চেতনা হারিয়ে ফেলছিল আস্তে আস্তে। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত অবস্থাতেই আশ্চর্য দ্রুততায় নিপুণ ভঙ্গিমায় সে আলপনা দিয়ে চলছিল পুজোর প্রাঙ্গণে, প্রাঙ্গণ থেকে সিঁড়িতে, সিঁড়ি থেকে ঘরের মেঝেতে...

কাল রাত পোহালেই পুজো। তার আগেই তিথি তার শরীর মন নিংড়ে নিংড়ে যা কিছু সব নিঃশেষে ঢেলে দিতে চায়...

ঘুমোবে না মনে করেও শেষপর্যন্ত শুয়েই পড়েছিলে তিথি। যদিও ঘুম নয়, একটা তন্দ্রার ঘোরের মধ্যেই চোখ বুজে পড়ে ছিল খানিকটা সময়। একটা ঝটকা লেগে তন্দ্রাটা যখন ছুটে গেল তার, সে চোখ খুলে চশমাটা পরেই দেখল সুধা আর পার্থ তখনও আপাদমস্তক গভীর ঘুমে। কিন্তু তিথির মনে হল ভোর হতে আর বেশি দেরি নেই। পার্থর ঘড়ি পরা অভ্যাস নেই। বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তিথি নিজের হাতঘড়িটা ভুলে পরে আসেনি। কাল রাত্রে পার্থ অলকের হাতঘড়িটা নিয়ে এসেছিল। সেইটাই এখন তার কবজিতে বাঁধা। সে চিত হয়ে বাঁ-হাতটা কপালের ওপর রেখে ঘুমোচ্ছে। তিথি হাতটা তুলে দেখল ঘড়িতে সাড়ে চারটে বাজে। পার্থ বলেছিল পাঁচটায় উঠলেই যথেষ্ট।

একটু ইতস্তত করে তিথি উঠল। সকালে পরার জন্যে তিন জনেরই জামাকাপড় নিয়ে আসা হয়েছে। তিথি শাড়ি শায়া ব্লাউজ তুলে নিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে পা বাড়াল। মেজোঠাকুমার বাড়ি যাওয়ার পথেই একটা বাথরুম আছে। সুধা কাল দেখিয়ে দিয়েছিলেন, আপাতত যে ক-দিন তারা এখানে থাকছে, ওই বাথরুমেই স্নান-টান সবই সারতে হবে।

বাইরে পা দিতেই তিথির শীত করে উঠল। শেষরাত্রের হিমে গলিটা ভিজে রয়েছে। ভোর এখনও হয়নি, কিন্তু রাত্রির জমাট অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। তিথি একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধকারটাকে চোখে সইয়ে নিল। তারপর আস্তে আস্তে এগোতে শুরু করল। তার বাথরুমে যাওয়া প্রয়োজন।

তিথি নিশ্চিত ছিল না এই পথটা সে চিনে চিনে যেতে পারবে কি না। কিন্তু আবছা অন্ধকারেও সে যেন অনেকটা গন্ধ অনুসরণ করেই এগোচ্ছে। গোয়ালঘরের কাছে আসতেই সেই শান্ত গন্ধটা তার নাকে মৃদু ঝাপটা মারল। বাছুরটাও জেগে গেছে, তিথিকে দেখে কিংবা তার পায়ের শব্দ শুনে গভীর স্বরে একবার ডাকল। তারপরে সেই কুয়োটা। তারপর একটা টানা রোয়াক, তারপর একটা দরজা। দরজাটার কাছে এসে দু-এক মুহূর্ত দ্বিধা করল তিথি। এইটাই সেই দরজা তো, নাকি এটা অন্য কোনো দরজা? ভয়ে ভয়ে খিল খুলল সে। না, একেবারে ঠিক আছে। দরজাটার ওপাশেই সেই চাতাল, চাতালের একপাশে বাথরুম, অন্যপাশে বাগানে যাওয়ার দরজা।

তিথি বাথরুমে ঢুকে দেখল অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শাড়ি-জামাগুলো আর চশমাটাও চাতালে রেখে এসে তিথি বাথরুমের দেওয়াল হাতড়াল। অন্ধকারে চশমা পরা আর না পরা সমান। কাল সুধার সঙ্গে এসেছিল বলে কলটা কোথায় সে মোটামুটি জানে। হাতে ঠেকতেই কলটা খুলে দিল সে। জলটা যেন ছোবল মারল, এত ঠান্ডা।

ওই হিমঠান্ডা জলেই স্নান সেরে নিল তিথি। এর আগে এত ঠান্ডা জলে সে স্নান করেনি কখনো। প্রথম জমে যাওয়া ভাবটা কেটে যেতেই তিথি দেখল তার বেশ আরামই লাগছে।

স্নান শেষ করতেই কিন্তু হাড়ে কাঁপুনি ধরল তার। হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে ছাড়া শাড়িটাই ধুয়ে ভালো করে নিংড়ে গা-মাথা মুছে নিল সে। তারপর ওইটাই জড়িয়ে বাইরে এসে চাতালের এককোণে দাঁড়িয়ে শুকনো শাড়িটা পরে নিল। এখন নিজেকে খুব পবিত্র লাগছে তার। আজ পুজো, আজ প্রথম পুজোর সকাল। সে সবার আগে স্নান করেছে আজ সকালে। তিথি বুক ভরে

নিশ্বাস টানল। ফুল ধূপ চন্দন আর কী কী সবের মিশ্রিত গন্ধ যেন ভেসে বেড়াচ্ছে তার চারপাশে। এই ঘুমিয়ে থাকা বিরাট বাড়িটার আনাচকানাচ থেকে একটু একটু করে উঠে আসছে গন্ধটা। এত ক্ষীণ সেই গন্ধ, যেন তার এখনও ভালো করে ঘুম ভাঙেনি। এটা কীসের গন্ধ! তিথি আবার বুক ভরে নিশ্বাস টানল। এ কি পুজোর গন্ধ?

তিথি বাগানের দরজাটা খুলে ফেলল। বাগানটা ঝুপসি হয়ে আছে। গাছগাছালির নীচে সাদা কুয়াশা। একটু একটু করে অন্ধকারে গুলে যেতে শুরু করেছে আলো। তিথি বাগানের মধ্যে এসে দাঁড়াতেই আবার তার নাকে সেই পুজোর গন্ধ ভেসে এল। হঠাৎ একটা অলৌকিক অনুভূতি ঘিরে ধরল তাকে। সে দেখল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার চারপাশে রাশি রাশি শিউলি ঝরে মাটি সাদা হয়ে আছে। তিথির গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। মুখ তুলে তাকাতেই দেখল সে একটা বিরাট শিউলি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে। আর তার সারা মাথায়, মুখে আর কাঁধে ফুল ঝরছে টুপ টুপ করে।

৮

পার্থর বউ নিয়ে অঘোর বিশেষ মাথা ঘামাতে চাননি। ঘামিয়ে কী হবে? নিজেদের দেখেশুনে বিয়ে, এসব আজকালকার ব্যাপার। মেয়েটা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। তা আসুক। ছেলের বউকে শ্বশুর শাশুড়ি মেনে নিয়েছে, বউ শ্বশুরঘর করছে এইটাই আসল কথা। মেয়েটা কায়স্থঘরের, জাত হিসেবে ওরা খারাপ নয়। মেয়েটা দেখতে ভালো নয় এই যা। সে পার্থ যা বুঝেছে তাই করেছে। তবে, অঘোর দেখেছেন, পার্থর বউ খাটিয়ে আছে, আর কথাবার্তাও মন্দ নয়। এর বেশি তিনি তার সম্বন্ধে আর কোনো উত্সাহ বোধ করেননি।

কিন্তু এর মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটল, তিনি মেয়েটাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে বাধ্য হলেন। এটা সেদিনেরই ঘটনা যেদিন অসীম অমলের বউয়ের হাত থেকে বালতি কেড়ে হুজ্জোত বাধাল। গণ্ডগোল সেদিন এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে অঘোরকে অবস্থা সামাল দিতে হয়েছিল। তিনি না এসে দাঁড়ালে বোধ হয় অমল পাগলটাকে মারতে মারতে মেরেই ফেলত।

ঝামেলা মিটে যাওয়ার পর সবাই যে যার ঘরে দরজা বন্ধ করে গুজগুজ ফুসফুস করছিল। এটাই রীতি। অসীম মার-টার খেয়ে চোখ-টোখ উলটে দিয়েছিল। তাকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেছেন অরুণ আর অনিল মিলে চ্যাংদোলা করে। শিবানী তখনও গুনগুন করে কাঁদছেন আর অসীমের ঘাড়ে মাথায় জল দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করছেন। এক সীমাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আছে, অসীমকে পাখার বাতাস করছে। অঘোর নিজের ঘরে ফিরে গিয়েছেন। এসমস্ত কাণ্ডের পর সারা বাড়ি থমথম করছিল। থার্মোমিটার বগলে চেপে বসে থাকতে থাকতে অঘোরেরও ঝিমুনি আসছিল।

ঘুম ভাঙার পর অঘোর বুঝতে পারলেন তিনি ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। সারা বাড়ি এখনও নিশ্চুপ। অঘোরের মনে হল, তাঁর ঘুমটা ভেঙেছে যেন কীসের একটা আওয়াজ পেয়ে। একটু পরেই শুনলেন, ছাদের ওপর খসখস আওয়াজ হচ্ছে। কে যেন ছাদে

হাঁটছে।

অঘোর হাত বাড়িয়ে লাঠিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলেন মইটা দরজার পাশে দেয়ালে ঠেকানো। ছাদের ওপরে উঠে ঠাকুরের কাপড় শুকোতে দিচ্ছে পার্থ আর তিথি।

এই দৃশ্য দেখবেন অঘোর কল্পনাও করেননি। তিনি হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'পার্থ! তুমি বউকে ছাদে উঠিয়েছ তোমার এত বড়ো সাহস!'

ঘরে ঘরে দরজা খুলে গেল। উঠোনে আবার ভিড় জমছে।

তিথি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাদে ওঠাতে কী দোষ হল তার মাথায় ঢুকছে না।

পার্থও অবাক গলায় বলল, 'কী হয়েছে? পুজোর কাপড় মেলছি তো!'

অঘোর তাঁর লাঠি উঁচিয়ে ধরলেন, 'কী হয়েছে! আবার জিজ্ঞেস করছ কী হয়েছে, অ্যাঁ! বলি, কেউ কখনো দেখেছে মল্লিকবাড়ির বউ ছাতে উঠে কাপড় শুকুত দিচ্ছে? তুমিই উঠিয়েছ ওকে, কেন, অ্যাঁ! কাপড় শুকুত দেওয়ার আর কোনো লোক জুটল না?'

তিথিদের কাপড় শুকোতে দেওয়ার কাজ প্রায় শেষই হয়ে এসেছিল। আর দু-একটাই বাকি। গঙ্গায় কাপড় কেচে ফিরে তারা দু–জনে মিলে এ বাড়ির তিনটে ছাদ ভরেই কাপড় মেলেছে। এপাশে অঘোরের ঘরের উপরকার ছাদে উঠেছিল সবার শেষে। এত কাপড় মেলার আর কোনো জায়গা নেই ছাদ ছাড়া। কাপড়গুলো ছাদের ওপর টানটান করে বিছিয়ে চারকোণে ইট চাপা

দিয়ে রাখছিল ওরা। সব ছাদেই অনেক ইটের টুকরো আর আধলা ইট পড়ে আছে। তিথির হাত থেকে একটা ইটের টুকরো পড়তেই ওই শব্দে অঘোরের ঝিমুনি ছুটে গেছে। পার্থ তিথিকে নেমে যেতে ইশারা করল, বলল, 'যাও, আমি এগুলো মেলে যাচ্ছি।'

তিথি সাবধানে শাড়ি সামলে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। অঘোর সভয়ে তাকে দেখছিলেন। কী কাণ্ড! বউমানুষ মই বেয়ে ওঠানামা করছে তিনি এই প্রথম দেখলেন। শাড়ি জড়িয়ে পড়লেই তো কেলেঙ্কারি!

সেরকম কিছু হল না। তিথি নেমে এসে ঘোমটা ঠিক করতে করতে অঘোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, মৃদু গলায় বলল, 'সরি দাদু। আমি জানতাম না আমার ছাদে ওঠা বারণ। তা ছাড়া ও একা একা সব করছে। আমি নিজেই বলেছিলাম হেল্প করব।'

অঘোর দেখছিলেন, তাঁর যতটা রাগ হওয়ার কথা ততটা হচ্ছে না। তাঁর গলাটাও অনেক নরম হয়ে এল, 'না না, কাজ করা তো ভালো। ভালোই তো। তবে কিনা ছাদে উঠলে কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে, মুশকিল হয় যাবে—'

তিথি হাসল, 'মুশকিল কেন হবে দাদু, দেখে ফেললেই-বা! আমার তো খুব গর্ব হচ্ছে আমি এ বাড়ির পুজোর কাজ করতে পারছি বলে!'

তিথি ভালোই বুঝতে পারছিল উঠোন-ভরতি লোক সবাই তার কথা শুনছে। সে আবার খুব সহজ বিনীত ভঙ্গিতে বলল, 'কিন্তু, আপনার মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে আমি খুব সরি, আমি ক্ষমা চাইছি।'

অঘোর কী উত্তর দেবেন বুঝতে পারছিলেন না। প্রথমটায় তাঁর খুব রাগ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পার্থর বউ যেন কেমন সুরে কথা বলছে, অঘোরের রাগ পড়ে যাচ্ছিল। এমনকী তাঁর মনে হচ্ছিল মেয়েটা বোধ হয় ঠিক কথাই বলছে। তিনি একটু অনিশ্চিত

ভাবেই মাথা নাড়লেন, 'ঠিক ঠিক। পুজোর কাজ। তুমি বেশ কাজের মেয়ে, আমি ক-দিন থেকেই লক্ষ করেছি। কিন্তু ছাদে-টাদে আর উঠে কাজ নেই বাপু! ওসব পুরুষের কাজ পুরুষেই করুক।'

অঘোর ফের ঘরে ঢুকে গেলেন। পার্থ ততক্ষণে নেমে এসেছে। বান্টি হঠাৎ ছুটে এসে তিথির হাত ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বলল, 'কনগ্র্যাটস্! আ গ্রেট উইন ওভার এজ ওল্ড প্রহিবিশনস্!' বান্টি চেঁচিয়ে উঠল, 'আরে তোমরা সব চুপ করে আছ কেন? বলো—থ্রি চিয়ার্স ফর মিসেস তিথি মল্লিক, হিপ্ হিপ্—,'

পার্থ হাসছিল, হাসতে হাসতে চাপা গলায় বলল, 'চুপ চুপ। তাও তো দাদু তিথির গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার কথাটাই জানে না!'

এবারের পুজো এত সাতসকালে, অত ভোরে কারোরই পুজো দেখার গা নেই। বিশেষ করে ষষ্ঠীর দিনটা তো পুজোর মধ্যে পড়েই না বলতে গেলে। ওই দিন সকালে পুজোবাড়িতে যখন পুজো চলছে, এ বাড়িতে তখনও ঘুম ভাঙেনি অনেকের। শুধু অলক আর অরুণ গেছিলেন পুজো দেখতে। ঘণ্টা দুয়েক পরে সবাই যখন ঘুম থেকে উঠে মুখচোখ ধুয়ে চায়ের কাপ নিয়ে বসেছেন, অরুণ পুজোবাড়ি থেকে ঘুরে এসে বললেন পার্থর বউ এমন আলপনা দিয়েছে, দেখবার মতো।

'তাই নাকি, তাহলে তো রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী বলতে হবে।' সুমিতা মন্তব্য করলেন।

বান্টি একটু ফোঁস করে উঠল, 'ওরকম করে বলছ কেন, ভালোকাকিমা? বউদির দারুণ আঁকার হাত, আমাকে মৌদি বলেছে, জানো?'

'ও বাব্বা!' সুমিতা চোখ ঘোরালেন, 'কী বলেছি আমি, যে তোর গায়ে ফোস্কা পড়ল?'

'বান্টি বোধ হয় নতুন বউদির ফ্যান হয়ে গেছে, তাই না বান্টি?' মল্লিকা ফুট কাটলেন।

বান্টি আর কোনো কথা বলল না। তার মুখ দেখে মনে হল কাকিমাদের ওপর একটু রাগই হয়েছে।

তিথির আলপনার কথাটা অরুণ সবার সামনে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েই বলেছিলেন। ব্যাপারটা সবার খুব একটা পছন্দ না হলেও সেটা নিয়ে একটা আলোচনা চলল। এমনকী, কথাটা অঘোরের কানেও পৌঁছোল।

যদিও এসব কথা তিথি কিছুই শোনেনি। সকালে স্নান করে আসার পর থেকেই সেই যে সে পুজোমঞ্চের পাশে ছোটো ঘরটায় ঢুকে ফল কাটতে বসেছিল, পুজো শেষ হওয়া অবধি সেখান থেকে বেরোতেই পারেনি। ফল কাটা, চাল ধোয়া, থালায় থালায় নৈবেদ্য সাজানো, পান সাজা, বারে বারে একশো আটটা করে বেলপাতা আর দূর্বা গোছাতেই হিমশিম খেয়ে গেছে। এর মধ্যে শুধু দু-একবার খুব কান্না পেয়েছে তার, চোখে কোনো জল আসেনি যদিও। সে ভেবেছিল, পার্থ অন্তত তার আলপনা দেখে কিছু বলবে তাকে। কিংবা, কিছু বলাও নয়, আলপনাটা দেখবে দু–দণ্ড দাঁড়িয়ে, তারপর তিথির দিকে ফিরে একটু হাসবে...সেটুকুও কি আশা করার পক্ষে খুব বেশি, খুব ভুল!

পার্থ কিছু বলেনি, তবে সুধা বলেছিলেন। তিথি যখন আঁচলে রাশিকৃত শিউলি কুড়িয়ে পুজোবাড়িতে ফিরে এসেছিল, তখনও পার্থ শুয়ে। সুধা উঠে বসে এদিক–ওদিক তাকিয়ে বোধ হয় তিথিকেই খুঁজছিলেন। তিথি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল, 'বড়োমা, দ্যাখো কত শিউলি!'

সুধা অপ্রসন্ন মুখে তাকালেন, তাঁর চোখেমুখে তখনও ঘুম জড়িয়ে আছে, 'এই কাকভোরে উঠে চুল ভিজিয়ে চান করে এলে! জ্বরজারি বাধালে কী হবে?'

তিথি অপ্রস্তুত মুখে চুপ করে থাকল। সুধা কাপড়চোপড় ঠিক করতে করতে উঠলেন, বললেন, 'সব কিছু একটা বুঝমতো করবে তো! ঘরজুড়ে আলপনা দিয়েছ দেখছি, শুয়েছ কখন? এত অনিয়ম শরীরে সহ্য হলে হয়।'

পায়ে পায়ে সরে এসে তিথি ছোটো ঘরটায় ঢুকল। আঁচলের ফুলগুলো সে আলাদা একটা থালাতে নামাতে গিয়ে শুনল সুধা গলা তুললেন, 'ওই ফুলগুলো পুজোর থালায় রাখছ নাকি! মাটিতে পড়ে ছিল না? ধুয়ে নাও, ধুয়ে নাও। ধোয়া ফুলের সঙ্গে এক কোরো না।'

পার্থ উঠতে দেরি করছিল, সুধা তাকে নাড়া দিলেন, 'ও পার্থ, ওঠ ওঠ। কলাবউ চান করাতে বেরোবি তো! চান করে আয় বাবা, পুরুতমশাই এক্ষুনি এসে পড়বেন।'

তিথি ফুলগুলো গুছিয়ে রাখতে রাখতে ভাবছিল পার্থ উঠে নিশ্চয়ই আলপনাটা দেখে চমকে যাবে, খুব খুশি হবে। তাকে এসে বলবে নিশ্চয়ই ভালো হয়েছে। কিন্তু পার্থ তার কাছে এলই না। স্নান করে এসে ধুতি চাদর পরল। পুরোহিতমশাই এসে গেলেন তার মধ্যে। ঢাকিরাও এসে জুটল। তাদের থাকার বন্দোবস্ত হয়েছে পুজোবাড়ির পাশে একটা ঘরে। তবে, তাদের পুজোবাড়িতে আসার পথ বাইরের রাস্তা দিয়ে, বাড়ির ভেতর দিয়ে নয়। ঢাকিরা এসে ঢাকে কাঠি দিতেই তিথির বুকের মধ্যে গুরগুর করে উঠেছিল। সুধাও ততক্ষণে স্নান করে এসেছেন। কলাবউ স্নান করাতে বেরোনোর আগে সুধা পার্থ আর পুরোহিতমশাইকে বরণ করলেন। তারপর পার্থ কলাবউ নিয়ে পুরোহিতমশাইয়ের সঙ্গে গঙ্গার দিকে রওনা দিল, সঙ্গে ঢাকিরাও চলল ঢাক বাজাতে বাজাতে।

নৈবেদ্যর থালাগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে তিথি পুজোবেদির পাশে জড়ো করে রেখেছিল। সুধা সেগুলো পুজোর জায়গায় গুছিয়ে রাখছিলেন। পুজো শুরু হওয়ার পরে পার্থ একটা আসন পেতে পুরোহিতের ঠিক পাশেই বসে থাকল। তিথি একবার উঁকি দিয়ে দেখল, অলক আর অরুণ এসেছেন। মেজোঠাকুমা আর বিলাসও। ঢাকিরা নেচে নেচে ঢাক বাজাচ্ছে চাতালে। আর কাউকে

তার চোখে পড়ল না। মেজোঠাকুমা ধুনুচিটা এপাশে ওপাশে নাড়াচ্ছেন আর মুঠো মুঠো ধুনো ঢালছেন তাতে। গুলগুল করে ধোঁয়া পাকিয়ে উঠে পুজোর বেদি আর পুরো চাতালটাই ঝাপসা করে দিচ্ছে। ধুনোর গন্ধে থইথই করছে চারদিক। গন্ধটা যেন কেমন, তিথির আবার মনে হল। খুব পবিত্র সন্দেহ নেই, ভীষণ অভিজাত আর একটু অভিমানী।

পুজো মিটে যাওয়ার পর তিথি চাতালের একপাশে দাঁড়িয়ে এদিক–ওদিক চোখ ফিরিয়ে পার্থকে খুঁজছিল। দেখতে পাচ্ছিল না। পার্থ হয়তো আবার কোথাও বেরিয়েছে। চাতালে, সিঁড়িতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছেন মেজোঠাকুমা, অলক আর বিলাস। অরুণকেও আর দেখা যাচ্ছে না। তিথি নিরাশ মুখে আবার ঘরের দিকে পা বাড়াল। সুধা কাটা ফল গুছোচ্ছেন, সবার হাতে হাতে প্রসাদ দিতে হবে।

বারকোশে করে প্রসাদ নিয়ে এসে তিথি প্রথমে অলককে দিল। অলক প্রসাদ মুখে দেওয়ার আগে খুব দ্রুত ছ–বার ‘জয় মা’ বললেন। তিথি সরে এল মেজোঠাকুমার কাছে। মেজোঠাকুমা চোখ বুজে বসে ছিলেন, তিথি খুব আস্তে বলল, ‘ঠাকুমা, প্রসাদ!’ জ্ঞানদা চোখ খুলে হাত পেতে প্রসাদ নিয়ে মাথায় হাত ছোঁয়ালেন, কিছু বললেন না। বিলাস বসে আছেন চাতালের একেবারে শেষপ্রান্তের সিঁড়িতে। তিথি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তিথি বলল, ‘প্রসাদ নিন।’

‘খুব সুন্দর আলপনা দিয়েছ।’

বিলাসের স্বাভাবিক গম্ভীর স্বর তিথির কানে খুব স্নিগ্ধ ঠেকল। তার ইচ্ছে করছিল জিজ্ঞেস করে যে—কী করে জানলেন আমি দিয়েছি! কিন্তু সে চুপ করে শুধু হাসল। বিলাসও হাসলেন, বললেন, ‘এই পুজোবাড়িতে এমন আলপনা এর আগে কেউ দেয়নি। তুমি ঘরের মেঝেতে পর্যন্ত আলপনা দিয়েছ, ওখানে লোকে দাঁড়াবে, সব মুছে যাবে যে, অবশ্য এই সিঁড়ি আর চাতালেরটাও বাঁচিয়ে রাখা শক্ত।’

তিথি ঝরঝর করে হাসল। মুছে তো যাবেই, সে জানে। তার আগে একটু প্রশংসাই আশা করেছিল সে। খুব খুশি হয়ে উঠতে উঠতে আবার হঠাৎ কান্না পেল তার। পার্থ তাকে কিছু বলল না কেন, সে কি এতই ব্যস্ত! হবে হয়তো। তিথি ভাবল, সে নিশ্চয়ই আর একটু ধৈর্য ধরতে পারে।

সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় পুজোবাড়িতে বেশ ভিড় হল। অসীম ছাড়া বাড়ির প্রায় সবাইই এলেন। অঘোর আর শিবানীও। মল্লিকবাড়ির অন্যান্য শরিকরাও এলেন কেউ কেউ। সুধা আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন আর তিথি যন্ত্রের মতো প্রণাম করে যাচ্ছিল। সবার মুখ মনে রাখা সম্ভব নয়, তার খুব একটা প্রয়োজনও নেই। আজ সবে ষষ্ঠী, এর পরে সপ্তমী থেকে নবমী নিশ্চয়ই আরও সবাই আসবেন। তিথিকেও প্রণাম করে যেতে হবে। এইটুকুই।

আলপনা পায়ে পায়ে অনেকটাই মুছে গেল। তিথির মন থেকেও। সারা সকাল দুপুর বিকেল সে পার্থর প্রতীক্ষা করে করে ক্লান্ত। দুপুরে ওবাড়িতে খেতে গিয়ে পার্থর সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, কথাও হয়েছিল। আলপনা নিয়ে কোনো কথা হয়নি। পার্থ অত্যন্ত ব্যস্ত। এ কথা বুঝেও তিথির অভিমান হচ্ছিল, সেও এ বিষয়ে একটাও কথা তোলেনি।

সন্ধ্যেবেলা পুজোবাড়িতে আরতি হয়ে যাবার পর তিথি পুজোর বাসনপত্র ধোয়াধুয়িতে ব্যস্ত ছিল। বান্টি এসে বলল, ‘বউদি! দাদু ডাকছে। তুমি ফ্যান্টাস্টিক আলপনা দিয়েছ। দাদু একেবারে ফ্ল্যাট!’

তিথি মুখ তুলে তাকাল। বান্টি খুব সুন্দর একটা চুড়িদার পরেছে, সেজেওছে বেশ। খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। তিথি বলল, ‘তোমায় দারুণ দেখাচ্ছে বান্টি, আরও ফ্যান্টাস্টিক!’

বান্টি খুশি খুশি মুখে বলল, ‘থ্যাঙ্কস্। কিন্তু তুমি তো এক্কেবারে সাজো না। পুজোতে একটু সাজতে হয়। চলো চলো, দাদু ইজ ওয়েটিং ফর ইউ!’

অঘোর চুপচাপ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর আশেপাশে জটলা করে দাঁড়িয়ে সবাইই কথা বলছে, গল্প করছে। তিথি সেখানে এসে দাঁড়াতেই তার নাকে এসে লাগল আর একটা পরিচিত গন্ধ, নতুন শাড়িকাপড়ের। এ-ও পুজোরই গন্ধ। কাকিমাদের গায়ে ঝিকমিক করছে গয়না। তিথিকে দেখে জায়গাটা চুপ হয়ে গেল। বান্টি ডাকল, ‘দাদু, এই যে বউদি।’

অঘোর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন। তিথিকে কয়েক মুহূর্ত দেখে আবার ঠাকুরের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, ‘সকালেই শুনলুম তুমি নাকি সুন্দর আলপনা এঁকেছ। তা তখন তো আর আসতে পারিনি। এখন এসে দেখে খুব আনন্দ পেলুম।’

তিথি মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার আনন্দবোধের মধ্যেও একটা অদ্ভুত শূন্যতা ভাসছে যেন। অঘোর আবার বললেন, ‘তুমি বেশ গুণী মেয়ে দেখছি, বেশ বেশ! কার কাছে শিখেছ?’

তিথি অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। অঘোরের প্রশ্নটা শুনে একটু কেঁপে উঠল সে। তারপর যেন বিস্মৃতির অতল থেকে একটা শব্দ উঠে এল তার মুখে, তার নিজেরই অজান্তে। থেমে থেমে উচ্চারণ করল, ‘আমার...মায়ের কাছে...।’

ভিড় গুনগুন করছিল। দীপ্তি বলছিলেন, ‘সত্যি বাবা, দ্যাখো কী বিরাট আলপনা দিয়েছে, কখন দিলে গো? আমি তো বাবা লক্ষ্মীপুজোয় কোনোরকমে লক্ষ্মীর পা-টা আঁকি, ব্যস।’

‘আমিও তাই, আসলে আমাদের ফ্ল্যাটে তো মোজাইকের মেঝে, আলপনা দেবার জায়গাই নেই!’ মল্লিকার গলায় আপশোস ঝরে পড়ছিল।

জ্ঞানদাও কাছাকাছি ছিলেন। তিনি একটু কেটে কেটে বললেন, ‘এ সমস্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপার। আর কিছু না, পার্থর বউয়ের বাপের বাড়িটি কেমন, ওই আলপনাই তার প্রমাণ।’

তিথি হঠাৎ মুখ তুলে দেখতে পেল, চাতালের সিঁড়িতে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে সীমা। সে একবারও তিথির দিকে দৃষ্টি ফেরাল না।

সপ্তমীর দিনটাও কেটে গেল হু–হু করে। অষ্টমীর দিন শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে তিথির হঠাৎ সন্দেহ হল, তার বোধ হয় পিরিয়ড শুরু হয়েছে। এটা হওয়ার সময় নয় তার, কিন্তু সবসময় তার সময়ের ঠিকও থাকে না, গোলমাল হয়। তিথি মনে মনে হিসেব করল, তার শেষ পিরিয়ড হয়েছে সতেরো-আঠেরো দিন আগে। এত তাড়াতাড়ি আবার হয়ে গেল?

তিথি উঠে বসে দেখল, তার শাড়ির পেছনে সত্যি রক্ত লেগে আছে। এক মুহূর্তে তীব্র অবসাদে ভরে উঠল তার মন। আর কিছু করার নেই।

হঠাৎ তিথির মনে হল—যাক, এইবার সীমার সঙ্গে বোধ হয় তার ভাব হয়ে যাবে।

৯

প্ল্যাটফর্মের এদিকটায় কোনো আলো নেই। কোনো লোকজনও নেই। একেবারে ফাঁকা। কেবল একটা সিমেন্টের বেঞ্চিতে ছায়ামূর্তির মতো পাশাপাশি বসে আছেন দুটি মানুষ। তাঁরা নিজেদের মধ্যেও কোনো কথা বলছেন না।

প্ল্যাটফর্মের সামনেই রেল লাইন, তার ওপারেই ঢাকুরিয়া লেকের বড়ো বড়ো শিরীষ আর রাধাচূড়া কৃষ্ণচূড়ার গভীর অন্ধকার অবয়ব। তারও ওপার থেকে চিকচিক করছে দূরবর্তী আলোর মালা। আর ভেসে আসছে দূরবর্তী ঢাকের আওয়াজ। অস্পষ্ট কিন্তু অমোঘ। আজ মহাষ্টমী।

একটা ছায়ামূর্তি খুক খুক করে কেশে উঠলেন। একবার, দু–বার। তৃতীয়বার কাশতেই পাশের জনের গলা শোনা গেল, ‘চাদরটা গলায় জড়িয়ে নাও।’ কাশিটা তাও চলতেই থাকল। থেমে থেমে, অনিয়মিত বিরতির পর পর। কিন্তু আর কোনো কথা শোনা গেল না। তারপর ঢাকের আওয়াজ কখন থেমে গেল, সামনের ঘন গাছপালার জঙ্গল থেকে ঝনঝন করে উঠল ঝিঁঝি, ঠান্ডা পড়তে শুরু করল, একজন আরেকজনকে বললেন, ‘চলো, উঠি।’

নির্জন গলিপথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে বাড়ি ফিরতে লাগলেন দুজন। ভাগ্যিস, এ শহরে এখনও এমন কোনো গলি আছে যেখানে কোনো পুজো নেই। এই উন্মত্ত উত্সবের দিনেও সেখানে লুকিয়ে হাঁটা যায়।

বাড়ি ফিরে এসে অদিতি রান্নাঘরে গিয়ে প্রেশার কুকারে চাল দিলেন, সেই সঙ্গে দুটো আলু আর কুমড়োর টুকরো। তিথি চলে যাওয়ার পর থেকে তাঁর আর রান্না করতে ইচ্ছে করে না। বিশ্বনাথও মুখ বুজে ভাতে সিদ্ধ ভাতই খেয়ে নেন। আসলে, তাঁদের বেঁচে থাকাটাই আজকাল ভীষণ নিরুত্সাহ, কেমন বায়বীয় হয়ে গেছে। তমালও বাড়ি আসেনি এই পুজোয়। তার নাকি

ভয়ংকর কাজের চাপ। অদিতি বা বিশ্বনাথ, দুজনেই জানেন, তমাল ইচ্ছে করেই আসেনি। তারও অসম্ভব ধাক্কা লেগেছে। সে যতই তিথির পেছনে লাগুক, আসলে মনে মনে সে বোনকে নিজের ধরনে গভীর ভালোবাসে। তিথি এমন বিশ্রী একটা কাণ্ড করে বসবে এটা সে দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সেও বোধ হয় এই ঘটনা থেকে পালাতে চায়। বাড়িতে না এসে সে একদিক থেকে ভালোই করেছে। অদিতি আর বিশ্বনাথেরও তো পালানো প্রয়োজন। নইলে, ভরা পুজোর রাত্রে তাঁরা লেক গার্ডেন্স স্টেশনের অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে শব্দহীন বসে থাকেন কেন!

যেদিন তিথি তাঁর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল, অদিতি জানতেন তিথি ফিরবে না। সারাদিন সমস্ত চাপ নিঃশব্দে বহন করে সন্ধ্যের পর তিনি বারান্দায় দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই রইলেন ঠায়। আটটা বেজে গেল, ন-টা, সাড়ে ন-টা। অদিতি খেয়ালই করেননি কখন তাঁর চোখ থেকে হু-হু করে জল বইতে শুরু করেছিল স্রোতের মতো। জল বয়েই যাচ্ছিল।

বিশ্বনাথ এসব কিছু জানতেন না। সকালের ঘটনাটার সময় তিনি মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। সাড়ে ন-টা নাগাদ তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, ‘তিথি এখনও ফিরল না।’

অদিতির সাড়া নেই। বিশ্বনাথ রাগে উত্‌কণ্ঠায় গজগজ শুরু করলেন, ‘রাতদুপুরের আগে বাড়ি ফেরার নাম নেই, বেয়াদবির একটা সীমা আছে তো!’ বিশ্বনাথ গলা তুলতে তুলতে ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বারান্দায় পা দিলেন।

মুহূর্তের মধ্যে অদিতি আঁচলে চোখ মুছে নিলেন, পাথরের মতো ঠান্ডা গলায় বললেন, ‘ঘরে চলো।’ বলে তিনি নিজেই ঘরের মধ্যে চলে এলেন।

বিশ্বনাথ তখনও বারান্দায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন করে চলেছেন, ‘আজ আসুক ও বাড়ি, এবার আমাকেই কিছু করতে হবে, কাল মার খেয়েও শিক্ষা হয়নি—আসুক আজ—’

অদিতি বিশ্বনাথের হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরে চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলেন, 'আহ্ ঘরে এসো বলছি না! এসো ঘরে! বারান্দায় নাচানাচি কোরো না।'

'অ্যাঁ, আমি নাচানাচি করছি!' বিশ্বনাথ আহত ক্রুদ্ধ স্বরে কথাগুলো বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন। অদিতি তখনও তাঁকে টানছেন।

'কী হল কী!' বিশ্বনাথের গলায় বিরক্তি, 'টানছ কেন?'

অদিতি দরজায় ছিটকিনি লাগালেন, খিল তুলে দিলেন। বিশ্বনাথের মুখের ভাব বদলে যাচ্ছিল। তিনি সভয়ে সবিস্ময়ে অদিতিকে দেখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে কথাগুলো যেন আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, 'তিথি ফিরবে না?'

অদিতি দ্রুত মাথা নেড়ে না বলেই দু-হাতে মুখ ঢাকলেন। তাঁর সমস্ত মুখ কান্নায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল।

যথেষ্ট বুদ্ধিমান হয়েও গড়পড়তা বাঙালি পুরুষের মতো বিশ্বনাথ সাংসারিক সব ব্যাপারেই স্ত্রীর ওপর নির্ভর করেন। এখানে অদিতির সিদ্ধান্তই তাঁর সিদ্ধান্ত। কিন্তু তিনিও প্রথমে এটা মেনে নিতে পারেননি যে অদিতি এমন চুপচাপ পুরো ঘটনাটা মেনে নেবেন। সেই মেনে নেওয়াও এমন, যে না মানার সঙ্গে তার খুব একটা পার্থক্য নেই। অদিতি অস্বাভাবিক নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। কোনো কথাবার্তা বললেন না, স্নানও করলেন না পর পর দু-দিন, মুখেও কিছু দিলেন না, শুধু শুয়ে রইলেন বিছানায় মৃত মানুষের মতো। এ ক-দিন বিশ্বনাথ পাগলের মতো ছটফট করলেন, কিন্তু তাঁর কী করণীয় ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। শুধু কাজের লোক অন্নদাকে বললেন, 'তোমার বউদির খুব জ্বর। তুমি রাত্রে গোটা পাঁচেক রুটি করে রেখে যেয়ো তো।' দুপুরের ভাত আর আলু বিশ্বনাথ নিজেই সিদ্ধ করে নিয়েছেন, অন্নদা রুটি করে গোটা দুই বেগুনও ভেজে দিয়ে গেল।

দু-দিন এভাবে কাটার পর তৃতীয় দিন বিশ্বনাথ আর না পেরে অদিতিকে একটা ঝাঁকুনি দিলেন, 'শুনছ? এই যে, শুনছ? এরকম না খেয়ে না দেয়ে শুয়ে থাকলে হবে? কিছু একটা করতে হবে তো?'

অদিতি চোখ মেলে তাকালেন, তাঁর দৃষ্টি একেবারে শূন্য। বিশ্বনাথ আকুল গলায় বললেন, 'তিথির তো একটা খোঁজ নেওয়া উচিত,...তমালকেও একটা চিঠি লেখা দরকার...'

'ও কোথায় গেছে তুমি জানো না!' অদিতির গলা ক্ষীণ, খসখসে। 'সে নিজের ইচ্ছেয় সেখানে গেছে, তোমার আমার কিছু করার তো নেই!'

তাঁর কথাগুলোর মধ্যে কোনো আবেগ ছিল না, ছিল নিরাসক্ত সত্যকথনের ধার। বিশ্বনাথ খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মৌসুমীদের কাছ থেকে একবার পার্থদের বাড়ির ঠিকানাটা—'

'না!' অদিতির চোখের দৃষ্টি তীব্র হয়ে উঠেছিল, 'সে আমাদের এভাবে ছেড়ে যেতে পেরেছে যখন, তখন মনে করব আমাদের তার কোনো প্রয়োজন নেই। আমিও তার কোনো খোঁজ করব না।'

বিশ্বনাথের কান্না আসছিল, কিন্তু তাঁর বহুবছরের বিশ্বাস তাঁকে বলছিল, অদিতি ঠিক কথাই বলছেন।

অদিতি উঠে বসলেন। ক্লান্ত শুকনো গলায় বললেন, 'তমালকে লিখে দাও। তবে চিন্তা করতে বারণ কোরো। আসতে-টাসতে বলার দরকার নেই। আর শোনো...লোকে জিজ্ঞেস তো করবেই।...কাউকে মিথ্যে বলতে যেয়ো না।...বোলো যে,...বোলো...তিথি নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করে চলে গেছে...'

তাঁর গলা ভেঙে যাচ্ছিল। জোর করে সামলে নিলেন। বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘বাথরুমে যাব, আমায় একটু ধরবে? মাথাটা বড়ো ঘুরছে...’

বিশ্বনাথ তাঁর কাঁধ ধরতেই অদিতি একেবারে ছেলেমানুষের মতো তাঁর বাহুতে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠলেন, ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, ‘কী করে পারল, কী করে এমন করতে পারল গো! খুব কষ্ট হচ্ছে,...তোমারও হচ্ছে...আমি জানি...কিন্তু কী করব...ও যেন সুখে থাকে, ভালো থাকে যেন...’

বিশ্বনাথের হাঁ–হাঁ করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল, তার ফাঁকেই মনে হল, অদিতি তাঁকে ছুঁয়ে এভাবে শেষ কবে কেঁদেছিলেন তাঁর মনে নেই।

চিঠি পেয়ে তমাল এসেছিল, বিশ্বনাথ তাকে আসতে বারণ করা সত্ত্বেও। সে প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেনি ঘটনাটা। বাড়ি এসে সব দেখেশুনে সেও হঠাৎ কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল। আর কোনো কঠিন পদক্ষেপের কথা উচ্চারণও করল না সে, প্রতিশোধের কথাও নয়। বরং তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে গোপনে কাঁদছে। বারবার বলছিল, ‘তিথি! তিথি এমন করল!’ হতাশায় মাথা নাড়ছিল এদিক–ওদিক, ‘নিজের কেরিয়ারের কথা ভাবল না একবারও!’ সে একবারও পার্থর নাম উচ্চারণ করেনি। কলকাতায় দিন তিনেক থেকেই দিল্লি ফিরে গেল, এই নিস্তব্ধ অবসন্ন বাড়ির পরিবেশ তার অসহ্য লাগছিল।

যাওয়ার সময় অদিতি তাকে বললেন, ‘মন দিয়ে নিজের কাজকর্ম কোরো। এসব কথা বেশি ভাবার দরকার নেই। তার কোনো খবর নেই মানে ধরে নিতে হবে সে ভালোই আছে।’

ক্ষিপ্রহাতে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে তমাল চোয়াল শক্ত করল, ‘হ্যাঁ, ভালো থাকতেই তো গেছে। তবে নিজের ভালো দেখতে গিয়ে আর কারও কথা ভাবল না এটাই হচ্ছে কথা। স্বার্থপর!’ তমাল এক ঝটকায় ভারী ব্যাগটা কাঁধে তুলে উঠে দাঁড়াল,

'আসছি মা, বাবা এলাম। তোমরাও একটু ইজি হও, ভুলতে চেষ্টা করো। আফটার অল ইটস্ হার লাইফ অ্যান্ড হার ডিসিশন। ওর জন্যে তোমাদের এত কষ্ট পাওয়ার কিছু নেই।'

অদিতি হাসলেন, বিবর্ণ অদ্ভুত হাসি। বললেন, 'সাবধানে।'

তমাল দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, তার ট্রেন ধরবার তাড়া।

এই পাঁচ-ছ মাসে পাড়ার লোক, আত্মীয়স্বজন সবাইই সব জেনে গেছে। অদিতি বা বিশ্বনাথ কেউই কারও কাছে কিছু লুকোননি। পাড়ার লোকেদের সঙ্গে তাঁদের কোনোকালে বেশি মাখামাখি নেই। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও কর্তব্য ও সৌজন্য ছাড়া অতিরিক্ত আত্মীয়তা নেই। তার কারণ, অদিতি বা বিশ্বনাথ কেউই কথা চালাচালি পছন্দ করেন না। পরনিন্দা পরচর্চা আর কূটকচালি, যে-কোনো প্রতিবেশী কিংবা আত্মীয়সভার যা প্রধান কর্মসূচি, তার থেকে সচেতনভাবে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। তিথি চলে যাওয়ার পর এইসব সভায় সাড়া পড়ে গেল।

মাসের গোড়ায় ভাড়া দিতে এসে একতলার বিশ্বাসবাবু ঠোঁটে আক্ষেপসূচক চিক চিক শব্দ তুললেন, 'সব শুনলাম, মিসেস মিত্র। স্যাড, খুবই স্যাড। আপনারা কিছু করতে পারলেন না!'

অদিতি হাত পেতে টাকাগুলো নিয়ে গুনতে শুরু করলেন। এটা করতে তাঁর খুব অস্বস্তি হয়। বিশেষত যিনি টাকা দিলেন তাঁরই সামনে দাঁড়িয়ে সেই টাকা গোনা খুব অভদ্রতা বলে মনে হয় তাঁর। আজ এইটাই তাঁর মুখ নীচু করে রাখার অছিলা।

'ছেলেটি কী করে কী?'

অদিতি মুখ তুললেন, 'আমি ঠিক বলতে পারব না।'

'সে কী! মানে, আপনি কিছুই জানেন না?'

'তিথি নিজের ইচ্ছেয় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে একজনকে বিয়ে করেছে, আমি শুধু এইটুকু জানি। এর বেশি যদি কিছু আপনার জানার ইচ্ছে থাকে, আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারছি না—দুঃখিত।'

বিশ্বাসবাবু হাঁ-করে তাকিয়ে থাকলেন। মেয়ে পালিয়েছে তবু কটকট করে কথা শোনাচ্ছে, এ আবার কেমনধারা মা!

তাই বলে অদিতি এত সহজেই সবার কাছে নিষ্কৃতি পেলেন তা নয়, তাঁর নিজের দিদি বাড়িতে এসে রীতিমতো রাগারাগি চেঁচামেচি শুরু করলেন, 'থানা পুলিশ কিচ্ছু করলি না তোরা!'

'খামোখা চেঁচাচ্ছ দিদি, তিথির বয়েস এই সেপ্টেম্বরে কুড়ি হবে। আঠেরো হয়ে গেছে দু-বছর আগে, ও সাবালিকা—'

'থাম থাম'। দিদি চোখ বড়ো করলেন,—'একমাত্র মেয়ে নিজের সর্বনাশ করল, আর তুই বসে বসে দেখলি? কী পাষাণী মা রে তুই?'

অদিতির কোনো উত্তর দিতে ইচ্ছে করছিল না। এসব কথার কী জবাব দেবেন তিনি! তাঁর দিদি একা নন। এই একই ক্ষুব্ধ অভিযোগের মুখে তিনি বার বার পড়ছেন। এ ছাড়াও আরও নানা কথা। তিথির আদৌ বিয়ে হবে কি না, নাকি সেই ছেলেটা তাকে ফেলে পালাবে, অদিতির সামনে এইসব সন্দেহও প্রকাশ করেছেন অনেকে। তাঁর আড়ালে লোকে যে আরও অনেক কিছু বলছে সেও অদিতি জানেন। অদিতির হঠাৎ খুব মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল, যে মা তাঁকে ছেড়ে অনেকদিন আগেই চলে

গেছেন, তিথির জন্মের ঠিক দশ মাস আগে। তার দু-বছর পরে বাবাও। অদিতির খুব মা-বাবার কথা মনে করে কান্না পাচ্ছিল।

বিশ্বনাথের চেহারা দেখেও বুক ভেঙে যায় অদিতির, বিশ্বনাথ যেন এই ক-দিনেই একেবারে বুড়ো হয়ে গেলেন। দাড়িটাড়ি কামান না একদম, সারা মুখে খোঁচা খোঁচা সাদাকালো দাড়ি। আর কেমন যেন একটা জবুথবু ভাব। চোখের কোণে পিচুটি লেগে আছে খেয়াল নেই।

‘দাড়ি কাটো না কেন! বড্ড যে ভেঙে পড়েছ দেখছি।’ অদিতি হাল ধরতে চেষ্টা করেন। এরকম করে চলতে পারে না। তাঁদের দুজনকেই শক্ত হতে হবে।

বিশ্বনাথ কোনো উত্তর দিলেন না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে গেলেন অদিতির সামনে থেকে। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও বাক্যালাপ যেন অসম্ভব বিরল হয়ে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যোগাযোগহীন হয়ে মূর্তির মতো বসে থাকেন দুজনেই। অদিতি কোনো কথা বললেও বিশ্বনাথের সাড়া পাওয়া যায় না। অদিতি বুঝতে পারেন বিশ্বনাথের এই চুপ করে থাকা, এই দীর্ঘশ্বাসে তাঁর প্রতি একটা অব্যক্ত অভিমানই প্রকাশ পায়। অদিতি জানেন বিশ্বনাথ মনে মনে প্রত্যাশা করেন অদিতি তাঁকে কোনো একসময় বলে উঠবেন, ‘তিথি যা করেছে, করেছে। চলো আমরা ওকে ক্ষমা করে দিই। ওখানেই ওর বিয়ে দিয়ে দিই।’ কিন্তু বিশ্বনাথ চুপ করে থাকেন। তিনিও জানেন অদিতির অভিমান স্পর্শ করার জোর তাঁর নেই। তিনি তাই নিজের অভিমানও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না।

তিথি আদৌ পার্থকে বিয়ে করেছে কি না, অদিতিও তা জানেন না। তবে তিনি আলাদা করে বিয়ে জিনিসটাকে তেমন গুরুত্ব দিয়েও ভাবতে বিশ্বাসী নন, যেভাবে সচরাচর সবাই ভেবে থাকে। দুজন সাবালক যে-কোনো মূল্যে পরস্পরের সঙ্গে থাকতে চাইলে তাদের বিয়ে করে নিতেই-বা কতক্ষণ, আর বিয়ে না করলেইবা তাদের কী আসে যায়! তাঁর একান্ত অনিচ্ছায় তিথি ভুল বয়সে ভুল সময়ে ভুল সঙ্গী নির্বাচন করে যে অনর্থ করেছে, তাতে শুধু তাদের ডেকে এনে বিয়ের আয়োজন করলেই সমস্ত

সংশোধন হয়ে যাবে, অদিতি এমন মনে করেন না। তাঁর বুকের মধ্যে নিরন্তর তীব্র টানাপোড়েনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন তিনি। তাঁর একটা মন আকুল প্রার্থনায় ঈশ্বরকে বলছে—ঠাকুর ও যেখানে গেছে যেন সুখে থাকে, আর একটা মন গোপনে অপেক্ষা করছে কবে তিথি পার্থকে ছেড়ে তাঁর কাছেই ফিরে আসবে।

অদিতির মনের মধ্যে যে তীব্র ওলটপালট চলেছিল, তার প্রতিফলন ঘটল বাইরেও। তিনি বদলাতে শুরু করলেন। অথবা, এটা ঠিক বদল নয়। তিনি বহুদিন ধরে নিজেকে যেভাবে যে রূপে সচেতনভাবে গেঁথে তুলেছিলেন, আজ সেটাই ভেঙে ফেলতে চাইলেন। অদিতি ছোটোবেলা থেকে যে আবহাওয়ায় যে পরিমণ্ডলে বড়ো হয়েছিলেন, বিশ্বনাথকে বিয়ে করার পর তার থেকে বহুদূরে সরে এসে আমূল পরিবর্তিত করে নিয়েছিলেন নিজেকে। কেতাদুরস্ত ধনীকন্যা থেকে সহায়সম্বলহীন কেরানির বউ। একমাত্র ভালোবাসাই মানুষকে এই পরিবর্তনের শক্তি জোগায়। স্বামীর প্রতি ভালোবাসা, সন্তানের প্রতি, সংসারের প্রতি। বিশ্বনাথের অবস্থার প্রচুর উন্নতি হলেও তাঁর মতো অদিতিও বাইরে থেকে দেখতে একই রয়ে গেছিলেন। আসলে, ছেলেমেয়েকে নিপুণভাবে গড়ে তোলার জন্যেই তাঁরা দুজনে নিজেদের দিকে ফিরেও তাকাতে পারেননি, তাকাতে চানওনি। আজ তিথি সেইসব স্নেহ আর শাসনের যাবতীয় বন্ধন উপেক্ষা করে চলে যেতেই অদিতি হঠাৎ নিজের দিকে চোখ ফেরালেন। তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল কীসের জন্যে তাঁর এই নিজেরই চারপাশে ঢালাই করা ছাঁচ? কোনো লাভই তো হল না শেষপর্যন্ত! তিনি তিথিকে যেভাবে বড়ো করে তুলেছিলেন, যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সব তছনছ করেই তো সে এভাবে চলে যাতে পারল! তাহলে তাঁরইবা আর কী দায় নিজেকে এই সংসারের সাজে জড়িয়ে রাখার। অদিতি আবার আগের চেহারায় ফিরে গেলেন। বিয়ের আগে তাঁর চুল ছিল ছোটো ছোটো করে কাটা। তিনি আবার চুল কেটে ফেললেন। কখনোই তিনি সিঁথির প্রান্তে এক বিন্দুর বেশি সিঁদুর ছোঁয়াননি, সেটুকুও বর্জন করলেন। হাত থেকে খুলে ফেললেন চুড়ি। বিশ্বনাথের অবাক দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘রাগ করছ? আসলে এসবে তো আমি কোনোদিনও বিশ্বাস করিনি। তোমাকে বিয়ে করার পর কোনো সংঘাত চাইনি বলে সব কিছু মেনে নিয়েছিলাম। এতদিন মেনেও এসেছি। ভেবেছিলাম, আমার সংসারকে সব দিক থেকে আদর্শ সংসার হিসেবে গড়ে তুলব। সেখানে কোনো অশান্তি থাকবে না। তোমার–আমার মধ্যেও নয়, আমাদের ছেলেমেয়েদের নিয়েও নয়। আমার খুব গর্বও

ছিল সেরকম একটা সংসার গড়তে পেরেছি বলে। এখন বুঝতে পারছি আমি আসলে কিছুই পারিনি। তাই এসব খুলে ফেলেছি। আজ থেকে আমি আবার আমার নিজের মতো থাকব।'

অদিতি একটানা কথা বলে দম নিলেন। বিশ্বনাথকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল না তাঁর মাথায় আদৌ কিছু পৌঁছোচ্ছিল কি না। তিনি ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়েই ছিলেন। অদিতি বললেন, 'রোজ ভোরে তোমার সঙ্গে হাঁটতে যাব ভাবছি। বাড়িতে বসে থেকে ভালো লাগে না—'

বিশ্বনাথ মাথা নাড়লেন, আস্তে আস্তে বললেন, 'তাই যেয়ো। লেকে এখন খুব কৃষ্ণচূড়া ফুটেছে, তোমার ভালো লাগবে।'

বিশ্বনাথ এভাবে কথা বলবেন, অদিতি আশা করেননি। তাঁর চোখে জল আসছিল, কৃতজ্ঞতায়।

এই প্রথম পুজোতে তিথি তমাল কেউ বাড়িতে নেই। পুজোর দিনগুলো কীভাবে কাটবে অদিতি ভেবে পাচ্ছিলেন না। পুজোর হাওয়ায় যে কী একটা দোষ আছে, প্রিয়জনদের কাছে না পেলে অদর্শনের কষ্ট পাগল করে মারে, অদিতি এর আগে কখনো এভাবে বোঝেননি। বাড়ির পেছনদিকে একটু দূরেই পাড়ার পুজো। মাইক বাজছে সকাল থেকে সন্ধ্যে। অদিতি বা বিশ্বনাথ কেউই মণ্ডপে গেলেন না। টিভিতে সন্ধ্যেবেলা মায়ের মুখ দেখে প্রণাম করলেন। তারপর সুতির চাদর জড়িয়ে টুকটুক করে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি বন্ধ করে। ঠাকুর দেখতে নয়, বাড়ির কাছে লেক গার্ডেন্স স্টেশন, সেইদিকে। অন্ধকার নির্জন প্ল্যাটফর্মে বসে থাকার মধ্যে এক ধরনের অসহায় শান্তি আছে, এই মারাত্মক পুজোর দিনগুলোতে শুধু এই প্ল্যাটফর্মে কোনো ভিড় নেই, আলো নেই, শব্দ নেই। মাঝে মাঝে একেকটা ট্রেন আসছে যাচ্ছে চিন্তাস্রোতের মতো, তারপর আবার শূন্যতা।

পুজোর পরে একদিন সকালে অদিতি বাজার করে ফিরছিলেন। সামান্যই বাজার হয় আজকাল। হেঁটেই আসছিলেন অদিতি। একটু অন্যমনস্কও ছিলেন হয়তো। হঠাৎ মোনালিসা সেলুনের সামনে একটা রিকশা তাঁর গায়ের কাছে এসে পড়াতে তিনি

তাড়াতাড়ি রাস্তার ধারের দিকে সরে গেলেন। সেলুনের সামনে একটা নীল মারুতি দাঁড়িয়ে। অদিতিও গাড়িটার কাছ ঘেঁষে সরে এলেন আর সেই মুহূর্তেই গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন মিতা। এক্কেবারে মুখোমুখি, এড়ানোর কোনোই উপায় নেই।

এই ভয়টা অদিতির বরাবরই ছিল। মৌসুমীদের বাড়ি তাঁদের বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট দশেকের পথ। বাজার যাওয়ার পথে একটা গলি ডান হাতে বেঁকে গেছে ভেতরে, ওইটা দিয়ে একটু ঢুকলেই মৌসুমীদের বাড়ি। যদিও ওদের বাড়ির লোকজন সবাই গাড়িতে করে বড়ো রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করে, গলি দিয়ে খুব একটা হাঁটে না। দোকানবাজারও করে কাজের লোক। তবু কখনো না কখনো দেখা হয়ে যাবার সম্ভাবনা তো ছিলই। আজ এভাবে দেখা হয়ে যেতেই অদিতি অসহায় বোধ করলেন।

অদিতির থেকে মিতাই অবশ্য চমকে উঠেছিলেন বেশি। প্রথম দু-এক মুহূর্ত তিনি অদিতিকে ঠিক চিনতে পারছিলেন না। তিথির মা বলতে যাঁর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল তিনি অত্যন্ত ঘরোয়া চেহারার এক মহিলা। তাঁর সঙ্গে এই অদিতির যথেষ্ট অমিল। অবশ্য ছোটো চুল বা সিঁদুরহীন সিঁথি কোনো মানুষকে একেবারে চিনতে না পারার মতো কোনো পরিবর্তন নয়। মিতার মুখ একটু পরেই লাল হয়ে উঠল। তিনি একবার বিব্রত মুখে একটু হাসার চেষ্টা করলেন, হাসিটা খুলল না। অরূপ ছিলেন চালকের আসনে। তিনি গাড়ি থেকে নেমে দ্রুত একবার মিতার সঙ্গে চোখাচোখি করলেন। তারপর দ্বিধাজড়িত মুখে বললেন, 'কেমন আছেন?'

অদিতি একটু সময় নিয়ে তারপর মাথা নাড়লেন, 'ভালো, আপনারা?'

মিতা চোখ নামিয়ে নিলেন। মনে হচ্ছিল তিনি অদিতির চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারছেন না। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'কী বলে যে আপনার কাছে, মানে, আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইব আমরা, আমাদের কোনো মুখ নেই।'

অদিতি একটু অস্থির হয়ে উঠলেন, মুখে কিছু বললেন না। অরূপ মিতাকে সমর্থন করার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিকই, উই মাস্ট অ্যাপোলজাইস। কিন্তু, আমরা কিছু জানতা—'

'আমি তো আপনাদের কিছু বলিনি!'

মিতা আর অরূপ দুজনেই চমকে তাকালেন অদিতির দিকে। অরূপ বলে উঠলেন, 'না না, এটা আমাদের রেসপনসিবিলিটি আমরা স্বীকার করছি, আসলে—'

'আমি সত্যিই তা মনে করি না।' অদিতি বাধা দিলেন। খুব শান্তভাবেই বললেন, 'বিশ্বাস করুন। সেরকম হলে আমি এতদিনে নিজেই আপনাদের কাছে গিয়ে কথা বলতে পারতাম।'

মিতা নির্নিমেষে দেখছিলেন অদিতিকে। অরূপও। অদিতি বাজারের ব্যাগটা হাতবদল করতে করতে বেশ সহজ গলায় বললেন, 'তিথি যা করেছে সেটা ওরই দায়িত্ব। সেজন্যে আমি আপনাদের দোষী করব? ছি! এরকম ভাবলে আমার নিজেকেই খুব ছোটো লাগবে।'

অরূপ হঠাৎ খুব আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'মিসেস মিত্র, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানি না। আমরা সত্যিই খুব অপরাধী মনে করেছি নিজেদের। আপনাকে আমি সব বলতে পারি, তিথি এখন—'

অদিতি এক ঝটকায় অরূপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, মিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মৌসুমী ভালো আছে? আর ওর ভাই?' তাঁর গলার স্বর কাঁপছিল।

মিতার চোখে জল চিকচিক করছে, তিনি গাঢ়কণ্ঠে বললেন, 'মৌ খুবই দুঃখ পেয়েছে। আমরাও। তিথিকে আমরা খুব ভালোবাসি, দেখুন, আমরা আপনাকে হেল্প করতে চাই—'

অদিতি মাথা নাড়ছিলেন, কঠিন গলায় বললেন, 'কোনো লাভ হবে বলে মনে হয় না আমার। আমার মেয়েকে আমি চিনি, এভাবে ওকে ফেরানো যাবে না।' অদিতি এগোতে শুরু করেও থমকে গেলেন, একটু হেসে বললেন, 'ও সব কথা বরং থাক। বিজয়ার পর দেখা হল, কোনো সম্ভাষণ করলাম না—শুভ বিজয়া।'

মিতা চট করে কোনো জবাব দিতে পারেননি, অরূপই তাড়াতাড়ি বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, শুভ বিজয়া। দেখা হবে!'

বিজয়ার ক-টা দিন ব্যস্ত থাকতেই হল। তাঁদের বিজয়ায় যেখানে যেখানে যাওয়ার থাকে সেসব মিটে গেল লক্ষ্মীপুজোর আগেই। লক্ষ্মীপুজোর পর ক-দিন ধরে চলল বাড়িতে লোকজন আসার ধুম। সেই একই প্রশ্ন আর অভিযোগ সামলাতে হল অনবরত, কখনো উত্তর দিয়ে, কখনো নিরুত্তর থেকে। এ ছাড়া আরও বিস্ময় এবং কটূক্তিও, অদিতির আচমকা বেশ পরিবর্তন সম্পর্কে। অদিতির কোনো ভাবান্তর হল না। তিনি প্রত্যেক বার বিজয়ায় বাড়িতে নানারকম মিষ্টি বানান, সেইসঙ্গে ঝাল নোনতা কচুরি নিমকি ঘুগনি আলুরদম। এ বছর কর্তব্য সারলেন কেনা মিষ্টি দিয়ে, অতিথিদের মন উঠল না।

কালীপুজোর আগের দিন সকাল থেকেই প্রবল উত্তুরে হাওয়া দিতে শুরু করল। তিথির ঘরে উত্তরদিকে দুটো জানলা আছে। সে চলে যাওয়ার পর অদিতি একদিনই মাত্র এ ঘরে ঢুকেছিলেন। তার এলোমেলো বিছানাপত্র গুছিয়ে রেখে জানলা বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলেন। কাজের মেয়ে অন্নদা রোজ অন্য ঘরের সঙ্গে এ ঘরটাও ঝাঁট দিয়ে মুছে দিয়ে যায়, অদিতি আর সে ঘরে ঢোকেন না। ঢুকতে পারেন না। ঢুকলেই বুকের মধ্যে অদ্ভুত কষ্ট হতে থাকে। আজ উত্তুরে হাওয়ার দাপটে সে ঘরের একটা জানলার পাল্লা কীভাবে যেন খুলে গেল। বার বার আছড়ে পড়তে লাগল ঠাস ঠাস করে। অদিতি আজ প্রায় ছ-মাস পরে সেই ঘরে ঢুকলেন জানলাটা বন্ধ করার জন্যে। বন্ধ করতে গিয়ে দেখলেন ছিটকিনিটা লাগছে না। শক্ত হয়ে আটকে আছে। ওই জন্যেই জানলাটা ঠিক করে বন্ধই হয়নি নিশ্চয়ই, আজ দমকা হাওয়ায় একেবারে খুলে গেছে।

অদিতি ছিটকিনিটা নামানোর চেষ্টা করছিলেন। হচ্ছে না। খুব শক্ত। বাইরে বেল বাজল, অদিতি জানলা খোলা রেখে বাইরে

এসে সদর দরজার চাবি নিলেন। এখন সাড়ে এগারোটা বাজে, অন্নদার আসার সময়। অদিতি বারান্দা দিয়ে দেখে চাবি ছুড়ে দিলেন, অন্নদা আঁচল পেতে লুফে নিল। এটাই এ বাড়ির চালু রেওয়াজ। অদিতি ড্রয়ার খুলে ছোটো হাতুড়ি বার করলেন, ছিটকিনিটায় গোটা কয়েক ঘা দিতে হবে। তিনি তিথির ঘরের দিকে যাচ্ছিলেন, অন্নদা দরজা খুলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'বাবা গো আজ কী পাগলা পাগলা হাওয়া ছেড়েছে দ্যাখো, এইবার শীত পড়বে। ও বউদি, এই নাও নীচে একটা চিঠি ফেলে গেছে পিওন।'

অদিতি হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিলেন। ধড়াস করে উঠল তাঁর বুক। শরীরের সমস্ত রক্ত মহাবেগে ছুটে গেল মাথায়, তারপর হুড়হুড় করে নামতে লাগল শিরদাঁড়া বেয়ে। চিঠির ওপর তাঁরই নাম লেখা। হস্তাক্ষর তাঁর চেনা, গভীর চেনা।

১০

তিথি প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিল আর চিৎকারকরছিল, নিঃশব্দে।

কপালে একটা ঠান্ডা স্পর্শ পেয়ে তার চোখ খুলে গেল। মাধুবউদির হাত। মাধবী ঝুঁকে মাথাটা তিথির মুখের কাছে নিয়ে এলেন, ‘এখন কেমন লাগছে শরীরটা? একটু ভালো?’

তিথি ঘাড় কাত করল। একটু হাসলও। মাধবী বললেন, ‘শুয়ে থাক। তোর আসলে রেস্টের দরকার। অত খাটুনি, তার ওপর আকাশপাতাল ভাবনা অত ভাববি না, মাকে চিঠি লিখেছিস, ব্যস। এবার সব মিটে যাবে।’

তিথি আবার চোখ বুজল। চোখ বুজেই মনে হল আবার সে ডুবে যাচ্ছে। ক্লান্তি, অতল ক্লান্তি। চোখ বুজেই সে শুনল, ‘ঘুমো, আমি আসছি।’ মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

এখন সকাল আর দুপুরের মাঝামাঝি একটা সময়। ঘরের জানলা বন্ধ, বাইরে খুব হাওয়া দিচ্ছে। বন্ধ জানলার খড়খড়ি দিয়ে হালকা আলো আসছে। তিথি আবার চোখ মেলে দেখল, ঘরে কেউ নেই। কারও সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না। পার্থ বেরিয়ে গেছে। অলকও অফিসে। সুধা নিশ্চয়ই রান্নাঘরে, সীমাকেও দেখা যাচ্ছে না। সীমা সকালে তার পাশে কিছুক্ষণ বসে ছিল, তিথির খেয়াল আছে। তারপরই সে আবার কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল।

...পুজোবাড়ির চাতাল। ঢাক বাজছে প্রবল শব্দে। দশমীর বিকেল। প্রতিমা নামানো হচ্ছে বেদি থেকে। একটু আগেই মাকে সিঁদুর পরানো, হাতে পানের খিলি দেওয়া ইত্যাদি হয়ে গেছে, তারপর সবাই নিজেদের মধ্যে সিঁদুর দেওয়া–দেয়ি করছেন। সবাই বলতে সবাইই। শিবানী, সুধা, দীপ্তি, সুমিতা, মল্লিকা, আরও অন্যান্য শরিকদের বাড়ির বউরা। সবার সারা চুলে কপালে নাকে

গালে আবিরের মতো সিঁদুর মাখামাখি। তিথি চাতালের একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, সিঁদুর দিতে পারেনি। তার অবশ্য সিঁদুর দেওয়ার কথা মনেও হয়নি, তার খেয়ালই ছিল না ওই বরণডালা হাতে বউদের ভিড়ে তার একজন হওয়ার কথা। বরং অবচেতনেই তার নিজেকে মনে হচ্ছিল বাল্টিদের দলে, যারা বইয়ের মধ্যে রাখার জন্যে ঠাকুরের পায়ের ফুল বেলপাতা হাতড়াচ্ছে। হঠাৎ সুমিতা তার কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'আহা রে, মেয়েটা সিঁদুর খেলতে পারল না, বিয়ের পর প্রথমবারই—'

একজন প্রায় অপরিচিতা মহিলা পাশ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুমিতার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কেন গো? ওর বুঝি—'

সুমিতা চোখ মটকালেন, চাপা গলায় বললেন, 'ওর মেনস্ হচ্ছে।'

তিথি সিটিয়ে উঠে চাতাল থেকে নীচে নেমে দাঁড়াল।

পুরোহিত লোকটির গায়ের রং বড্ড ফর্সা, ব্লটিং পেপারের মতো। শক্তপোক্ত চেহারা, মাথায় কদমছাঁট চুল। হলদে ধুতি আর নামাবলি গায়ে তিথির দিকে তাকিয়ে দাঁত বের করলেন। দাঁতগুলো পান-খাওয়া আর কালো। তিনি সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও বউদি, আপনার এই বউমাটি তো বসে বসেই কাটিয়ে দিলেন দেখলাম। আপনি আর পার্থদা সীমাদি কী খাটনিটাই না খাটলেন। বউমাটির কি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য?'

তিথি আঁতকে উঠে দু-হাতে কান চেপে ধরে ছুটতে শুরু করল। এটা কোন রাস্তা, সে কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছে না। বোধ হয় মেজোঠাকুমাদের বাড়ি যাওয়ার রাস্তাটাই হবে। কিন্তু খুব অন্ধকার। বিকেলবেলায় এত অন্ধকার তো হওয়ার কথা নয়! তিথি অন্ধের মতো দৌড়োচ্ছে, পেছনে তাড়া করে আসছে ঢাকের আওয়াজ, পুরোহিতের পান-খাওয়া দাঁতের হাসি, আরও যেন কারা কারা। তারা সবাই হা-হা করে হাসছে, একজন একজনকে বলছে, 'ওর মেনস্ হচ্ছে।' সবাই আরও হেসে উঠেছে...হঠাৎ

তিথি দেখল সামনে সেই বাছুরটা। তারও সারা কপালে সিঁদুর আর গলায় জবাফুলের মালা। বাছুরটা গম্ভীর গলায় বলল, ‘তোমার কি পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য?’

চারপাশে খুব জোরে ঢাক বেজে উঠল, কাঁসিও। এটা কি বিসর্জনের বাজনা? নাকি বলির? বলি, না বিসর্জন, ‘না বলি? তিথি চিৎকারকরে উঠল—‘না না না ওমা না, ওমা ওমা ওমা....’

কপালে তখনই একটা ঠান্ডা হাত অনুভব করেছিল সে মাধুবউদির।

সেদিন পুরোহিতমশাই এরকম বিশ্রীভাবে কথাটা বলার পর সত্যিই তিথি কান্না চাপতে পুজোবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। মেজোঠাকুমাদের বাড়ি যাওয়ার পথে একটা রোয়াকে বসে কিছুতেই না কাঁদার শপথ করছিল সে, তবু তার চোখ ফেটে জল আসছে। সে কোনো কৃতিত্ব পাওয়ার লোভে কাজ করেনি। কিন্তু তাই বলে এত বড়ো মিথ্যে অপবাদ সে সইবে কেমন করে! সুধা কিংবা আর কেউ তার প্রতিবাদও করলেন না। তিথি নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল। ওঁরা প্রতিবাদ করে কী বলতে পারতেন, তিথির পিরিয়ড হয়েছে বলে সে পুজোর কাজ করতে পারছে না? এভাবে বলা যায় না। ওই পান-খাওয়া দাঁতের কদমছাঁট পুরুতটিকে দেখে বোঝা যায় একেবারেই অশিক্ষিত। তাকে এই কথা বললে সে হয়তো আরও একরাশ কুৎসিত কথাই শুনিয়ে দেবে। ওই লোকটি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে তিথি এ বাড়িতে বলতে গেলে একটা উটকো লোক। ওপরে ওপরে। কেউ তাকে দূর দূর না করলেও ভেতরে ভেতরে কেউই যে তাকে ঠিকমতো মেনে নিতে পারেনি সবার আচরণেই এটা দারুণ স্পষ্ট। লোকটা তাই তাকে অপমান করার সাহস পেয়েছে। কেননা ও জানে ওকে কেউ শাসন করবে না, বরং মনে মনে সমর্থন আর বাহবাই দেবে। তিথি চমশা খুলে হাঁটুতে মুখ গুঁজল। পার্থর ব্যস্ততা ফুরোয়নি। সে ভাসানের বাঁশ জোগাড় করতে বেরিয়েছে। তিথি সেটা জেনেও বিড়বিড় করল, ‘পার্থ তুমি কোথায়, ওই লোকটা আমাকে শুধু শুধু কীসব বলছে। পার্থ, বলো, আমি কাজ করিনি?’

'আমি ঠিক জানতাম তুমি এখানে!'

তিথি আপাদমস্তক চমকে উঠল। সীমা হাসছিল, বলল, 'পুরোহিতমশাই একটু ঠোঁটকাটা আছেন। অমনি করে মুখ ভার করে বসে থাকতে হবে না। চলো ওঠো। ঠাকুর বেরোচ্ছে দেখবে এসো।'

পুজোর ক–টা দিন পার্থ যেন অন্য মানুষ হয়ে গিয়েছিল। কর্মব্যস্ত, দায়িত্বশীল। তাকে কাছে না পাওয়ার সমস্ত অভিমান ছাপিয়ে তিথির মনে মনে তাকে নিয়ে গর্ব হচ্ছিল। ভেতরে ভেতরে প্রবল আকর্ষণ বোধ করছিল সে পার্থর প্রতি, পার্থর আপাত-উদাসীনতা সে আকর্ষণের তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

পিরিয়ড শুরু হওয়ার পর তিথি আর পুজোবাড়িতে থাকেনি। রাত্রে সে শিবানীর পাশে শুত। বড়ো ঘরের ঢালাও বিছানার একপ্রান্তে অলক, আরেকপ্রান্তে শিবানী আর সে। সীমা অষ্টমী থেকে পুজোবাড়িতে চলে গিয়েছিল।

পুজো মিটে যাওয়ার পর সবাই বাড়িতে চলে এলে আবার শোয়ার পুরোনো ব্যবস্থাই চালু হল। তিথি পার্থর পাশে শুতে গিয়ে দেখল তার সারা শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। ঘরের আলো নিভিয়ে সুধা বিছানায় উঠলেন। তিনি শুয়ে পড়ামাত্র তিথি অনুভব করল পার্থর হাত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তীব্র ভালোলাগায় মথিত হয়ে তিথি পার্থর হাত চেপে ধরতে যেতেই তার চুড়ি ঝিনঝিন করে উঠল, তার ভয় করছিল পার্থ হুঁশ না হারায়।

বাড়ি ফাঁকা হতে শুরু করেছিল দ্বাদশীর দিন থেকে। কাকিমারা সবাই যে যার বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো করেন। চতুর্দশীর মধ্যেই সবাই ফিরে গেলেন। বাড়িতে তখন শিবানী অঘোর অসীম, আর তিথিরা। চতুর্দশীর দিন দুপুরে, বাড়িসুদ্ধ সবাই যখন ঘুমোচ্ছে, পার্থও, তিথি একা একা দাঁড়িয়ে ছিল বারান্দার কোণে, তার নিশ্বাস গরম। কাঁধে একটা হাতের স্পর্শ পেয়েই সে চমকে দেখল পার্থ দাঁড়িয়ে তার পেছনে। তিথি শ্বাস বন্ধ করে বলল, 'ঘুমোওনি?'

‘না, সবার ঘুমের জন্যে ওয়েট করছিলাম।’

তিথির বুকের ঢেঁকির পাড় পড়ছে, সে নিশ্বাসের স্বরে বলল, ‘কেন!’

‘এসো।’ পার্থ তার হাত ধরে হালকা টান দিল।

একটা ফাঁকা ঘরে দরজাবন্ধ আবছায়ায় দুজনে দুজনকে প্রাণপণে হাতড়াচ্ছিল। পার্থ মুখ দিয়ে কাতরোক্তির মতো একটা শব্দ করে বলল, ‘উহ্ কতদিন, কতদিন পর তিথি! আমাকে তুমি এত শাস্তি কেন দিচ্ছ, কেন কেন কেন, জানো আমি পাগল হয়ে গেছি, তোমাকে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাই তিথি...’

পার্থ আরও অনেক কিছু বলে যাচ্ছিল একটানা। তিথির কথা বলারও সময় ছিল না। প্রবল জাগ্রত নিজের শরীরটাকে নিয়ে সে নিজেই কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না।

লক্ষ্মীপুজোয় তিথি আবার কাজ করতে পেরেছিল। আলপনাও দিয়েছিল ছোটো করে। সীমাকে নিয়ে মনে মনে ভয় ছিল তার। দুপুরের ব্যাপারটা সীমা নিশ্চয়ই জানতে পারেনি। কিন্তু রাত্তিরে চুড়ির শব্দ শুনেছিল। তিথি আশ্চর্যই হয়ে গেল যখন সীমা তার সঙ্গে বেশ মিলেমিশেই কাজ করল। সীমার মনখারাপ সেরে গিয়েছে, কিন্তু তিথিই অযথা অপরাধবোধে আড়ষ্ট হয়ে ছিল।

লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই কলকাতায় ফিরে আসা হল। ফেরার ট্রেন ছিল রাত্রে। চলে আসার সময় সে যখন অঘোর আর শিবানীকে প্রণাম করল, অঘোর কিছু বললেন না। শিবানী চিবুক ছুঁয়ে বললেন, ‘আসছে বছর ছেলে কোলে এসো।’ তিথি একটু কুঁকড়ে গেল। অসীম সন্ধ্যে থেকেই ঘুমোচ্ছে, আসার সময় তার সঙ্গে কারও দেখা হয়নি।

ট্রেনে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিথির মনে হল, সে সত্যি সত্যি চলে যাচ্ছে। তার এই চলে যাওয়া একটা সত্যিকারের যাওয়া, চিরকালের জন্যে। আশ্চর্য, এই গভীর বিচ্ছেদবোধ তো তার মা-বাবা—নিজের বাড়ি ছেড়ে আসার সময়ও হয়নি। কত বিচিত্র স্মৃতি সে ফেলে রেখে যাচ্ছে এখানে? তিথির বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কেন তার মনে হচ্ছে ওই বাড়িতে তার আর দ্বিতীয় কোনো ফিরে যাওয়া নেই!

দেশের বাড়িতে রাঁধুনির মুখে তিথি একদিন রাত্তিরে একটা কথা শুনেছিল। রাঁধুনিটি শিবানীকে বলছিল, ‘সেই ঝিকিমিকি বেলায় উনুনে আঁচ দিইছি, আর এই সবে রান্নাবাড়া সাঙ্গ হল, গতরে আমার আর কিছু নেই।’

তিথি পার্থকে এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘ঝিকিমিকি বেলা মানে কী?’

পার্থ বলেছিল, ‘মানে হল গোধূলি, কিংবা গোধূলি আর সন্ধ্যের মাঝামাঝি সময়। ওটা এই অঞ্চলের একটা ডায়ালেক্ট। সুন্দর, না?’

হু–হু করে ফিরতি ট্রেন ছুটছে কলকাতার দিকে। তিথির মনে হল, সে পেছনে ফেলে যাচ্ছে একটা আস্ত বিচিত্র জন্ম, একটা আলোআঁধারি জ্বরের ঘোর, একটা ঝিকিমিকি বেলা।

কলকাতায় ফেরার আগে তার জ্বরের কথাটা কেউই জানতে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ট্রেনের ধকলেই হোক কিংবা অন্য কোনো কারণে, বাড়ি পৌঁছেই তিথির মনে হল সে আর দাঁড়াতে পারছে না। ঘরে ঢুকে সে দেয়াল ঘেঁষে মেঝেতে বসে পড়ল। মাধবী ঘরের চাবি দিতে নীচে নেমে এসেছিলেন। তিথিকে ওইভাবে বসে পড়তে দেখে ছুটে এলেন। তার গায়ে কপালে হাত দিয়ে আশ্চর্য হয়ে বললেন, ‘ওমা, তিথির যে গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে!’

তিথি হাঁসফাঁস করছিল। সুধা বললেন, 'আমি তখনই বলেছিলাম, ঠান্ডা জলে অত সকালে চান কোরো না, সহ্য হবে না। খাটাখাটনিও গেছে তো খুব, অত করার অভ্যাস নেই, বারণ করলেও শোনে না।'

পরের দিন সকালে তিথি বিছানাই ছাড়তে পারল না। শুয়ে থাকতে হল। খুব অস্বস্তি হচ্ছিল তার। এভাবে সারাদিন শুয়ে থাকতে গেলেও একটা মনের জোর দরকার। তিথির সেটা নেই। অনুতপ্ত অপরাধী যেভাবে প্রাণপণে নিজের অপরাধ লাঘবের চেষ্টা করে, সেভাবেই তিথি বার বার জোর করে মাথা তুলে উঠে বসার চেষ্টা করছিল। পারছিল না। মাথায় যেন একটা দশমনি পাথর বাঁধা।

অলক ঘরে উঁকি দিলেন। তিথি টের পাচ্ছিল অলক ঘরের বাইরে সরে গিয়ে চাপা গলায় বলছেন, 'ও সীমা, কী হয়েছে রে তিথির?'

'জ্বর হয়েছে, শুনলে তো কাল!' সীমার গলায় ঈষৎ বিরক্তির আভাস, 'তুমি ওরকম চোখ কপালে তুলছ কেন?'

'তোর দাদাকে বল একটা ডাক্তার–টাক্তার দেখাতে।' অলক চাপা গলাতেই উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'মেয়েটাকে এনে তো তুলল এখানে, একটা হুঁশগম্যি বলতে তো কিছু নেই।'

'ও সব কথা আমায় বলছ কেন?' সীমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'মিছিমিছি হাঁকপাক কোরো না তো বাবা! ওর জ্বর হয়েছে, আমরা ওকে দেখছি। মিটে গেল!'

কথাগুলো আসছিল প্যাসেজ থেকে। তিথি লজ্জায় মরে যাচ্ছিল। ওহ্ ভগবান। সে কী বিশ্রীভাবেই না ঘর জুড়ে শুয়ে রয়েছে এখানে। না, আজ জোর করে উঠে মাথায় জল দিয়ে কিছু খেলেই সে ঠিক হয়ে যাবে।

পার্থ পাশের ঘরে বসে চা খাচ্ছে। তিথি আস্তে আস্তে সেখানে গিয়ে দাঁড়াতেই পার্থ ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ বিচ্ছিন্ন করে বলল, 'এই তো, উঠেছ? চা খাবে?'

'নিজের বউয়ের সঙ্গে ভদ্রতা করছ নাকি?' তিথি হাসল, 'আমি কি চা খাই?'

পার্থ হাত বাড়িয়ে তার হাতটা ধরার চেষ্টা করে বলল, 'দেখি? এখন বোধ হয় জ্বরটা আর নেই, না?'

তিথি এ কথার কোনো উত্তর দিল না। পার্থকে তার হাত ছুঁতেও দিল না। দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বড়োমা রান্নাঘরে? বড়দি কই?'

'সীমা কলতলায়, জল ভরছে। কেন?'

'বড়দি সকালে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল।' তিথি একটু থামল। তার মাথা ভার লাগছে। দরজার পাল্লায় মাথা ঠেকিয়ে বলল, 'তুমি তো আমার কাছে একটুও বসলে না!'

'বসেছিলাম তো! তুমি ঘুমোচ্ছিলে বলে বুঝতে পারোনি।'

'আমি শুয়েছিলাম, একটুও ঘুমোইনি।' তিথি বড়ো করে শ্বাস ফেলল, হলকার মতো গরম। খুব ভরসা হারা গলায় বলল, 'তুমি আমার কাছে একটু থাকলেই আমি ঠিক হয়ে যাব, আমার খুব শরীর খারাপ লাগছে।'

পার্থ উঠল। চায়ের কাপটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে বলল, 'চলো যাচ্ছি। আমাকে একটু পরেই বেরোতে হবে—'

তিথি খুব ছেলেমানুষি কান্নার সুরে বলল, 'কোঁথায় যাবে? না প্লিঁজ...'

'একটা এডিটিং আছে, সোনা। কলকাতায় ফিরেই যোগাযোগ করার কথা। মনে হয় কাজটা পেয়ে যাব। এমনি করে না, চলো শোবে।'

তিথি পার্থর গায়ে ভর দিয়ে এগোচ্ছিল। এক ঘর থেকে প্যাসেজ দিয়ে অন্য ঘরে। অলক কলতলার দিকে থেকে ছুটে আসছিলেন। রোজ অফিসে বেরোনোর আগে তিনি এরকম ছোটেন। কিছুতেই তাঁর সময়ের মধ্যে স্নান-খাওয়া সারা হয় না। কলতলা থেকে স্নান সেরে ভিজে লুঙ্গি ভাঁজ করে পরে আজও তাই অলক দৌড়ে দৌড়ে আসছিলেন, উপরন্তু তাঁর শীতও করছে। তিথি আর পার্থকে দেখে তিনি থমকে গেলেন।

'জ্বর কত?' প্রশ্নটা তিথিকে নয়, পার্থকেই করলেন অলক। পার্থ তিথির পিঠ বেড় দিয়ে ধরে রেখেছে। তিথি তার কাঁধ থেকে মাথা তুলে সোজা হওয়ার চেষ্টা করল।

অলক সরুচোখে তিথিকে একবার দেখে নিয়েই পার্থর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকালেন, 'ওর জন্যে একটা ডাক্তার-টাক্তারের ব্যবস্থা কর বলে দিচ্ছি!' তাঁর গলায় শাসানির সুর।

তিথি মরমে মরে যাচ্ছিল। অলক এরকম হঠাৎ বিনা কারণে বকাবকি শুরু করে দেবেন সে ভাবেনি। নিজের কাঁধ থেকে পার্থর হাত নামিয়ে দিতে দিতে বলল, 'আমার বেশি জ্বর হয়নি বাবা—'

অলক তিথির দিকে তাকালেন না। পার্থকেই জ্বলন্ত চোখে দেখতে দেখতে বললেন, 'হুঁ, বিয়ে করেছে!'

অশান্তির গন্ধ পেয়ে সুধা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। অলকের ভাত বাড়ছিলেন তিনি। তাঁর ডান–হাতে একথাবা আলুভাজা, বাঁ–হাতে একটা বাটি। এ বাড়িতে হাতা চামচের ব্যবহার প্রায় নেই। হাতে করেই পাতে তরকারি-টরকারি দেওয়া হয়। সুধা উদ্বেগের গলায় বললেন, 'কী হয়েছে, কী বলছ কী তুমি?'

তাঁর প্রশ্নের উদ্দেশ্য অলক। সুধার গলা পেয়ে অলক দ্রুতপায়ে ঘরে ঢুকে গেলেন। পার্থ হঠাৎ বড়ো গলায় বলল, 'সকাল থেকে তুমি এক কথা বলে যাচ্ছ কেন বলো তো? তুমি কি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছ? তোমার ধারণা আমার কাছে ডাক্তার দেখানোর পয়সা নেই!'

অলক ভিজে লুঙ্গির ওপরে শার্ট গলাতে গলাতে ধমকে উঠলেন, 'যা যাঃ, চ্যালেঞ্জ! খালি বড়ো বড়ো কথা। পয়সার কথা বলতে লজ্জা করে না তোর? খাস তো বাপের পয়সায় ভাত, আবার বড়ো বড়ো কথা।'

পার্থ আবার কী উত্তর দিতে যাচ্ছিল, তিথি মরিয়া হয়ে তার হাত চেপে ধরল, 'না! প্লিজ!'

সুধা চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমার অত কথার কী আছে বলো তো? সবসময় অশান্তি করার চেষ্টা! তিথির জ্বর হয়েছে, কী করতে হবে সে আমরা বুঝব। ভাত দিয়েছি খাবে এসো।'

অলকের শার্টপ্যান্ট পরা হয়ে গিয়েছিল। তিনি ছুটে ছুটে এসে ভাত খেতে বসলেন। পার্থ খচমচ শব্দ করে চপ্পলে পা গলাচ্ছিল। সে কাঁধে ঝোলা নিয়ে তৈরি। তার রাগের হাবভাব দেখে অলক নাক দিয়ে আবার শব্দ করলেন, 'হুঁ!'

সুধাও পার্থকে দেখছিলেন, বলে উঠলেন, 'বেরোচ্ছিস নাকি? খেয়ে গেলি না? কখন ফিরবি?'

পার্থ সুধার দ্বিতীয় প্রশ্নটিরই অপেক্ষায় ছিল। বাকি প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর না দিয়ে সে বলল, ‘এসব কথা শোনার পর খাওয়ার আর ইচ্ছে থাকে!’ ঘটাং করে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে। সুধা সেদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা নিশ্বাস ফেলে তিথির দিকে চোখ ফেরালেন। তিথি ভয়ে ভয়ে বলল, ‘আমি স্নান করে আসি বড়োমা? স্নান করলেই শরীরটা একটু ভালো লাগবে।’

সুধা কোনো জবাব দিলেন না।

পার্থ বলেছিল মাধুবউদি তাদের কেউ হন না। কিন্তু তিথি দেখেছে, মাধবী যেন এই পরিবারেরই একজন। ওপরের তলায় স্বামী আর ছোটো মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। সংসারের কাজকর্ম সেরে তিনি অনেকটা সময়ই নীচে থাকেন। বিশেষ করে সকালে তাঁর স্বামী অফিসে আর মেয়ে স্কুলে বেরিয়ে যাবার পর। সলিল ফেরেন রাত করে, রুম্পা সন্ধ্যেবেলায় পড়ে। সেই সময়টাতেও মাধবী নীচে নেমে আসেন। মাধবী বেশ গুছিয়ে সংসার করতে জানেন। তিথি ওঁদের ঘরে গিয়ে দেখেছে, খুব সাধারণ জিনিসপত্রই এমনভাবে রাখা, যাকে তার মায়ের ঘর সাজানোর মতো নিপুণ সুন্দর হয়তো বলা যাবে না, কিন্তু তার মধ্যেই একটা গৃহস্থালির শ্রী ফুটে বেরোয়। নিজের অজান্তেই মনে মনে তুলনা করে ফেলে তিথি। অন্য কিছু নয়, তার মনে হয় একতলায় তাদের ঘরে যেন এই গৃহস্থ শ্রীরই বড়ো অভাব। সব কিছু এত এলোমেলো, স্তূপাকার করে রাখা যে তার মধ্যে আবদ্ধ থেকে তিথির স্নায়ু পীড়িত হতে থাকে। সে প্রাণপণে গোছাতে চায়।

এখানে কোনো আলমারি নেই। জামাকাপড় আলনাতেই স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়। বাইরে পরার একটু ভালো কাপড় বেশিরভাগই কেচে ভাঁজ করে বিছনার তলে পাতিয়ে রাখা থাকে, আর যেসব পোশাক না পরে পরেই পুরোনো হয়ে যায়, সেগুলো থাকে দু-তিনটে বাক্সের মধ্যে বন্দি। তিথি সেদিন আলনা নিয়ে পড়ল। সারা দুপুর ধরে আলনা গোছাল। একটা একটা করে প্রতিটি কাপড় ভাঁজ করে থরে থরে সাজিয়ে রাখল পরিষ্কার করে। বাড়িতে থাকতে মায়ের তাড়নায় সে মাঝে মাঝে

টুকটাক কাজকর্ম করতে বাধ্য হত। সবসময় ইচ্ছে করত না, মায়ের ওপর রাগও হত। তবু অদিতি জোর করে তাকে দিয়ে নানানরকম কাজ করাতেন, এটা–ওটা রান্না করাতেন। তিনি বলতেন, 'কাজ জানলেই তুমি স্বাধীন থাকতে পারবে, অন্যের ওপর নির্ভর করতে হবে না। কাজ জানা মানে একটা আত্মবিশ্বাস, একটা তৃপ্তি।' আজ সেই সবই মনে পড়ছিল তিথির। আর মন খুঁতখুঁত করছিল—কিছুতেই মায়ের মতো হচ্ছে না কেন! অবশেষে সে যখন মোটামুটি নিজের কাজে সন্তুষ্ট হল, ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সুধা ঘুমাচ্ছেন। সীমা তাঁর পাশে শুয়ে মাধবীর কাছ থেকে নিয়ে আসা সানন্দার পাতা উলটাচ্ছে। তিথি ফিসফিস করে বলল, 'বড়দি, দ্যাখো গুছিয়েছি।'

সীমা একঝলক তাকিয়েই বলল, 'ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু কিছু তো খুঁজে পাওয়াই যাবে না।'

'কেন বড়দি?' তিথি একটু আহত।

'এমন গুছিয়েছ যে কোনটা কার তলায় দেখাই যাচ্ছে না।' সীমা বই বন্ধ করে হাই তুলল, বলল, 'এবার একটু শুয়ে নাও। আজ তোমার জ্বর আসেনি তো?'

সন্ধ্যেবেলা মাধবী এসেই হইচই করে উঠলেন, 'ওমা! এ নিশ্চয়ই তিথির কাজ। কেমন ঝরঝরে লাগছে আলনাটা। যাক এবার দিদিভাই আর সীমার অনেক কাজ হালকা হবে।'

সীমা ওপরের ঘরে রুম্পাকে পড়াচ্ছে। সুধা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বললেন, 'মাধু রান্নাঘরে আসবে? সীমার খিচুড়িটা বসিয়েছি। আমায় একটু এদিকে থাকতে হচ্ছে।'

মাধবী সেদিকে যাওয়ার তেমন গা দেখালেন না। খাটের ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে গলা তুলে বললেন, 'ও, আজ সোমবার,

না? সীমা উপোস করে যাচ্ছে, কবে যে ওর বিয়েটা লাগবে। দমদমের সম্বন্ধটা কী হল গো দিদিভাই?'

সুধা রান্নাঘর থেকেই বললেন, 'ও হবে না। ছেলে বড্ড বেঁটে, সীমার পছন্দ নয়।'

মাধবী তিথির দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'সীমা খুব ভুল করছে, জানিস তো! বার বার সম্বন্ধ বানচাল করা কোনো কাজের কথা নয়। মা-বাবা ক–টা সম্বন্ধ আনবে? আমি দুটো এনেছিলাম, রীতিমতো ভালো, সীমাকেও তারা পছন্দ করেছিল। সীমাই রাজি হল না। একজনের বয়েস চল্লিশ বলে, আর একজন দূরে থাকে বলে, বরোদায়। বল তো, এরকম করলে চলে!'

তিথির এ বিষয়ে কোনো কথা বলা সাজে না, সে চুপ করেই থাকল। তারও আজকাল মনে হচ্ছে সীমার এমন করাটা ঠিক যুক্তিযুক্ত নয়। সীমা প্রতি সোমবার সারাদিন উপোস করে থাকে, শিবপুজো করে একেবারে রাত্তিরে সুজির খিচুড়ি খায়। তার বিশ্বাস, এত নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপুজো করলে তার পছন্দসই বর হবে। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হচ্ছে না তার, এদিকে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। যদিও, তিথি এ বাড়িতে এসে দেখেছে পার্থরা সবাই খুব জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। সুধা প্রায়ই এক জ্যোতিষীর বাড়িতে যাতায়াত করেন। সেই জ্যোতিষী নাকি বলেছেন সামনের শ্রাবণে সীমার বিয়ে হয়ে যাবে। তিথির হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যেতে সে বলল, 'মাধুবউদি, বড়দির বোধ হয় এই শ্রাবণেই বিয়ে হবে।'

'ধ্যুৎ, ছাড় তো!' মাধবী বিরক্তির সঙ্গে হাতঝাড়া দিলেন, 'ওই জ্যোতিষী বলেছে তো? শুনেছি, এ উনি গত পাঁচ বছর ধরে বলে যাচ্ছেন। তবু দিদিভাই এসব কথায় বিশ্বাস করে।' মাধবীর ঘাড়ের কাছে একটা মশা বসেছিল। সন্ধ্যেবেলা দরজা জানলা বন্ধ করে দিলেও কোত্থেকে যে এত মশা ঢোকে তিথি ভেবে পায় না। মাধবী মশাটাকে সপাটে মারতেই তাঁর এলো খোঁপা খুলে গেল। সেটা হাতে জড়িয়ে বাঁধতে বাঁধতে তিথির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোর শরীর কেমন?'

'ভালো না, মাধুবউদি! জ্বরটা হয়েই যাচ্ছে।'

মাধবীর মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল, 'এটা ঠিক ভালো ঠেকছে না, ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া নয় তো? এখানে যা মশা! তোর বোধ হয় একবার ডাক্তার দেখানোই দরকার, বুঝলি?'

তিথি বিপন্ন মুখে বলল, 'না না, ম্যালেরিয়া নয়। আমার তো জ্বর হয়েছে বর্ধমানে গিয়ে। ডাক্তার দেখানোর দরকার নেই। এটা এমনিই—'

মাধবী ভুরু কুঁচকালেন, 'বর্ধমানে গিয়ে মানে? কবে থেকে জ্বর হচ্ছে ঠিক করে বল তো!'

তিথি ধরা পড়ে যাওয়া মুখে ঠোঁট কামড়াল, বলল, 'পুজোর আগে থেকে কিন্তু এটা সত্যিই ডাক্তার দেখানোর মতো কিছু না।'

মাধবী একটুক্ষণ স্থির চোখে তিথির দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা। সে আমি বুঝব।'

তিথির অসহায় লাগছিল। কেন সে খামোখা বলতে গেল মাধুবউদিকে জ্বরের কথাটা! অনেকদিন ধরেই জ্বরটা চলছে তার, এটা ঠিকই। তার মনে ভয়ও ঢুকেছে। শরীর দিন দিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে, মুখে প্রচণ্ড অরুচি। আর জ্বর এলে তো কথাই নেই, মাথা তোলার শক্তি থাকে না। সেসময় সে একাই শুয়ে থাকে। সীমা মাঝেমধ্যে কাছে এসে বসে। সুধাও গায়ে কপালে হাত দিয়ে দেখে যান। অলককে আর কিছু বলতে শোনেনি তিথি। পার্থ তো অসম্ভব ব্যস্ত। একটা কাজ পেয়েছে সে। তিথি এ বাড়িতে আসার পর এই প্রথম পার্থ কাজ পেল। টানা এডিটিং চলছে সাত-আটদিন ধরে। তিথি তার শারীরিক অবস্থার কথা পার্থ ছাড়া কাউকেই মুখ ফুটে বলেনি, বরং এমন ভাব করেছে যেন তার কিছুই হয়নি, এরকম তার প্রায়ই হয়। সে মনে মনে অপেক্ষা করছিল পার্থর কাজটা শেষ হওয়ার জন্যে। কাজ শেষ হলে নিশ্চয়ই টাকা পাবে সে। তিথি সেদিন অবধিই অপেক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর হল কই। মাধুবউদির কাছে কাঁদুনি গেয়ে বসল সে। তিথি নিজেকে ধিক্কার দিচ্ছিল।

'একটা কথা তোকে বলি শোন। তোর বাপের বাড়িতে ফোন আছে?'

তিথি হঠাৎ মাধবীর প্রশ্নের কোনো থই পাচ্ছিল না। মাথা নেড়ে বলল, 'ফোন? না। কেন!'

'তাহলে একটা চিঠিই লেখ, মাকে।' মাধবী খুব নরম গলায় বললেন, 'তোর বিয়ের কথাটাই তো মা জানে না, তাই না? সব লিখে দে। আর, মা-বাবাকে বিজয়ার প্রণামটাও তো জানাতে হয়।'

তিথি মুহূর্তের মধ্যে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মুখে আঁচল চেপে ধরে কান্নার দমকে ফুলতে লাগল সে। মাধবী কোনো সান্ত্বনা দিলেন না। অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'তোর রোগের গোড়া কোথায় আমার কি আর জানতে বাকি আছে রে!'

মাধবীই তিথিকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। তিথির আপত্তি কানে না তুলে। সুধা কিছু বললেন না। পার্থ অম্লানমুখে বলল, 'মাধুবউদি, আমি শোধ করে দেব।'

তার কথাটা তিথির কানে এমন খট্‌ করে লাগল যে সে পার্থর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল, তার চোখে বিস্ময় আর অবিশ্বাস মাখামাখি। পার্থ মাধবীর দিকে তাকিয়ে তখনও বলছে, 'তুমি ফিজ আর ওষুধের দামটা মিলিয়ে আমায় হিসেবটা বোলো—'

'যা তো, বকিসনি। তিথি আমার বোন জানিস?' মাধবী মুখঝামটা দিলেন, 'এ জগতে যারাই ভালোবেসে ঘর ছেড়ে আসে তারা সবাই সবার বোন, বল তিথি?'

ডাক্তার তিথিকে ভালো করে দেখে ধমক দিলেন একেবারে খাওয়া-দাওয়া না করার জন্যে। তার নাকি যথেষ্ট রক্তাল্পতা হয়েছে। জ্বর যেটা হচ্ছে সেটা ভাইরাসের সংক্রমণ। শরীর দুর্বল হলেই এটা চেপে ধরে। ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করতে বললেন তিনি,

আর বিশ্রাম নিতেও। এ দুটিই প্রধান ওষুধ একথা বলেও আরও গোটা তিনেক ওষুধ খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তার একটা বোধ হয় ঘুমের ওষুধ। তার পর থেকেই তিথি ঘুমোচ্ছে।

ঘুমের মধ্যেই অনবরত চলেফিরে বেড়াচ্ছে তার মন। বর্ধমানের দেশের বাড়ি থেকে তার ছেড়ে আসা মায়ের বাড়ি। তীব্র বিপরীত টুকরো টুকরো ছবিতে সংঘর্ষ হয়ে বার বার ফুলকি ঠিকরে উঠছে তার বন্ধ চোখের অন্ধকার দেওয়ালে।

মা এতদিনে নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন তার চিঠি? ডাইনিং টেবিলের পাশে মায়ের প্রিয় সেই জানলাটার ধারে দাঁড়িয়ে মা নিশ্চয়ই অনেকবার উলটেপালটে পড়ছেন চিঠিটা? বেশি কিছু অবশ্য লেখেনি সে। প্রণাম জানিয়েছে মা-বাবা-দাদাকে। আর জানিয়েছে রেজিরি কথা, তার এ বাড়িতে থাকার কথা। না, তার অসুস্থতার কথা জানায়নি সে। লিখেছে, ‘আমি ভালো আছি, খুব ভালো।’

পার্থই ইনল্যান্ড কিনে এনে দিয়েছে তাকে। পার্থই পোস্ট করে দিয়েছে চিঠিটা। তিথির মাকে চিঠি লেখার কথা এ বাড়িতে সবাই জানে। সীমা বলেছিল, ‘তোমার মা খুব রাগি, না? আমারই ভয় করছে। চিঠিটা পেলে উনি নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন।’

ইনল্যান্ডটা পার্থর হাতে দেওয়ার আগের মুহূর্তে একবার দ্বিধা করেছিল তিথি। তারপর চিঠিটার উলটোপিঠে এবাড়ির ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিল। দেখে পার্থ হাসল, সামান্য বাঁকা একচিলতে হাসি। বলল, ‘ঠিকানা দিচ্ছ? তোমার মা যদি এসে তোমাকে নিয়ে যান?

তিথি পার্থর চোখের দিকে তাকিয়ে হেসে হেসেই বলল, ‘ভয় পাচ্ছ নাকি? ভয় পেয়ো না। আমি এখানে চলে আসার দিনই মা সমস্ত বুঝতে পেরেছিলেন। মা জানেন জোর করে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে দিয়ে কিছু করানো যায় না!’

মাধুবউদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল তিথি। মাধবী বলে গেছিলেন, ‘মাকে চিঠি লিখে দিয়েছিস,

এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।' তিথি দেখল মাধুবউদির সেই কথা থেকে শব্দগুলো কেঁপে কেঁপে ভেঙেচুরে একটা গান হয়ে গেল। গানটা যে ঠিক কোন গান, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে, সুরটা একেকবার ধরা দিয়েই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। তিথি গানটার পেছনে পেছনে ডুবতে শুরু করল, গভীরে, আরও গভীরে। সেই যেখানে তার ছোটোবেলায় মা বসে আছেন প্রিয় জানলাটার পাশে, কোলে খোলা গীতবিতান। তিথি বহুদিন পর মায়ের গলার গান শুনতে পাচ্ছিল, গানটাকেও ক্রমশ চিনতে পারছিল সে। ছোটোবেলা থেকে যে যে রবীন্দ্রসংগীতগুলো মায়ের মুখে শুনতে শুনতে সে বড়ো হয়েছে এ তো তাদেরই মধ্যে একটি। চিত্ত পিপাসিত রে...। তিথি মায়ের সঙ্গে গলা মেলাল।

১১

কালীপুজো কেটে যেতেই হঠাৎ করে শীত পড়ে গেল।

রান্নাঘরটা দিনেও বেশ অন্ধকার। আর মশাও খুব। তিথি বঁটি পেতে সুস্থির হয়ে বসতে পারছিল না। সুধা কড়ায় খুন্তি নাড়ছেন। তাঁকেও মশা কামড়াচ্ছে নিশ্চয়ই, তবে তাঁকে দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মশার কামড় সহ্য করাও একটা অভ্যাসের ব্যাপার। সুধা তিথির দিকে তাকালেন, ‘খুব মশায় ধরেছে, না? ঢেকে বোসো।’

তিথি তরকারি কুটছিল। জ্বর থেকে ওঠার পর সে সবসময়ই সীমার একটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকে। চাদরটা আধা সুতি আধা পশম। প্রথম শীতের পক্ষে বেশ আরামদায়ক। এখনও সেটাই তিথির গায়ে জড়ানো। কিন্তু হাত বের করে তরকারি কুটতে গেলে চাদরটা গলার কাছে উঠে এসে শরীরের অনেকটা অংশই আলগা হয়ে যাচ্ছে। মশাও কামড়াচ্ছে সেখান দিয়ে, শীতও ঢুকছে।

আলু কাটার পর টুকরোগুলো জলে ভিজিয়ে রাখতে রাখতে তিথি জিজ্ঞেস করল, ‘বড়োমা বেগুনগুলো কি কুচি কুচি হবে? না একটু বড়ো?’

‘না ওই কুচি কুচিই করো।’ সুধা কড়ায় জল ঢাললেন। সামান্য ছ্যাঁক করে উঠেই তেলটুকু মিইয়ে গেল।

সীমা রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, ‘মা! আমার বোরোলিনটা কোথায় রেখেছ, পাচ্ছি না!’

সুধা ঘাড় ঘোরালেন, ‘আমি কী করে বলব। দ্যাখ গে যা বালিশের ফাঁকেটাকে ঢুকে বসে আছে কি না।’

সীমা রোজ রাত্রে বোরোলিন হাতে নিয়ে শোয়। শুয়ে শুয়ে ঠোঁটে কনুইয়ে বোরোলিন মাখে। তিথি ভাববার চেষ্টা করছিল। আজ সকালে সে-ই বিছানা গুছিয়েছে। মনে হচ্ছে যেন বোরোলিনের টিউবটা সে দেখেছিল। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওটা ড্রেসিং টেবিলের ওপর রেখেছি বড়দি, সকালে বিছানা তুলতে গিয়ে পেয়েছিলাম।'

সীমা কোনো উত্তর দিল না। চলে গেল। তার মুখ থমথমে। বিশেষ কোনো কারণে নয়। তার আবার মনখারাপ। তিথি খেয়াল করে দেখেছে, সীমার মোটামুটি পনেরো–কুড়ি দিন অন্তর এরকম মনখারাপ চলে। এ সময়টায় সে বাড়িতে সুধা ছাড়া কারও সঙ্গে কথা বলে না।

অলক কলতলায় তাড়াহুড়ো লাগিয়েছেন। খালি গায়ে তেল চাপড়াতে চাপড়াতে গলা ছেড়ে বলছেন 'জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় শ্রীরা—মকৃষ্ণ।' সেটা শুনতে শুনতে তিথির মনে হচ্ছিল যেন একজন পেস বোলার বল করছে। অলক 'জয় গুরু জয় গুরু' বলছেন খুব দ্রুত তিন-চারবার, যেন বোলারটা ছুটছে, তারপর খুব জোরে আর টেনে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' বলার সঙ্গে সঙ্গে হাত ঘুরিয়ে বলটা ছুড়ে দিচ্ছে সে। দৃশ্যটা কল্পনা করে তিথির হাসি পেয়ে গেল। শীতকাল ছাড়া অলকের এত ধর্মনিষ্ঠা দেখা যায় না। নামের জোরে শীত কাটে।

রান্নাঘরে আসার আগে তিথি দেখেছে পার্থ কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আজকাল সে আবার কর্মহীন। কাজ না থাকলে পার্থর ঘুম থেকে ওঠার কোনো তাড়া থাকে না। যখন ইচ্ছে ঘুম থেকে উঠে সে কোনো কোনোদিন বেরোয়, কোনো কোনোদিন বাড়িতেই থাকে।

সীমা রান্নাঘরের দরজা থেকে সরে যাওয়ার পরেই পার্থর গলা পাওয়া গেল, 'এককাপ চা পাওয়া যাবে নাকি রে?' প্রশ্নটা সীমাকে। সীমার কোনো উত্তর শোনা গেল না। পার্থ রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে বলল, 'সীমার ইঞ্জিন আবার বিগড়েছে?'

'বিগড়াক, তোর তাতে কী?' সুধা ধমকালেন, 'ওকে ওর মতো থাকতে দে, পেছনে লাগার দরকার নেই।'

'পেছনে লাগিনি তো? চা চাইছিলাম। হবে না?'

'দাঁড়া বাবা। এখনও ভাত-তরকারি নামেনি। তোর বাবার চান হয়ে গেল। হাত খালি হলে দিচ্ছি।'

তিথি মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আমি দেব–খন, বড়োমা।'

পার্থ হাসি হাসি মুখে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'তিথি তাহলে তোমার সঙ্গে বেশ কাজ–টাজ করছে, না মা?'

সুধা ভাতের হাঁড়ি নামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, উত্তর দিলেন না। তিথির খুব রাগ হচ্ছিল। সে কাজ করবে না তো কী? তাতে পার্থর অত গদগদ হওয়ার কী আছে। বিরক্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'যাও, আমি চা দিয়ে আসব।'

তিথি সকালে উঠে দু–ঘরের বিছানা গোছায়। সে এক জটিল কাজ। শীতকালে বিছানায় কাঁথা-চাদরের সংখ্যা বাড়ে। সেসব নিপুণভাবে ভাঁজ করে, মশারি ভাঁজ করে এক পাশে গুছিয়ে রাখে সে। বালিশ ঝেড়ে পর পর গুছিয়ে রেখে বিছানার চাদর টানটান করে গুঁজে দেয়। সুধা তখন পুজো নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তিথি বিছানা তুলে বাথরুমে যায়। সুধা সকালে কাপড় ছেড়ে কেচে রাখেন। মুখচোখ ধুয়ে তিথি বারান্দায় সেই শাড়িজামা মেলে রান্নাঘরে ঢোকে। সকালে একপ্রস্থ চা হয়। চা খেয়ে অলক বাজারে যান। বাজার এলে রান্না চাপে। সুধাই রান্না করেন, তিথি কুটনো কোটে, রান্নার জোগাড় দেয়। সীমাকে সকালের কাজে আজকাল পাওয়া যায় না। সে নতুন কয়েকটা টিউশনি ধরেছে, দু-তিনজন ছেলেমেয়ে বাড়িতে পড়তে আসে সকালে। সীমা রোজ ন–টা সাড়ে ন–টা অবধি তাদের পড়ায়। সেইজন্যে কলতলায় সকালের জল ভরাটাও এখন তিথির কাজ। বিকেলেও বেশিরভাগ দিন সে-ই জল ভরে। সকালের রান্না সারা হয়ে গেলেও সে বসে থাকতে পারে না। ছটফট করে কাজ খুঁজে বেড়ায়।

খুঁজেপেতে ময়লা কাপড় কাচে। ঘরদোর ঝেড়েঝুড়ে সাফ করে। এখানে ঘর ঝাড়া অবশ্য খুব ঝঞ্ঝাটের কাজ, ঝাড়তে গেলেই দেওয়ালের ড্যাম্প-লাগা চুন ঝরে পড়ে ঝুরঝুর করে। ঘর গুছিয়েও কূল পাওয়া যায় না। গোছানো আলনা একবেলার মধ্যেই একাকার হয়ে ওঠে। পার্থর টেবিলে কাগজপত্রে জঙ্গল হয়ে আছে তবু পার্থ সেখানে হাত দিতে দেবে না। তাতে নাকি বহুমূল্যবান কাগজপত্র হারিয়ে যেতে পারে। তিথি জোর করে টেবিল গোছালে পার্থ বিরক্ত হয়, দু-দিনে আবার টেবিলটাকে পুরোনো চেহারায় ফিরিয়ে আনে। তিথি দেখেছে, এখানে আসলে কারোরই ঠিক জিনিসটা ঠিক জায়গায় রাখার অভ্যাস নেই। অলকের ছাড়া জামা লুঙ্গি যত্রতত্র ঘরের মাঝখানে পড়ে থাকে, যতক্ষণ না তিথি সেটা তোলে। পার্থর ঝোলা, সীমার চুলের ফিতে, সেলাইয়ের বাক্স, জলের গ্লাস, মুড়ির বাটি সবই এখানে-ওখানে ছড়িয়ে পড়ে থাকে, যেন কোনো কিছুই রাখার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। ফেলে রাখলেই হল। তিথি সারাদিন সেসব কুড়িয়ে কুড়িয়ে গুছিয়ে বেড়ায়।

সন্ধ্যেবেলা মাধবী ছাড়াও পাড়ার অন্য অন্য মহিলারা প্রায়ই গল্প করতে, খবরাখবর সংগ্রহ করতে আসেন। তিথি দেখেছে, সুধা, সীমা বা মাধবী কেউই ঠিক এঁদের সঙ্গে খুব একটা গল্পে যোগ দিতে পারেন না, বেশিরভাগ সময়ই শোনেন। সীমা প্রায়দিনই সন্ধ্যেবেলা দোতলায় রুম্পাকে পড়াতে যায়, আড্ডাতে খুব একটা থাকে না। মাধবী যাও-বা একটু কথা বলেন, সুধার গলা একেবারেই পাওয়া যায় না। আসলে পাড়ার ওই মহিলারা নিজেদের তাগিদেই খবর আহরণ এবং বিতরণ করতে আসেন। খবর বলতে পাড়ায় কার ছেলে বিয়ের পর মা-বাবাকে দেখে না, কোন কর্তা-গিন্নিতে তুমুল ঝগড়া হয়েছে, কোন মেয়েকে কার সঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে এইসব। সুধা বা মাধবীর সম্ভবত এসব খবরে খুব উৎসাহ নেই, কিন্তু পাড়াতে থাকতে গেলে পাঁচজনের সঙ্গে এইসব গল্পে যোগও দিতে হয়। এতদিন এ বাড়িতে পাড়ার লোকেদের কৌতূহল ও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল তিথি। এখন ধাতস্থ হওয়ার পর সেই উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়েছে। পাড়ার কেউ এলে তিথি আজকাল সে ঘর মাড়ায় না। তার মনে হয়, এই পাড়াটা বেশ একটু গ্রাম্যধরনের। সে ছোটোবেলা থেকে যে পাড়ায় বড়ো হয়েছে সেটা এর তুলনায় অনেক আধুনিক আর মার্জিত। সেখানে এরকম আড়ালের অভাব নেই।

যে যে সন্ধ্যেতে বাড়িতে এরকম আড্ডা জমে তিথি সেদিন পাশের ঘর থেকে বেরোয় না। অলক তক্তপোশে শুয়ে শুয়ে টিভি দেখেন। আর তিথি মেঝেতে শতরঞ্জি পেতে হয় ইস্ত্রি করে, নয়তো খুঁজেপেতে ছেঁড়া জামা সেলাই করে, বোতাম পরায়। অলক সাধারণত তার সঙ্গে কোনো কথা বলেন না, টিভি দেখতে দেখতে ঝিমুনি আসে তাঁর, তিনি ঘুমিয়েই পড়েন। পাড়ার লোকেরা চলে গেলে তিথি সুধার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে যায়। কোনো কোনো দিন সে আটা মেখে বেলে দেয়, সুধা সেঁকেন। কোনোদিন সুধা রুটি বেলেন, তিথি সেঁকে।

তিথি প্রতিমুহূর্তে পাগলের মতো খোঁজে এর পরে আর কী করা যেতে পারে। কী করে এই সংসারে সে নিজেকে আর একটু প্রয়োজনীয় করে তুলতে পারে সবসময় তার সেই চেষ্টা। এ বাড়িতে তার আশ্রয়ের বিনিময়ে নিজের পরিশ্রম আর মনোযোগ নিঃশেষে দিতে চায়। পার্থর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কিন্তু তিথি তাদের দুজনের অপমানিত অবস্থানের লজ্জায় প্রতিপদে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। পার্থর অযোগ্যতাটুকু সে প্রাণপণে পুরিয়ে দিতে চায়, যেন এই পরিবারে তার অনাহূত অন্তর্ভুক্তির প্রায়শ্চিত্ত করছে।

দুপুরে সুধা ঘুমিয়ে পড়লেন। সীমা একটু আগেই ওপরে মাধবীর কাছে গেছে। পার্থ আজ বেরোয়নি। টিভিতে ক্রিকেটম্যাচ দেখছে। তিথিরও চোখ টিভি-র দিকে, তবে তার মন খেলার দিকে নয়। সে ভাবছিল, পার্থ ক–দিন আগে যে কাজটা করল, সেটায় টাকাপয়সা কিছু পেল কি না জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু সংকোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিল না।

পার্থ তক্তপোশে কাত হয়ে শুয়ে টিভি দেখছে, তিথি তক্তপোশে হেলান দিয়ে মেঝেতে বসে। পার্থ ডাকল, ‘এই, ওপরে উঠে এসো না।’

তিথির চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেল। সে পার্থর দিকে তাকিয়ে দুষ্টুমির হাসি হাসল, ‘ইশ্‌, তোমার মতলব কী?’

পার্থ উপুড় হয়ে শুয়ে তিথির ঘাড়ে কানে চুমু খেতে শুরু করল।

'এই যাঃ, পাশের ঘরে বড়োমা।'

'মা ঘুমোচ্ছে।' পার্থর হাত তিথির গলার কাছে, ক্রমশ নীচের দিকে নামছে।

'ছাড়ো। বড়দি ওপরে গেছে, এক্ষুনি চলে আসবে।'

'দরজাটা দিয়ে দাও,' বলে পার্থ নিজেই এক ঝটকায় উঠে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিল।

তিথি আতঙ্কিত গলায় বলল, 'কী করছ কী? এই দুপুরবেলায় দরজা বন্ধ করে, বড়োমা বড়দি দেখলে কী ভাববে? না, এখন এরকম কোরো না।'

'এখন না তো কখন করব?' পার্থ ঠান্ডা মেঝের ওপরেই তিথিকে শুইয়ে দিচ্ছিল, 'কে কী ভাববে? ভাববে বউয়ের সঙ্গে আছি। কী হয়েছে তাতে?'

তিথি বাধা দিতে চাইছিল, কিন্তু বাধা দিতে পারছিল না। শরীরে ভালোলাগা ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। এই সুখ একটা বেয়াড়া বেড়াল, তিথি যতই তাকে থলের মধ্যে চেপে বেঁধে দূর করে দিতে চাইছে ততই সে ফিরে ফিরে আসছে।

বাইরে খুট করে একটা আওয়াজ হতেই তিথি ছটফট করে উঠল, কিন্তু পার্থ এমনভাবে তার বেণি ধরে রেখেছে যে তার ঘাড় মেঝের সঙ্গে আটকে আছে। তিথি মাথা তুলতে পারল না, চাপা অনুনয়ের গলায় বার বার বলতে লাগল, 'ওই বড়দি এল, ছাড়ো প্লিজ, এ মা, কী করছ? প্লিজ ছাড়ো—'

পার্থ যখন তাকে মুক্তি দিল, তার আগেই তার শরীর সিটিয়ে গেছে। কোনোক্রমে দ্রুত ঠিকঠাক হয়ে তিথি প্রথমে আস্তে আস্তে

দরজা খুলল। পাশের ঘরে সন্তর্পণে উঁকি দিয়ে দেখল সুধা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সীমাও আসেনি। পার্থর কাছে এসে স্বস্তির হাসি হাসল তিথি, ‘বড়োমা ওঠেননি, আওয়াজটা কীসের হল কে জানে! উফ্, আমি যা ভয় পেয়ে গেছিলাম না!’

পার্থ তখনও চিত হয়ে শুয়ে। তিথি হাঁটু গেড়ে বসে পার্থর গালে আঙুল বোলাল, ‘সত্যি, এভাবে হয় নাকি! তুমি কিছু ব্যবস্থা করো।’

‘কী ব্যবস্থা করব?’ পার্থ বুকে হাতে বোলাচ্ছিল।

‘ব্যবস্থা মানে,’ তিথির খুব অস্বস্তি হচ্ছিল বলতে, ‘আমাদের কোনো ঘর নেই।’

পার্থ তিথিকে দেখছিল, আপশোসের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, ‘এই ঘরটাই আমাদের ঘর হতে পারত। তুমি ওই ভুলভাল জেদটা ছাড়ো না। বিয়ে করলাম অথচ বউয়ের সঙ্গে থাকতে পারি না।’ পার্থ বিরক্ত মুখে উঠে বসল, ‘তা ছাড়া এখন তো শীত পড়ে গেছে, ওই ঘরের খাটে বাবা মা সীমার শুতে কোনো অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।’

‘তাও তুমি কিছু করবে না!’ তিথির গলাও তীব্র, সে শক্ত করে ঠোঁট টিপে পার্থর দিকে তাকাল।

‘কী করতে বলছ তুমি আমাকে?’

‘আমি কিছু বলছি না। আমি জানি না। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে?’ তিথি দু-এক মুহূর্ত ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থেকে বলল, ‘তুমি এই কাজটা করলে, কোনো টাকা পেলে না?’

‘টাকা? এত তাড়াতাড়ি!’ পার্থ যেন আকাশ থেকে পড়ল, হতাশার স্বরে বলল, ‘এত তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়া যায় না তিথি,

অন্তত কয়েক মাস যাক।’

তিথি খুব দমে যাচ্ছিল। এই অবস্থা! কাজ করলেও টাকা পাওয়া যায় না! অথচ সে মনে মনে একটা স্থির আশা আঁকড়ে ছিল, একটু যেন ভরসা হচ্ছিল তার পার্থ কাজটা পাওয়ার পরে। সেটা ভেঙে ছিটকে চুরমার হয়ে যেতেই ভেতরে ভেতরে খুব মানসিক অবসাদ ঘিরে ধরছিল তিথিকে। সেটাকে জোর করে দু-হাতে ঠেলে সরাতে সরাতে সে ভাবছিল, কী করা যায়!

বাড়ি ছেড়ে আসার সময় যে বইগুলো সে নিয়ে এসেছিল সেগুলো কোথায় পড়ে আছে কে জানে। পার্থর টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে সেখানে তো চোখে পড়েনি। সকালে রান্নাঘরের ব্যস্ততা মিটলে তিথি বইগুলো খুঁজছিল। মাধবী একবাটি তরকারি নিয়ে নীচে এলেন।

‘তোর বড়োমা কই রে তিথি? এই দ্যাখ চিংড়ি দিয়ে ফুলকপি রাঁধলাম, ভালোবাসিস?’

‘বড়োমা বারান্দায়।’ তিথি চিংড়ি ফুলকপির প্রতি উত্সাহ দেখাল না। মাধবী প্রায়ই এটা-সেটা রান্না করে নিয়ে আসেন, পরিবর্তে এখান থেকে কিছুই যায় না। অবশ্য লোককে দেওয়ার মতো রান্নাও হয় না এখানে। কী করেই বা হবে, অলকের সামান্য আয়েই এত বড়ো সংসার। একথা ভাবলেই তিথির নিজেকে বড়ো সংকুচিত লাগে।

‘কী খুঁজছিস রে তুই? কী হারাল?’

‘আমার বইগুলো মাধুবউদি! হারায়নি, এখানেই আছে কোথাও। পেয়ে যাব।’

মাধবী বারান্দার দিকে পা বাড়িয়েছিলেন, থমকে গেলেন। বললেন, ‘পড়াশুনা করবি বুঝি?’

'হ্যাঁ মাধুবউদি। পরীক্ষাটা দিতেই হবে যে করে হোক।'

মাধবী গভীর চোখে তিথির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তিথি ঘাড় ফিরিয়ে হাসল, করুণ হাসি। বলল, 'গ্র্যাজুয়েট হতে এখনও অনেক দেরি, তার আগে তো চাকরি পাওয়া যাবে না। একটা বছর শুধু শুধু নষ্ট করলাম।'

'ও নিয়ে ভাবিসনি। তুই ঠিক পারবি।' মাধবী বারান্দার দিকে যেতে যেতে বললেন, 'বাড়ি থেকে চিঠি আসেনি কোনো, না রে?'

তিথির বুকে একটা কষ্ট হচ্ছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'না। আমার দরকার নেই।'

১২

দরজায় পুরোনো ভারী পরদা উড়ছে। পরদার এপাশে দাঁড়িয়ে তিথি ইতস্তত করছিল। সামনের বছর পরীক্ষায় বসার আগে কিছু ক্লাস করা তার নিতান্ত প্রয়োজন, বিশেষ করে প্র্যাকটিক্যালগুলো তো বটেই। সে বিষয়ে হেড–ডিপের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু বরাবরের মতো আজও হেড–ডিপের ঘরে ঢুকতে তার বুক ঢিপঢিপ করছে। এ তার পুরোনো রোগ, স্কুলে থাকতে হেডমিসে কিংবা অন্য কোনো দিদিদের সঙ্গে কথা বলতে হলেই তার জিভ শুকিয়ে যেত।

তিথির পরনে সেই গোলাপি নাইলনের শাড়িটা, লাল ব্লাউজ। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখাপলা। এই অভূতপূর্ব বেশে তাকে হেড–ডিপের ঘরের সামনে আবিষ্কার করল দীপান্বিতা, তিথির পুরোনো সহপাঠী।

‘মাই গড, তিথি। তুই। ইয়ে কেয়া হাল বনা রাকখা ইয়ার!’

তিথি চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল দীপান্বিতা চোখ বড়ো বড়ো করে তাকে আগাপাশতলা দেখছে। পরক্ষণেই আরও দু-তিনজন ঘিরে ধরল তিথিকে। অতসী আর বৃন্দা, আর একজনের নাম ঠিক মনে পড়ছে না, বোধ হয় সংযুক্তা।

পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরিয়ে ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। কলেজের কেউই তিথির কোনো হদিস জানত না, কেন সে পরীক্ষা দিল না, তার পরেই–বা এতদিন তার খোঁজ নেই কেন এ সমস্ত নিয়ে সহপাঠীরা একটু ধাঁধায় থাকলেও কারও সঙ্গে তার এমন কোনো বন্ধুত্বও গড়ে ওঠেনি যে কেউ তিথির বাড়িতে খোঁজ করতে পারে। বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার তেমন সুযোগ হয়নি, কেননা প্রথম থেকেই কলেজে তিথি অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল। সেই জন্যেই অনেকের ধারণা হয়েছিল তিথি কলেজ ছেড়েই দিয়েছে।

আজ তিথিকে দেখে কলেজে সাড়া পড়ে গেল।

‘তুই বিয়ে করেছিস, তিথি! এইজন্যে তুই পরীক্ষা দিলি না?’

ওরা এত জোরে জোরে কথা বলছে, তিথি বাধ্য হল হেড–ডিপের ঘরের সামনে থেকে সরে আসতে। একপ্রস্থ অবধারিত জিজ্ঞাসাবাদের পর ওরাই অবশ্য তিথিকে অনেক সাহায্য করল। তিথি একা সাহস পাচ্ছিল না বলে ওর সঙ্গে দু-তিনজন ঢুকল হেড–ডিপের ঘরে।

হেড ডিপ ব্রততী সেন রাশভারী কিন্তু রাগি নন। বই পড়ছিলেন, ওরা ঘরে ঢোকার পর চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখলেন, ‘কী চাই?’

অতসী এক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, ‘ম্যাম, আমাদের বন্ধু তিথি বিয়ে করেছে। ও পার্ট ওয়ান দিতে পারেনি, সামনের বার দেবে। ও খুব ভালো মেয়ে ম্যাম, একটু ক্লাস টাস করতে চায়।’

তিথি কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিল, ব্রততী তাকে দেখতে দেখতে বললেন, ‘এত তাড়াতাড়ি বিয়ে? মা-বাবা দিয়ে দিলেন, না কি?’

‘না ম্যাম। ও নিজেই,...মানে, ওর মা-বাবা মেনে নেননি।’ অতসীই তিথির মুখপাত্র।

‘চমৎকার! বিয়ের এত তাড়া যে লেখাপড়া শেষ করা অবধি অপেক্ষা করা গেল না!’

তিথি বুঝতে পারছিল অতসী তার হয়ে সব কথা বলবে, এটা ঠিক না। মরিয়া হয়ে সে মিনমিন করে বলল, ‘আমি লেখাপড়া শেষ করতে চাই, ম্যাডাম, আমি ক্লাস করব, আর প্র্যাকটিক্যালগুলো...’

ব্রততী সেন আবার বইয়ে মন দিলেন। চশমাটা পরতে পরতে বললেন, 'সে যা পারো করো। ক্লাস করতে ইচ্ছে হলে করবে, তাতে আর আপত্তি কী। প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডওয়ার্ক যেটুকু যা বাকি আছে করে নিতে পারো। বলে দেব।'

তিথি হাঁপ ছাড়ল। এতেই তার হবে। এই পারমিশানটুকুই খুব জরুরি ছিল। বাকি চেষ্টা সে নিজেই করবে।

হেড-ডিপের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বন্ধুরা কিন্তু তাকে সহজে ছাড়ল না। খবর পেয়ে অন্যরাও এসে জুটল। সবাই যে জিওগ্রাফি অনার্সের, তাও নয়। অনেকেরই মুখও তিথির চেনা নয়।

'দিস ইজ আনফেয়ার তিথি। বিয়ে করলি কাউকে জানালি না পর্যন্ত। নেমন্তন্ন তো দূরের কথা।'

'এই ওকে এভাবে বলিস না। জানিস, ও বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করেছে?'

'রেজি? মা-বাবা এখনও মেনে নেননি?'

'তোর সাহস আছে তিথি, আমরা এরকম পারতাম না।'

'বলিউড ব্লক বাস্টার! কিন্তু ওকে হিরোইন হিরোইন লাগছে না, যাই বল।'

'তোর বর কী করে রে? কেমন দেখতে?'

'আরে দেখিসনি? কতবার কলেজে এসেছে, দাড়িওয়ালা। ইন্টেলেকচুয়াল। জার্নালিস্ট, না রে তিথি?'

'তোকে শাঁখপলা পরে থাকতে হয়? তোর শ্বশুরবাড়ি খুব কনজারভেটিভ বুঝি?'

'ইশ্, তুই চুড়িদারও পরতে পারবি না?'

'এই খাওয়া খাওয়া। বিয়ে করেছিস খাওয়াবি না এ হতেই পারে না। চল সবাইকে অ্যাটলিস্ট চিকেন রোল খাওয়াতে হবে।'

তিথি প্রমাদ গুনল। পার্থর কাছ থেকে যাতায়াত বাবদ মাত্র দশ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল সে। করুণমুখে বলল, 'পরে একদিন হবে রে। আজ আমি কিছু নিয়ে আসিনি। তা ছাড়া বাড়িও ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।'

ভিড় পাতলা হয়ে আসছিল। তিথি শুনল একটি মেয়ে তার পাশের জনের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর খুব একটা না নামিয়েই বলছে, 'কীরকম বিয়ে রে, বিয়ের পর আরও হ্যাগার্ড দেখাচ্ছে!'

তিথি নিয়মিত ক্লাস শুরু করল। ক্লাসনোটসই তার প্রধান ভরসা। তার বইপত্র বিশেষ নেই। লাইব্রেরির বই দু-একটা করে অবশ্য বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। ভাগ্যিস লাইব্রেরির কার্ডটা বাড়ি ছেড়ে আসার সময় তার ব্যাগের সাইডগ্যাপেই ভরা ছিল।

কিন্তু তিথির সমস্যা শুরু হল অন্য জায়গায়। এত দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার পর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে শুধু ক্লাস করাই তো যথেষ্ট নয়। বাড়িতে নিজের মতো করে না পড়তে পারলে তিথি স্বস্তি পাচ্ছে না। চিরদিনই তার পড়ার অভ্যাস ঘরের দরজা বন্ধ করে। পড়ার সময় তার চোখের সামনে কেউ চলাফেরা করলে, কথাবার্তা বললেও তার মনঃসংযোগের ব্যাঘাত ঘটে। এখানে তাকে কে দেবে সেই পড়ার পরিবেশ? সকালে কলেজে বেরোনোর আগে সে দৈনন্দিন কাজগুলো করে। যতটুকু পারে রান্নাঘরে সুধাকেও সাহায্য করে। সারাদিন তো বাড়ি থাকে না, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই যেন সেই খামতিটুকু পূরণ করতে চায়। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে আসার পর একটা ঘরে টিভি চলে, অন্যঘরে প্রায় প্রতিদিনই গল্পের আসর বসে। তারপর আবার রান্নাঘর। ফলে, রাত্তিরে

সবাই শুয়ে পড়ার আগে তিথি পড়তে বসার কাঙ্ক্ষিত অবসরটুকুই পায় না। যে ঘরে সে শোয়, সে ঘরে আলো জ্বললে সীমার ঘুমোতে অসুবিধা হয়। সুধারও হয়তো হয় কিন্তু তিনি মুখে কিছু বলেন না। তা ছাড়া তিথিই–বা সেই অসুবিধে দিতে যাবে কেন। সীমার বিরক্ত আর সুধার ক্লান্ত মুখ দেখে অপরাধীর মতো বলে, 'প্যাসেজে আলো জ্বেলে পড়ব বড়োমা? দরজাটা ভেজিয়ে দেব, ঘরে আলো যাবে না।'

প্যাসেজের মেঝেতে বসে মশার কামড় খেতে খেতে বইয়ের পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েই থাকে তিথি। পড়া আর তার হয় না। শুধুই কান্না পায়। বইয়ের কালো কালো অক্ষরগুলো মশার মতোই বিনবিন করে ঘুরপাক খেতে থাকে চোখের সামনে। সবই যেন অপরিচিত লাগে। কিচ্ছু সে জানে না, কিছু মাথায় ঢুকছে না, সবই কি এ ক–দিনে একেবারে ভুলে গেছে! তিথির ভয় করে, মনে হয় আর পড়াশুনা করতে পারবে না, তার মস্তিষ্ক পাথর হয়ে গেছে।

এ কথাটা মনে হতেই তিথি কীরকম যেন অসাড় বোধ করতে শুরু করল। পড়াশুনা না করতে পারলে সে কী করে পরীক্ষা দেবে? এটা তো সবে পার্ট ওয়ান, তার পরেও তো তাকে পড়াশুনা চালিয়ে যেতে হবে। পাশ করে চাকরি নিতে হবে একটা। হবেই। তাকেই কিছু একটা করতে হবে। কিছু করা মানে টাকা রোজগার করা। পার্থর ওপর নির্ভর করে লাভ নেই। কিন্তু সে তো বহুদূরের পথ। সে তো এক পাও চলতে পারছে না, একটা লাইনও ঠান্ডামাথায় পড়তে পারছে না।

পার্থ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। তার ঘুমচোখ। তিথির পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সময় তিথি মুখ তুলে দেখল পার্থ কলতলার দরজা খুলছে। বাথরুমে যাবে।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে কলতলার দরজা লাগিয়ে পার্থ জল খেল। তিথি খুব অন্যমনস্ক চোখেই তাকে দেখে যাচ্ছে। পার্থ তিথির সামনে এসে দাঁড়াল, 'অনেক রাত হয়ে গেছে। শোবে না?'

তিথি মাথা ঝাঁকাল। আজ অন্তত একটা চ্যাপ্টার সে পড়বেই যে করে হোক, যত সময়ই লাগুক।

পার্থ ঘরে গেল না। তিথির সামনে উবু হয়ে বসে বলল, ‘এখানে খুব মশা, তিথি, এর মধ্যে পড়তে পারছ কী করে?’

‘পড়তে আমাকে হবেই পার্থ, আমি সব ভুলে গেছি।’

‘পরীক্ষার তো অনেক দেরি, তুমি এত টেনশন করছ কেন এখন থেকে?’

তিথি কিছুক্ষণ পার্থর চোখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, আস্তে আস্তে বলল, ‘আমি টেনশন না করে কী করব বলো। তোমার যে কোনোই টেনশন নেই। এতদিন হয়ে গেল, তুমি একটা ঠিকঠাক কাজ জোগাড় করতে পারলে না। কিন্তু এভাবে তো হয় না পার্থ। আমাকে একটা চাকরি–বাকরি করতে হবে।’

পার্থ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল, ‘চাকরিবাকরি আমি করতে পারব না। কিন্তু কাজ আমি করব, দেখো। আসলে এই লাইনে ভালো কাজ পাওয়া খুব শক্ত। আমি যে-সে কাজ করতে পারি না, অন্তত একটু মিনিংফুল, একটু সিরিয়াস কাজ না হলে, বাজে কমার্শিয়াল জিনিস আমার পোষাবে না। আজ একটা নতুন প্রজেক্টের ব্যাপারে—’

ঘরের ভেতর থেকে অলকের জড়িত স্বরের বিরক্তি ছিটকে এল, ‘আরে মোলো! রাতদুপুরে বকবক শুরু করলি কেন, চুপ কর! সারাদিন খেটেখুটে শান্তিতে ঘুমোনোরও জো নেই।’

পার্থ মুখ বিকৃত করল। অপমানে তিথির কান ঝাঁ–ঝাঁ করছিল। সত্যিই রাতের পক্ষে তাদের গলা একটু বেড়েই গিয়েছিল। তার রাগ গিয়ে পড়ল পার্থর ওপর। সে-ই তো এসে কথা শুরু করল। কী দরকার ছিল তার গায়ে পড়ে মায়া দেখানোর। দরদ উথলে

উঠল, বেশি বেশি।

পার্থ ফিসফিস করে বলল, 'শুয়ে পড়ো। এখন আর পড়তে হবে না।'

'তোমাকে আমার কথা ভাবতে হবে না,' হিসিয়ে উঠল তিথি, 'বিরক্ত কোরো না। যাও।' রাগে দুঃখে অসহায় ক্ষোভে তার ক্ষিপ্ত লাগছে।

এ বাড়িতে পার্থর কোনো সম্মান নেই। উঠতে বসতে অলক তাকে সুযোগ পেলেই অপমান করেন। এমনভাবে তার সঙ্গে কথা বলেন, এতখানি ঘৃণা আর অবজ্ঞা মিশিয়ে, লোকে চাকর বাকরের সঙ্গেও সেরকম ব্যবহার করে না। সত্যি কথা বলতে কী কোনো মানুষ আরেকজন মানুষের সঙ্গে এভাবে কথাবার্তা বলতে পারে তিথির ধারণা ছিল না। কিন্তু অলককেও কোনো দোষ দিতে পারে না সে। তিনি পার্থকে যদি মানুষ বলে মনে না করতে পারেন, তাঁর সেই অক্ষমতা খুব অযৌক্তিক নয়।

এই অপমানে পার্থকে কখনো অপমানিত হতে দেখেনি তিথি। এতেই তার আরও আশ্চর্য লাগে, যন্ত্রণা হয়। অলক যখন পার্থর সঙ্গে ওভাবে কথা বলেন, তিথির অপমানে লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পার্থর মুখে কোনো লজ্জার ছায়া পড়ে না। উলটে সে সেই অপমান ভাঙিয়ে মায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি আদায় করে, সুধার স্নেহকে ব্ল্যাকমেল করে। তিথির দেখেশুনে ঘৃণাবোধ হয়।

পার্থ ঘরে চলে যাওয়ার পর তিথি আকাশপাতাল ভাবছিল। সমস্তই অন্ধকার ঠেকছে। সে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু খাদে পড়ে গিয়েও ক্রমশ আরও অতলে পিছলে যাচ্ছে সে। যে ভরসায় সে চোখ বুজে ঝাঁপ দিয়েছিল, তা সত্যি হয়নি। কেউ তাকে লুফে নেয়নি। তাকে নিজের চেষ্টাতেই উঠে দাঁড়াতে হবে। অথচ খাদের গা এত ঢালু আর পিছল, সে দাঁড়ানোর জমি তো দূরের কথা, পতন আটকানোর জন্যে আঁকড়ে ধরারই কিছু পাচ্ছে না।

হঠাৎ তিথি দেখতে পেল খাদের গায়ে একটা চেনা গাছের শিকড়। মাধুবউদি, তিথি মরিয়া হয়ে শিকড়টার দিকে হাত বাড়াল। তাকে বাঁচতেই হবে।

পার্থদের মতো মাধবীরাও এই বাড়িতে ভাড়াই থাকেন। বাড়ির অবস্থা দেখেই বোঝা যায় বাড়ির মালিক তাঁর এই সম্পত্তিটিকে একেবারে খরচের খাতাতেই ফেলে রেখেছেন। এই বাড়িতে এখনও যে ভাড়াটে আছে এটাই তাঁর আশ্চর্য ভাগ্য। ভাড়া যদিও সামান্যই, মাসে মাসে ভাড়াটেরাই তাঁর কাছে গিয়ে টাকাটা দিয়ে আসেন। এ ছাড়া তাঁর সঙ্গে এই বাড়িটির আর কোনো সম্পর্ক নেই।

পার্থদের ঠিক ওপরেই মাধবীরা থাকেন। এই দিকটাই বাড়ির বাসযোগ্য অংশ। অন্য পাশটার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বাড়িটা এই পাশে বেশি হেলে পড়া। সেদিকের একতলাটা মাটির নীচে অনেকটাই বসে গেছে। দরজা জানলায় পাল্লা নেই। বারান্দা আর ঘরের মেঝে ঝোপজঙ্গলে ভরতি। দোতলার বারান্দা থেকে রেলিং ভেঙে চাঙড় খসে পড়েছে বছর দুয়েক আগে। সেইভাবেই রয়ে গেছে। তবু দোতলায় লোক থাকে। পুরোটা নিয়ে নয়। মাধবীদের উলটোদিকের একটা ঘর ভাড়া নিয়ে আছে একটি ব্যাচেলার ছেলে। দিনের বেশি সময়টাই সে অবশ্য ঘরে থাকে না, রাত্রে ঘুমোতে আসে। তার পাশের ঘরটা এমনিই পড়ে আছে।

মাধবী বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বললেন। দোতলায় মাধবীদের উলটোদিকে যে ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে, সেখানে তিথির পড়ার বন্দোবস্ত হল।

মাধবী সুধাকে বলছিলেন, ‘ওরা লোক খুব ভালো দিদিভাই। আমি তিথির কথা সব বললাম ওদের। মেয়েটা পড়াশুনার জায়গা পাচ্ছে না বলতেই ওরা রাজি হল। ভাড়া-টাড়ার কথা কিছু বলেনি। শুধু বলল ওদের দরকার পড়লে ঘরটা ছেড়ে দিতে হবে।’ মাধবী হাত নাড়লেন, ‘ওটা আসলে একটা কথার কথা। ওই ঘর আর ওদের কী দরকারে লাগবে। ওই একটু দর বাড়িয়ে রাখল আর কি। তবে মানুষ ভালো বলতে হবে। তিথি, এবার তোর একটা হিল্লে হল।’

তিথি ভাবছিল মাধবীকে প্রণাম করবে কি না। মনস্থির করে নীচু হতেই মাধবী বাধা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন, ‘ওমা! মেয়ের কাণ্ড দ্যাখো। পায়ে হাত দিচ্ছিস কেন? পাশ করে চাকরি পেয়ে খাইয়ে দিস। এখন চল ওপরে। ঘরটায় গিয়ে দেখি কী অবস্থা।’

ঘরে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া গেল না। ওপরে যে ছেলেটা থাকে তার নাম হিমাংশু। একটা ঘর নিয়ে থাকলেও বাইরের দরজায় সে-ই তালা লাগিয়ে যায়। রাত্তিরে সে ফিরলে মাধবী তার সঙ্গে কথা বললেন। ঠিক হল, এবার থেকে সে শুধু নিজের ঘরে তালাচাবি দেবে। বাইরের দরজার জন্যে একটা ছোটো তালা মাধবীই এনে দিলেন নিজের ঘর থেকে। এর চাবি থাকবে তিথির কাছে।

হিমাংশুকে এর আগে কখনো খেয়াল করেনি তিথি। বস্তুত এই দিকটাতে কেউ থাকে সেটাই সে জানত না। হিমাংশুর ঘরে কম পাওয়ারের একটা বালব জ্বলছে। তা ছাড়া আর কোথাও আলো নেই। তবে হিমাংশু বলল পাশের ঘরেও ইলেকট্রিক লাইন সুইচ-টুইচ আছে।

মাধবী বললেন, ‘এখন আর ঘরে ঢুকে কাজ নেই, বুঝলি তিথি। যা অবস্থা হয়ে আছে, সাপ না বিছে কী কামড়ায় ঠিক নেই। কাল সকালে এসে দেখিস।’

হিমাংশুর ঘরের ম্লান আলোয় যতটা বোঝা গেল তিথির মনে হল পুরো প্যাসেজটা জঞ্জালে ঠাসা।

পার্থ ফিরল তারও পরে। সে ফিরতেই তিথি উচ্ছ্বসিত মুখে বলল, ‘জানো, মাধুবউদি ওপরের ঘরে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছে, কাল থেকে আমি ওখানে পড়াশুনা করব। শুধু একটা আলো লাগিয়ে নিতে হবে।’

পার্থর মুখে কোনো হাসি ফুটল না। সেখানে সীমাহীন ক্লান্তি আর নৈরাশ্যের ছাপ। তিথি উদ্বেগের গলায় বলল, ‘কী হয়েছে গো?

তোমায় এরকম দেখাচ্ছে কেন?’

কাঁধের ঝোলাটা ছুড়ে ফেলতে ফেলতে পার্থ বলল, ‘কিছু হয়নি। কিছু হল না।’

‘কী হল না?’

‘ওই প্রজেক্টটা। তুমি ভাবতে পারবে না তিথি, প্রজেক্টটা আলটিমেটলি কে পেল জানো? যার যোগ্যতা ডেডিকেশন সিনসিয়ারিটি সবই আমার চেয়ে অনেক কম।’

‘কে?’

‘স্বপন। ও এত ধান্দাবাজ আমি আগে বুঝতে পারিনি। নির্ঘাত তলে তলে প্রোডিউসারের সঙ্গে লাইন করে রেখেছিল। তারপর এত বড়ো সাহস, আমাকে অফার দিল ওকে অ্যাসিস্ট করার, ভাবো।’

তিথি কিছু না ভেবেই বলল, ‘তুমি কী বললে?’

‘বললাম, আমি ডাইরেক্টর হলে কাজটা যেভাবে করার স্বপ্ন দেখেছিলাম, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর হলে চোখের সামনে সেই স্বপ্নের অপমৃত্যু দেখতে হবে। আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়।’

পার্থ অস্থির হাতে চুলের মধ্যে আঙুল চালাচ্ছিল, তিথি যন্ত্রের মতো বলল, ‘মুখ হাত ধুয়ে এসো, খেতে বসবে।’

পরের দিন সকালে পার্থ আর অলক বেরিয়ে যাওয়ার পরে তিথি চাবি নিয়ে দোতলায় উঠল। হিমাংশু তার ঘরে তালা দিয়ে

বেরিয়ে গেছে। পাশের ঘরে পা দিয়েই তিথি দেখল ঘরটা একটা ছোটোখাটো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ। ঘরময় আবর্জনা। ছেঁড়া কাগজ ছেঁড়া ন্যাকড়া শিশিবোতল ভাঙা চেয়ার টুল প্যাকিং বাক্স ছেঁড়া পিচবোর্ড প্লাস্টিকের প্যাকেট ঝুড়ি বস্তা ডাঁই করা। দেয়াল থেকে দেয়ালে লম্বা ঘন ঝুল। বাইরের প্যাসেজটাও তথৈবচ। কাল রাত্রে সে ঠিকই দেখেছিল। সর্বত্র একটা ছাতা ধরা ভ্যাপসা গন্ধ। প্যাসেজে কোনোরকমে জঞ্জাল ডিঙিয়ে পা ফেলে ফেলে তিথি বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখল বাথরুমের দরজাটা ভাঙা। দুটো পাল্লারই নীচের দিকের অংশটা এবড়োখেবড়ো ভাবে ভেঙে ফাঁক হয়ে আছে। বাথরুমের মধ্যে পায়খানাটা একটু উঁচুতে, সেখানে আলাদা একটা দরজা। এই দরজাটা অতটা ভাঙা না হলেও অক্ষত নয়। বাথরুমে দুটো বালতি আর মগ রাখা। যদিও কলে কোনো জল নেই। হিমাংশু এই বাথরুমটা ব্যবহার করে।

সেদিন আর কলেজ গেল না তিথি। অমানুষিক পরিশ্রম করে ঘর পরিষ্কার করল, প্যাসেজের সামনেটাও। প্যাসেজটা পুরো পরিষ্কার করা গেল না কারণ ঘরের আবর্জনা সরাতে গিয়ে তিথি সব কিছু একেবারে ফেলে দিতে সাহস পায়নি। ঝুড়ি বস্তা ভাঙা বাক্স ইত্যাদি প্যাসেজের একপাশেই সরিয়ে রেখেছে। কে জানে এগুলো বাড়িওয়ালার কোনো কাজের জিনিস কি না। তবে ঘরটাকে সে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। সমস্ত দেয়াল, সিলিং, জানলা দরজার ঝুল ঝেড়ে, ঘরের মেঝে ঝাঁট দিয়ে মুছে তকতকে করে ফেলল সে। নীচের কলতলা থেকে লোহার বালতিতে করে জল টেনে নিয়ে এল, হাঁপ ধরলেও ক্লান্ত লাগছিল না তার। প্রবল উদ্দীপনায় কাজ করে যাচ্ছিল তিথি। কতদিন পর এই প্রথম তার একটা ঘর হতে চলেছে। ঘরটা তার নিজের নয়, একেবারেই অন্যের দয়ার দান। তবু, এই ভিক্ষালব্ধ ঐশ্বর্যই তার স্বপ্নপূরণের পথে প্রথম সহায়।

মাধবী সকালে একবার দরজায় উঁকি দিয়েছিলেন, তিথি তখন ধুলোয় ভূত। মাধবীকে সে ঘরে ঢুকতে দেয়নি। মাধবীর ইচ্ছে ছিল তিথির সঙ্গে হাত লাগাবার, সেটা বুঝেই তিথি বলেছে, ‘প্লিজ মাধুবউদি, তুমি এই নোংরায় হাত দিয়ো না। আমি করে ফেলব।’

মাধবী হেসেছিলেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, তোমার ঘর তুমি সামলাবে। কিন্তু এ তো একদিনের কম্ম নয়। চান করবি খাবিদাবি কখন?'

আজ তিথি পুরো ঘরটা না পরিষ্কার করে নাওয়াখাওয়ার সময় দিতে পারবে বলে মনে হয় না, সে মাধবীকে বলেছিল নীচে গিয়ে সুধাকে একটু বলে দিতে যে সে একেবারে সব কাজ সেরে তবে নামবে। সুধারা যেন খাওয়া-দাওয়া করে নেন।

ধ্বংসস্তূপের মধ্যে একটা প্রায় আস্ত চেয়ার পেয়ে গেছে তিথি। চেয়ারটা কাঠের, বেশ চওড়া আর নীচু। অনেকটা সোফার মতো, তবে তাঁতে গদি-টদি কিছু নেই। চেয়ারটা উলটে পড়েছিল। তিথি সেটাকে সোজা করতেই দেখল পিছনের একটা পায়া নড়বড় করছে, বাকি সমস্ত ঠিক আছে। খুব পুরোনো চেয়ার, গায়ের ছালবাকলা উঠে বিবর্ণ হতশ্রী চেহারা। কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে তিথির খুব আনন্দ হচ্ছিল। চেয়ারটাকে ধুয়েমুছে দেয়ালের একপাশে রেখে দেখছিল। এই তো! বেশ লাগছে। ফাঁকা ঘরটা যেন প্রাণ পাচ্ছে ওই একটা আসবাবে। পেছনের পায়াটাতে একটু পেরেক ঠুকে নিলেই হবে।

একটা জানলার দুটো পাল্লাই ভাঙা, শিকের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা। এই জানলাটা খোলা যাবে না। ঘরে অবশ্য আরও একটা জানলা রয়েছে। তিথি সেটা খুলে দিল। ঘরটা বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া। বারান্দার দরজা খুলে আঁতকে উঠল তিথি। ঠিক দরজার সামনেই বারান্দাটা শূন্যে ঝুলছে, সিমেন্টের চাঙড় খসে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পরে নিজেকে সামলে নিল সে, বারান্দা দিয়ে তার কী দরকার!

তিথি যখন ঘরটাকে ধুয়েমুছে ভদ্রস্থ করে তুলেছে, সুধা ওপরে এলেন। তাঁর খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, তিনি বলতে বলতে আসছিলেন, 'আর কত বেলা করবে, তিথি! এই সবে জ্বর থেকে উঠেছ—' ঘরে পা দিয়েই তাঁর কথা থেমে গেল। তিথির কাণ্ড দেখে খানিকক্ষণ তাঁর মুখে কোনো শব্দ জোগাল না। তারপর ফেটে পড়লেন, 'এসব কী করেছ তুমি, অ্যাঁ! কী সর্বনাশ! ওদের সব জিনিসপত্র সরিয়ে-টরিয়ে ঘর একদম ফাঁকা করে ফেললে!'

তিথি তাঁর উত্তেজনার কারণ বুঝতে পারেনি, ঝলমলে মুখে বলল, 'হ্যাঁ বড়োমা! ঘরটা যা হয়েছিল না। তুমি না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না!'

'তুমি কি ভাবছ ঘরটা ওরা তোমায় দিয়ে দিয়েছে?' সুধা মুখ কুঁচকালেন, 'দু–দিন থাকতে দিয়েছে, যেদিন ইচ্ছে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। তার জন্যে এত কাণ্ড!'

তিথি অপ্রত্যাশিত ধাক্কায় বিপর্যস্ত হতে হতে বলল, 'ঘরটা খুব নোংরা ছিল বড়োমা। নোংরা ঘরে পড়ব কী করে!'

মাধবী সম্ভবত সুধার চড়া গলার আওয়াজ পেয়েই চলে এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী হয়েছে দিদিভাই, বকছ কেন তিথিকে!'

'তুমিই বলো মাধু!' সুধা বিরক্তি রাখার জায়গা পাচ্ছেন না, 'কী আক্কেল ওর, সমস্ত বাক্সপ্যাঁটরা হাঁটকে–পাঁটকে উজাড় করতে কে বলে দিয়েছিল ওকে!'

তিথি পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, তার মাথা–ভরতি ঝুল, সর্বাঙ্গ ধুলোয় ধূসর। মাধবী সুধার পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন, 'তুই এখনও চান করিসনি? বা রে, তোর হাতে জাদু আছে নাকি রে তিথি! ও দিদিভাই, দ্যাখো ঘরটাকে এরই মধ্যে কেমন ঝকঝকে করে তুলেছে!'

সুধা গজগজ করছিলেন, 'বুঝি না বাবু তোমাদের মতলব। যার যেমন সাজে তেমনি থাকলেই তো হয়। দু-দিন পরে এসে অপমান করলে কী হবে তখন? কে সামলাবে?'

মাধবী হাসিমুখে ঘরের চারদিক দেখছিলেন, বললেন, 'ওমা, অপমান করবে কেন! ছাড়তে বললে ছেড়ে তো দিতেই হবে। তাই বলে থাকতে গেলে পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন করবে না?'

সুধা অপ্রসন্ন মুখে নীচে গেলেন। তিথি মাধবীর কথায় মনে জোর পেয়েছে। সে ভাবছিল, যতদিন ওরা এ ঘরে তাকে থাকতে দেবে দিক, ওরই মধ্যে সে ঘরটাকে একটু একটু করে সাজিয়ে–গুছিয়ে তুলবে। মাধবীর দিকে খুশি খুশি মুখে তাকিয়ে বলল, 'দ্যাখো মাধুবউদি ওই চেয়ারটা! এখানে ছিল। একটা পা ভাঙা। গোটা দুই পেরেক আর হাতুড়ি পেলে আমিই ওটা সারিয়ে নিতে পারব। আছে গো তোমার কাছে?'

'হাতুড়ি তো আছে। পেরেক খুঁজতে হবে। ওসব পরে হবে। এ ঘরে একটা আলোরও ব্যবস্থা করতে হবে। তুই যা নীচে গিয়ে চান করে খেয়ে নে। আমি দেখছি কী করা যায়।' মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গিয়েই একটু চিন্তিত মুখে তিথির দিকে তাকালেন, 'শোন তিথি, আমার মনে হয় কী, ঘরটা যখন পাওয়াই গেছে, তুই আর পার্থ এই ঘরটায় থাক, বুঝলি? আমার কাছে একটা পুরোনো ক্যাম্পখাট আছে, তোর সলিলদার, বিয়ের আগেকার। ওইটে এ ঘরে দিয়ে যাই। শীতকালে তো মেঝেতে শোয়া ঠিক না।'

তিথির মনে হল সে মাধবীকে জিজ্ঞেস করে, 'মাধুবউদি তুমি কি আমার মা?' কিন্তু লজ্জায় তার গলায় স্বর ফুটল না।

স্নান করতে গিয়ে তিথি দেখল, তার একটু নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। ঘরের জঞ্জাল পরিষ্কার করতে গিয়ে রাশি রাশি ধুলো ঢুকেছে তার নাকেমুখে। এমনিতেই ধুলো নাকে গেলে তিথির খুব অস্বস্তি হয়। আজ আর কোনো শারীরিক অস্বস্তির দিকে খেয়াল ছিল না। এখনও নিশ্বাসের কষ্টটাকে পাত্তা দিল না তিথি। বহুদিন পরে তার সামনে একটা আশার আলো এসে পড়েছে। তার আর পার্থর একটা আলাদা ঘর হয়েছে এতদিনে। ওই ঘরে সে মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। পাশ করে চাকরি নিয়ে এই সংসারের হাল ধরবে। সুধা আজ যতই বিরূপ বিরক্ত হন, তিথি প্রমাণ করবে সে এই পরিবারেরই একজন। পার্থর হয়ে সে-ই সমস্ত কর্তব্য

করবে। সীমার পছন্দমতো বিয়ে দেবে। অলক যতই পার্থকে দূরছাই করুন, সে পার্থর সমস্ত অযোগ্যতাকে আড়াল করে দাঁড়াবে।

স্নান করে তিথি রান্নাঘরে গিয়ে দেখল তার ভাত ঢাকা আছে। খুব খিদে পেয়েছে তার, স্নান করবার পরই সেটা বুঝতে পারছে তিথি। দ্রুত খেতে বসল সে। ডাল ভাত আর একটা তরকারি। মাছ খুব একটা রান্না হয় না এ বাড়িতে। তিথি অবশ্য মাছ খেতে ভালোওবাসে না। বাড়িতে থাকতে মা জোর করে পাতে দিতেন, তিথি অর্ধেক দিন খেতে চাইত না। অশান্তি হত। এখানে তার খাওয়া নিয়ে অশান্তি করার কেউ নেই। তিথি এমনিতে কমই খায়, আজকাল তার খাওয়া খুবই কমে গেছে। সুধা যখন খেতে দেন তখন কাঁসিতে যা তরকারি থাকে সেটা ভাগ করে হাত দিয়েই প্রত্যেকের পাতে দিয়ে দেন। ভাতের হাঁড়ির পাশে একটা ছোটো চামচ থাকে। সুধা যখন খাওয়ার মাঝখানে একবার জিজ্ঞেস করেন, ‘আর ভাত দেব?’ তিথি প্রথমদিকে দু-একবার ঘাড় নেড়েছিল। সুধা তখন চামচ দিয়ে দু-তিনবার ভাত দিয়ে বলেন, ‘আর?’ তিথি ঘাড় নেড়ে বলে, ‘না না। আর না।’ আসলে, চামচটা এত ছোটো যে সেটাতে করে পাঁচ-ছয়বার ভাত দিলে তবে একহাতা ভাত হয়। তিথি কিছুতেই দু–বারের বেশি নিতে পারে না, তার মনটা লজ্জায় অস্বস্তিতে গুটিয়ে যেতে থাকে। আজকাল আর সেটুকুও নিতে ইচ্ছে করে না তার। আজ সে খুঁজে খুঁজে ভাতের শেষ কণাটিও মুখে দিয়ে পেট ভরে জল খেল। শীতকালে জল খেয়ে খুব তৃপ্তি, শরীরের ভেতরটা জুড়িয়ে যায়।

কলতলায় এঁটো থালাবাসন রেখে মুখ ধুল তিথি। ঠিকে কাজের লোক দিনে একবার এসে বাসন মেজে দিয়ে যায়। রান্নাঘরের খাওয়ার জায়গাটুকু মুছে তিথি যখন ঘরে এল, তখন সুধা ঘুমোচ্ছেন। সীমা খাটের ওপর জানলার ধারে বসে টেবিলক্লথের এমব্রয়ডারি নিয়ে ব্যস্ত। তিথিকে দেখে বলল, ‘তোমার একটা চিঠি এসেছে।’ সীমা দু-তিন দিন হল আবার তিথির সঙ্গে কথা বলছে।

চিঠি শব্দটা শোনামাত্র তিথি কেঁপে উঠল। তার চিঠি!

তিথি দেখতে পেয়েছে চিঠিটা খাটের ওপরেই পড়ে আছে। এ বাড়িতে কোনো লেটার বক্স নেই। জানলা দিয়েই চিঠি দিয়ে যায় পোস্টম্যান। সীমা সুচে সুতো ভরাতে ভরাতে বলল, 'এক্ষুনিই এল। তোমার মায়ের চিঠি নিশ্চয়ই। এ বাড়ির কারও নাম নেই। পিওন জিজ্ঞেস করল তিথি মিত্র বলে এখানে কেউ থাকে কি না।' সীমা তিথির দিকে তাকাল, 'তুমি বিয়ের পর মল্লিক হয়েছ ওঁর খেয়াল নেই।'

তিথির কানে এত কথা কিছুই ঢুকছিল না। মায়ের চিঠি যে, এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। তার সমস্ত অন্তরাত্মা ছুটে যেতে চাইছে ওই হলুদ খামটার প্রতি, কিন্তু তার পা যেন উঠছে না। ভয় করছে তার, ভীষণ ভয়। কী লিখেছেন মা?

আস্তে আস্তে গিয়ে খামটা তুলে নিল তিথি। মা এর আগে কখনো তাকে চিঠি লেখেননি, লেখার দরকারই হয়নি। মাকে ছেড়ে কবেই বা থেকেছে সে! চিঠির খামটা ছিঁড়তে হাত কাঁপছিল তিথির। অদ্ভুত উদ্বেগে একটা পলায়নী ইচ্ছা কাজ করছিল তার ভেতরে ভেতরে। মায়ের চিঠি পড়ে সে এ বাড়িতে কাঁদতে চায় না। কিন্তু মা কী লিখলে যে তার কান্না আসবে না ভেবে পাচ্ছিল না।

কাগজের ভাঁজটা খুলে সম্বোধনটা পড়েই গলায় কান্নার ঢেউ আটকে গেল তার। 'স্নেহের তিথি'। ঠোঁট কামড়ে ধরে দ্রুত চিঠিটা পড়ে ফেলল তিথি। একবার, দু-বার, তিনবার। চোখের জলে মাখামাখি মুখে তিথি সীমার দিকে তাকিয়ে আর্ত গলায় বলল, 'বড়দি! মা মেনে নিয়েছে, মা সব মেনে নিয়েছে বড়দি!'

'তবে আর কী! নিশ্চিন্ত।' সীমা এমব্রয়ডারির ওপর ঝুঁকে পড়ল। তিথি চিঠিটা হাতে নিয়ে ছুটে চলে গেল বাথরুমে। দরজা বন্ধ করে, দেওয়ালে মুখ ঠেকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'পার্থ! মা আমাদের যেতে বলেছে, পার্থ!' প্রবল কান্নার বেগে তিথির আরও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

রাত্রে পার্থ আসা অবধি ছটফট করছিল তিথি। মাধবী হাসছিলেন, 'পার্থ খুব চমকে যাবে। ও ভেবেছিল না, তোর মা চিঠি পেয়ে তোকে এখান থেকে টানতে টানতে বেঁধে নিয়ে যাবে? তার বদলে মেয়ে-জামাইকে জোড়ে নেমন্তন্ন! পার্থ বিশ্বাসই করতে পারবে না দেখিস।'

তিথিও বিশ্বাস করতে পারছে না। আজ এ কী অভাবনীয় দিন এসেছে তার জীবনে! কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও সে কোনো স্বস্তি পাচ্ছে না। মাধবী সুধাকে বলেছেন তার আর পার্থর ওপরে থাকার কথাটা। সুধা আপত্তি করছিলেন, কিন্তু মাধবী এমন এমন যুক্তি দেখিয়েছেন সুধা আর কিছু বলতে পারেননি। কথা হয়েছে তিথির সামনে নয়, আড়ালে। কিন্তু কথাগুলো তিথির কানে আসছিল। মাধবীর যুক্তিগুলো শুনে তার লজ্জা করছিল, যদিও যুক্তিগুলো ভুল কিছু নয়। তারপর থেকেই সুধার মুখ অন্ধকার। সীমার মুখে বিষাদ ছেয়ে আছে। এ এক দুর্বোধ্য রহস্য, তিথি এর কিনারা পায় না।

মাধবীই দোতলার ঘরে একটা বালব লাগানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিথি তার বইপত্র নিয়ে গিয়ে দেয়ালের তাকে গুছিয়ে রেখেছে। ক্যাম্পখাটটাও পাতা হয়ে গেছে। ক্যাম্পখাটের নাইলনের ফিতেগুলো ঢিলে হয়ে একটু ঝুলে গেছে। তা যাক। এই কত! তার ওপরে পাতার জন্যে সুধার কাছ থেকে একটা চাদর চেয়ে দিলেন মাধবীই। সুধা চাদর দিলেন, তাঁর মুখ থমথম করছিল।

রাত্তিরে পার্থ সেই ঘরে ঢুকে বলল, 'বাঃ এ তো দারুণ ঘর!'

'তুমি তো দ্যাখোনি ঘরটার কী অবস্থা ছিল। সব পরিষ্কার করেছি। নাকে ধুলো ঢুকে অ্যালার্জি হয়ে গেছে।'

'আজই তাহলে আমাদের ফুলশয্যার রাত!' পার্থ তিথির কাঁধে হাত রাখল।

তিথি পার্থর গলা জড়িয়ে ধরল, কাঁধে মাথা রেখে বলল, 'কিন্তু বড়োমা মনে হয় খুব রেগে গেছেন।'

'তোমার মায়ের রাগ পড়েছে আর আমার মা রেগে গেছে। দিস ইজ লাইফ। ফরগেট অ্যাবাউট ইট।' পার্থ তিথিকে জাপটে ক্যাম্পখাটের ওপরে গিয়ে পড়ল। চাদরটা ডেবে গেল বেশ খানিকটা। তিথি পার্থকে চুমু খেতে খেতে বলল, 'কবে যাব গো আমরা মায়ের কাছে।'

'যাব যাব,' পার্থ ব্যস্ত হাতে শাড়ি ব্লাউজের মধ্যে থেকে তিথির শরীর ছাড়িয়ে নিচ্ছিল। তিথি ফিসফিস করল, 'দরজায় ছিটকিনি দাওনি। দিয়ে এসো। আর আলো নিভিয়ে দাও।'

পরস্পরকে প্রবল আঁকড়াতে আঁকড়াতে তিথি হঠাৎ বলল, 'এই যাঃ, খুব ভুল হয়ে গেছে। নীচ থেকে গায়ে দেওয়ার কোনো চাদর আনা হয়নি। রাত্তিরে শীত করবে।'

'চাদর কাল আনলে হবে। আজ শীত করার কোনো প্রশ্নই নেই।' পার্থ তার শরীরের নীচে তিথির শরীর পিষতে পিষতে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বরে বলল, 'আজ আমরা সারারাত ভালোবাসব।'

তৃতীয় অধ্যায়

১

সন্ধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে অদিতি ঘরে এসে বারান্দার দরজা বন্ধ করলেন। এখন বিকেল হতে-না-হতেই অন্ধকার হয়ে যায়, ঠান্ডাও পড়তে থাকে। বারান্দায় বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। ঘরে এসে অদিতি পুজোর জায়গায় একটা ধূপ জ্বাললেন। তাঁর পুজোর জায়গা বলতে দেওয়ালের একটা তাক, সেখানে একটা ছোট্ট বেতের সিংহাসনে রামঠাকুরের ছবি। আর কোনো ঠাকুরদেবতা নেই। বহুবছর ধরে অদিতি রামঠাকুরের দীক্ষিত। বাঙালি হিন্দুর বাড়িতে সচরাচর যেরকম পুজো-টুজোর নিয়ম, সন্ধ্যে ইত্যাদি মেনে চলা হয়, অদিতি ঠিক তেমনটা মানেন না। সন্ধ্যের সময় ঠাকুরের সামনে ধূপ জ্বেলে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। আজও বসে ছিলেন। বসার ঘর থেকে টিভির আওয়াজ আসছে, রবিবারের হিন্দি সিনেমা। বিশ্বনাথ অন্যদিন হিন্দি প্রোগ্রাম না দেখলেও রবিবার সন্ধ্যেবেলায় তাঁর কিছু করার থাকে না। এই দিনগুলোতে সন্ধ্যে থেকেই হিন্দির দাপট, তার সামনে আত্মসমর্পণ না করলে বিশ্বনাথের রবিবার সন্ধ্যেবেলাটি নিতান্ত কর্মহীন হয়ে যায়।

অদিতি চোখ বন্ধ করে বসেই ছিলেন। হঠাৎ বেল বাজল। আজকাল বেল বাজলেই অদিতি ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। এখন তো অন্য কারও আসার কথা নেই?

বারান্দা থেকে উঁকি দিলেন অদিতি। রাস্তার আলোগুলো জ্বলেনি। প্রায় দিনই জ্বলে না আজকাল। গলি অন্ধকার। সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, দুজনের ঝাপসা অবয়ব। উৎকণ্ঠা চেপে অদিতি প্রশ্ন করলেন, ‘কে?’

‘মা, আমি!’

দু-এক মুহূর্ত স্তব্ধতার পর অদিতি দ্রুত নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে বললেন, ‘দাঁড়াও, আসছি।’ নীচে নামার আগে বসার ঘরে গিয়ে

টিভিটা বন্ধ করে দিলেন। বিশ্বনাথ আশ্চর্য হয়ে বলতে যাচ্ছিলেন, 'কী হল কী, টিভি বন্‌—'

'তিথিরা এসেছে।' অদিতির সারা শরীর কাঁপছিল।

বিশ্বনাথেরও।

তিথি আজ পরে এসেছে সুধার দেওয়া তাঁতের শাড়িটা। পুজোয় একদিন মাত্র পরে শাড়িটা ভাঁজ করে তুলেই রেখেছিল সে। আজ পরতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল, এত গাঢ় রং আর চকচকে পাড় মা যদি পছন্দ না করেন! গরম কিছুই গায়ে দেয়নি সে। মনে হয়েছিল লাগবে না। কিন্তু রাস্তায় বেরিয়ে শীত শীতই করছিল। পার্থ যদিও পাঞ্জাবির ওপর অলকের পুরোনো একটা শাল চাপিয়ে এসেছে। বহুবছর বাক্সবন্দি থাকার ফলে শালটার গায়ে অজস্র ভাঁজ।

অদিতি দরজা খুলে প্রথমেই একটা তীব্র ঝাঁকুনি খেলেন। এ কি তিথি, না তিথির ছায়া? কতদিন তিনি দেখেননি তিথিকে, আটমাস! তার মধ্যে একটা মেয়ে এতটা বদলে যেতে পারে! অসম্ভব রুগ্ন, গায়ের কালো রঙের ওপর আরও গভীর মালিন্যের ছাপ, চুল অনেকটা বড়ো হয়ে গেছে, টেনে বাঁধা খোঁপা, সিঁথি থেকে কপালে ঝুঁকে এসেছে সিঁদুরের রেখা, কপালের মাঝখানেও সিঁদুরের টিপ। প্রসাধনের চূড়ান্ত অভাবে সিঁদুরটাকেই একমাত্র প্রসাধন করেছে তিথি। দু–হাতে শাঁখা-পলা আর ব্রোঞ্জের দু–গাছি চুড়ি, কান আর গলা খালি। অদিতি স্তম্ভিত হয়ে দেখছিলেন। তিথি কোনোদিনই বেশি সাজগোজ করত না, কিন্তু সে ছিল তার উদাসীনতা। আর আজকের এই তিথি যেন মূর্তিমতী দীনতার প্রতিমা। অদিতির বুকের ভেতরে যাবতীয় মাংসপেশি স্নায়ু শিরা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি শান্তমুখে হাসলেন। পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো।'

যে কয়েকটি সামান্য মুহূর্ত অদিতির চোখ তিথির দিকে স্থির ছিল, তিথিও তাঁকে অবাক হয়ে দেখছিল। অদিতির ছোটো চুল, চুড়িহীন দু–হাত—এমন সে কখনো দেখেনি। কিন্তু আজ প্রথমবার দেখেই তার মনে হল, অদিতিকে যেন এমনভাবেই বেশি

মানিয়েছে। পরমুহূর্তেই সে একটু শঙ্কিতভাবে পার্থর দিকে একঝলক তাকাল। পার্থর কপালে কুঞ্চন। তিথির মনে হল, পার্থর ভঙ্গিমা কি আর একটু বিনয়ী হতে পারত না।

তিথি এ বাড়িতে এসেছিল একরাশ উদ্বেগ নিয়ে। কিন্তু এখানে পা দেওয়ার পর কয়েক মিনিট কেটে যেতেই সে দেখল তার খুব ভালো লাগছে। সেই পুরোনো সিঁড়ি, ল্যান্ডিং-এর কাচের জানলা, ল্যান্ডিং-এর কোণে টেরাকোটার টবে পাতাবাহার গাছ, এ সমস্ত তো সে চিরজীবনের মতো ছেড়েই চলে গিয়েছিল। আজ এই ফিরে আসাটুকু, হোক তা মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে, কী চূড়ান্ত মধুর। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে জুতো খুলতেই অদিতি বসার ঘরের দরজার মুখে দাঁড়িয়ে আবার বললেন, 'এসো—'

তিথি হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে গেল। সে খেয়াল করল অদিতি তাদের অতিথির মতো বসার ঘরে আহ্বান জানাচ্ছেন। বিহ্বলের মতো চারিদিকে তাকাল সে, এই বাড়ি, এর প্রতিটি ঘরে, ঘরের কোণে তার আজন্মের নিশ্বাস জমে আছে, তার পায়ের তলায় কী তীব্র পরিচিত স্পর্শ, এখানে সে আজ একজন বাইরের লোক! সজোরে ঠোঁট কামড়ে ঘরে পা দিল তিথি। ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন বিশ্বনাথ। তাঁর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিমাটিই এমন করুণ, তিথির চশমার কাচ ঝাপসা হয়ে গেল। নীচু হয়ে প্রণাম করতেই বিশ্বনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গেই কেঁপে কেঁপে বেরিয়ে এল ভাঙা ভাঙা কয়েকটা শব্দ, 'আয়.. মা!..আয়, কেমন আছিস...'

'তোমরা কেমন আছ—' তিথি অদিতির পা ছুঁল। পার্থ তখন বিশ্বনাথকে প্রণাম করছে। বিশ্বনাথ নিজের দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন, কিছু বললেন না। পার্থ তিথির পাশে এসে যখন অদিতির সামনে ঝুঁকল, তিথি তখনও প্রণাম শেষ করেনি। অদিতি দুজনের মাথায় হাত ছুঁইয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আহা থাক, সুখী হও।'

তিথির কান্না আর বাঁধ মানল না। সে ভেঙে পড়তেই অদিতি তাকে বুকে জড়িয়ে নিলেন, পার্থকেও একটু বিচলিত দেখাচ্ছে। অদিতি পার্থর দিকে তাকিয়ে হাসলেন, তাঁর চোখে নিঃশব্দ স্রোত। বললেন, 'বোসো পার্থ। চা খাবে তো?'

কান্নার বেগটা একটু কমলে অদিতি তিথির পিঠে আলতো চাপড় দিলেন, 'তিথি? আমায় একটু রান্নাঘরে যেতে হবে যে! বাবার কাছে একটু বোস। তোর বাবা তো এই ক-টা মাস কেঁদে কেঁদেই গেল।'

তিথি চোখ মুছছিল, বলল, 'বসছি। তার আগে তোমার সঙ্গে রান্নাঘরে যাই? কী করবে? আমরা কিন্তু বেশি কিছু খাব না।'

'তোকে আর রান্নাঘরে যেতে হবে না। পরোটা ভাজি, বেগুনভাজা দিয়ে খা? এক্ষুনি হয়ে যাবে।'

তিথি হাসিমুখে ঘাড় কাত করল। পার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মা যা পরোটা বানায় না, দেখো! খেয়ে একদম পাগল হয়ে যাবে। মুচমুচে, ছোটোছোটো, ফার্স্টক্লাস!'

পার্থর মুখে কোনো ঔৎসুক্য লক্ষ করা গেল না। সে উদাসীন মুখে বিশ্বনাথের সঙ্গে কথা বলছে, বিশ্বনাথ বলছেন এবার কলকাতায় খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা পড়ে গেছে। উত্তরে পার্থ খুব ভারিক্কি স্বরে বলছিল, 'এটা তাড়াতাড়ি নয়, বরং এইটাই ঠান্ডা পড়ার ঠিক সময়। অন্যান্যবারই শীত দেরি করে আসে।...'

অদিতি বা বিশ্বনাথ কেউই তিথিকে পড়াশুনার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেননি। খেতে খেতে তিথি নিজে থেকেই একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'মা, আমি ক্লাস করছি। সামনের বছর পরীক্ষা দেব। এ বছর তো আর দেওয়া হল না...বই-টইগুলো নিয়ে যাব, হ্যাঁ?'

তিথি বুঝতে পারছিল মা-বাবা দুজনেই ধরে নিয়েছিলেন সে আর পড়াশুনা করবে না। চিঠিতে সে শুধু পরীক্ষা না দেওয়ার কথাই লিখেছিল, তখনও পড়াশুনা আর শুরু করতে পারেনি বলে আর কিছু লেখার সাহস পায়নি। তার কথা শুনে অদিতি হাসলেন, 'যাক, শুনে খুব ভালো লাগছে তিথি, আমরা তো আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি না। তুই নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস, এর থেকে ভালো আর হয় না।' অদিতির হাসিটাতে সামান্য দুঃখের ছাপ পড়ল, 'খবরটা শুনে আমার আর তোর বাবার চাইতেও

কে বেশি খুশি হবে বল তো?'

তিথি মুখ নীচু করে বলল, 'জানি, দাদা তো? দাদা ভেবেছিল আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, তাই না?'

'ওভাবে বলিস না। ও-ও তো কম কষ্ট পায়নি তুই এভাবে চলে যাওয়ায়।' অদিতি হঠাৎ প্রসঙ্গ বদল করলেন, পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছ, পার্থ। আমি কিন্তু আরও ভেজে রেখেছি, দেব।'

তিথি হাসছিল, 'ও খুব আস্তেই খায় মা, বাড়িতেও ওইরকম।'

'তাই বুঝি! আমি ভাবলাম বোধ হয় ভালো লাগছে না খেতে—' অদিতির গলায় সংশয়।

'না, না, মা, দারুণ হয়েছে, ভালো লাগবে না কেন?' তিথি প্রতিবাদ করে উঠল, 'উফ্ কতদিন পর এই পরোটা খাচ্ছি! এই, তুমি কিছু বলছ না যে?'

পার্থর মুখ কঠিন হয়ে আসছে, সে নীরস গলায় বলল, 'এইসব ভাজা খাবার আমি ঠিক পছন্দ করি না।'

বিশ্বনাথ এতক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। পার্থর কথা শুনে ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'তাই তো, তাই তো! ভাজা খাবার—এঃ হে,' বিশ্বনাথ অদিতিকে অনুযোগ করলেন, 'তুমি আর কিছু করতে পারলে না?'

অদিতি কোনো উত্তর দিলেন না, তাঁকে অন্যমনস্ক লাগছিল। তিথি অবাক হয়ে পার্থকে দেখতে দেখতে বলল, 'কই, তুমি ভাজা খাবার খাও না, আমি জানি না তো? তুমি তো তেলেভাজা খেতে ভালোবাসো, ওটা বুঝি ভাজা নয়?'

পার্থ গম্ভীর মুখে পরোটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বিশ্বনাথ ফ্যালফ্যাল করে একবার তার দিকে একবার মেয়ের দিকে দেখছিলেন। ঘরে ক্রমশ যেন একটা দুরারোগ্য নৈঃশব্দ্য নেমে আসছে। অদিতি হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিথিকে বললেন, ‘গায়ে গরম কিছু দাওনি, বাইরে তো বেশ ঠান্ডা।’

তিথি মুখ তুলে তাকাল, কিছু বলল না। তার দৃষ্টিতে কী ছিল, অদিতি যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, ‘ও হ্যাঁ, তোর জামাকাপড় এখানে যা যা আছে সবই তো গুছিয়ে রেখেছি। ওগুলোও আজ তাহলে নিয়ে যা?’

‘একসঙ্গে সব নিয়ে যাব না। কয়েকটা চুড়িদার আর কার্ডিগান নিয়ে যাব আজ। শাড়ি পরে কলেজ যেতে অসুবিধে হয়।’ তিথি কথাগুলো বলল পার্থর দিকে না তাকিয়ে, শক্ত মুখে।

অদিতি উঠলেন, ‘তাহলে আয়, দ্যাখ কোনটা কোনটা নিবি। আমি বের করে দিচ্ছি।’

তিথি ভেবেছিল, একসঙ্গে সব না নিয়ে গিয়ে একটু একটু করে তার জামাকাপড় আর বইপত্র ওবাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু ঘরে এসে অদিতি যখন আলমারি খুললেন, তিথির মাথায় একটা ছোট্ট চক্কর দিয়ে উঠল। এ কী! তার এত জামাকাপড়। আলমারির একটা তাক পুরো ঠাসা। অদিতি সব একজায়গায় করে থরে থরে গুছিয়ে রেখেছেন। তিথি একদৃষ্টে দেখছিল। তার মনের মধ্যে অনেক চিন্তার ভিড়, চিন্তাগুলো পরস্পর ঠেলাঠেলি করছে। এতদিন তো তার ধারণা ছিল তার পোশাকের সংখ্যা যথেষ্ট কম। মৌসুমীর রাশি রাশি নিত্যনতুন পোশাকের পাশে তার পুঁজি ছিল নিতান্তই সামান্য। যদিও এ নিয়ে তার কখনো কোনো ক্ষোভ বা হীনম্মন্যতা হয়নি কেননা সে তো মৌসুমীর প্রতিযোগী ছিল না। কিন্তু আজ তার সেই ধারণাটা একটা বিরাট ধাক্কা খেয়ে গেল। সে দেখল, তার পোশাকের সেই নেহাত মধ্যবিত্ত সংখ্যাটিই পার্থদের বাড়ির পক্ষে রীতিমতো বিসদৃশ। এমনকি, এর সবটুকু ওখানে নিয়ে গিয়ে রাখারও কোনো জায়গা নেই।

অদিতিও ওইদিকেই তাকিয়ে ছিলেন, গাঢ় গলায় বললেন, ‘তোর চিঠি পাওয়ার পর গুছিয়ে রেখেছি। কিছুই না নিয়ে চলে গেলি, আমি সব আগলে বসে আছি কতদিন বল তো! যা, সব নিয়ে যা, দাঁড়া, সোয়েটারগুলো বার করি।’

তিথি আস্তে আস্তে বলল, ‘এত জামা নিয়ে যাওয়া যাবে না।’

‘আজ যে ক–টা পারিস নে। আবার পরে এসে নিয়ে—’

‘না মা! ওখানে এত জামা রাখার জায়গা নেই।’

‘মানে?’ অদিতি বুঝতে পারছেন না।

তিথির কান্না পাচ্ছিল, দু-তিনটে ঢোঁকের সঙ্গে কান্নাটাকে গিলে ফেলে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, ‘কোথায় রাখব?’

‘সে আবার কী? ওরা জামাকাপড় কোথায় রাখে!’

‘দু-তিনটে বাক্স আছে, সেগুলো তো সব ভরতি!’

‘বাক্স!’ অদিতি যেন প্রতিধ্বনি করলেন, ‘বাক্স! বাক্সে জামাকাপড় থাকে, আলমারি নেই!’

তিথি হঠাৎ রেগে উঠল, ‘নেই তো নেই, কী হয়েছে তাতে? এমন করছ যেন বাক্সে জামাকাপড় রাখা যায় না!’

অদিতি স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। তাঁর আর কিছু বলারও ছিল না। আজ দরজা খুলে তিথিকে দেখেই তিনি বুঝেছিলেন সে কেমন

আছে, কিন্তু সে সম্বন্ধে একটা কথাও উচ্চারণ করেননি তিনি। তিনি ঠিকই করে রেখেছিলেন কোনো প্রশ্ন করবেন না, কোনো মন্তব্যও নয়। কিন্তু প্রায় আপনা থেকেই যে তথ্য প্রকাশ হয়ে গেল, তা থেকেই অদিতি বেশ বুঝতে পারছিলেন তিথি কেমন সংসারে গিয়ে পড়েছে। তাঁর বুক ভেঙে যাচ্ছে তবু তিনি আত্মসংবরণ করলেন।

তিথি কয়েকটা জামা বের করে বিগশপারে ভরল। অদিতি তার রোগা রোগা হাতের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এত সরু কি ছিল ওর কবজি! শাঁখা-পলাগুলো ঢলঢল করছে। তিথি সেগুলো গুঁজে দিতেই সেগুলো কনুইয়ের কাছে গিয়ে উঠল।

বলব না বলব না করেও অদিতির মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, 'হাতে ওইসব পরেই কলেজ যাও নাকি তুমি!'

তিথি মুখ না তুলেই বলল, 'হ্যাঁ, কেন?'

'তুমি একজন স্টুডেন্ট, তিথি। তোমার শাঁখা–টাখা পরার কী দরকার? কপালে অত টেনেই–বা সিঁদুর পরেছ কেন? স্বাভাবিকভাবেও তো পরা যায়।'

তিথি ভেতরে ভেতরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই কারণেই সে বাইরে ফোঁস করে উঠল, 'পরেছি তো কী হয়েছে, অন্যায় কিছু তো করিনি।'

অদিতি ঠান্ডা গলায় কথা বলছেন, কিন্তু তাঁর চোখ তীব্র হয়ে উঠেছে, বললেন, 'অন্যায় নয়, একেবারেই অন্যায় নয়। তবে দেখতে খুব ভালো লাগছে না। অন্তত আমার চোখে। আমার ধারণা ছিল তোমার রুচি ঠিক এরকম হওয়ার কথা নয়—'

'তুমি সিঁদুর পরোনি কেন, চুড়ি খুলে ফেলেছ কেন? আমাকেও বুঝি তোমার মতোই হতে হবে!'

অদিতি অনেকক্ষণ থেকেই এই প্রশ্নের জন্যে তৈরি ছিলেন। অদ্ভুত একটা কষ্টের হাসি হেসে বললেন, 'কেন যে আমি সিঁদুর ছেড়েছি, হাত খালি রেখেছি সেটা এত অল্প সময়ে তোকে ঠিক বোঝাতে পারব না রে। তবে তুই চলে যাওয়ার পরই আমার মনে হল এসব আর মানব না। সত্যি বলতে কী, কোনোদিনই আমি ভেতর থেকে এটা মেনে নিতে পারিনি যে বিয়ের পর শুধু মেয়েদেরই সর্বাঙ্গে বিবাহিতের চিহ্ন ধারণ করতে হবে।' অদিতি লম্বা একটা শ্বাস টানলেন, 'তবে সেটা আমার বিশ্বাস, যেটা আমি বিভিন্ন কারণে নিজেই এতদিন মেনে চলতে পারিনি। মেনে চলাই উচিত ছিল। তোমাকেও আমি সেই কথাই বলব। আমার মতো কেন, তুমি কারও মতোই হবে না। তুমি শুধু নিজের মতো হবে। শুধু নিজের মতো।'

তিথি বেশ অবাক হয়েই অদিতির দিকে তাকিয়ে ছিল। সে ঠিক এইভাবে মাকে কথা বলতে শোনেনি কখনো। সে ভেবেছিল, মা বলবেন, 'আমি সিঁদুর পরিনি আমার ইচ্ছা।' তাহলে উত্তরে সেও বলত, 'আমিও যেভাবে সিঁদুর পরেছি সেটা আমার ইচ্ছা!' যদি অদিতি অনেকটা সেইরকম কথাই বললেন, তবু তিথির মনে হল, কী যেন একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ইচ্ছে আর বিশ্বাস ঠিক কতটা আলাদা! তিথি ভাবার চেষ্টা করছিল। অদিতির শেষ কথাগুলো আরও নাড়া দিয়েছে তাকে। সে তার নিজের মতোই হতে চায়, এ কথা সত্যি। অদিতি কি মনে করছেন, সে আর নিজের মতো নেই! তিথি কথাটা মনে মনে তোলা-ফেলা করছিল, মুখে কিছু জিজ্ঞেস করল না।

কার্ডিগান গায়ে চাপিয়ে বসার ঘরে আসতেই পার্থ উঠে দাঁড়াল, 'চলো তিথি, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

বিশ্বনাথ দ্রুত একবার অদিতির দিকে তাকালেন, অদিতি বললেন, 'বলো, তুমিই বলো'।

তিথি বুঝতে পারছিল না মা-বাবা কী বলতে চাইছেন। বিশ্বনাথ পার্থকে বললেন, 'একটু বোসো। তোমাদের সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিই।'

'হ্যাঁ, বলুন।' পার্থ দাঁড়িয়েই থাকল। তার ভঙ্গিমা ঈষৎ উদ্ধত, যেন আক্রমণের আশঙ্কায় সে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত। তিথির অস্বস্তি হচ্ছিল।

বিশ্বনাথ বললেন, 'তোমরা তো রেজি করেছ। কিন্তু এ ছাড়া তোমাদের বাড়ি থেকে কোনো অনুষ্ঠান করা হয়েছে কি? মানে, এই আত্মীয়স্বজনকে জানানোর জন্য আর কি!'

পার্থর মুখে পর পর ভাবপরিবর্তন হচ্ছিল। সে চোখ সরু করে বলল, 'নিশ্চয়ই হয়েছে। মা ওকে লোহা-টোহা দিয়ে বরণ করেছেন, সিঁদুর পরানোর অনুষ্ঠান হয়েছে। আত্মীয়স্বজনরাও সবাই জানেন।'

বিশ্বনাথ কিছুক্ষণ পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করলেন, তারপর বললেন, 'বেশ। আমরা ভেবেছি একটা রিসেপশনের আয়োজন করব। তোমরা বিয়ে করেছ, এই কথাটাই জানিয়ে সবাইকে নেমন্তন্ন করা আর কি—'

অদিতি মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'কোনো আচার-অনুষ্ঠান নয়, উপহার-টুপহারও নেওয়া হবে না। শুধু সবাই আসবে, আলাপ-পরিচয় হবে। সবাই বলতে বেশি কেউ নয়, খুব ঘনিষ্ঠ যারা তারাই শুধু—'

বিশ্বনাথ অনুমোদনের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, একেবারেই ছোটো করে। আমার মনে হয় এটা জয়েন্টলি করলেই সব থেকে ভালো হয়। তোমরা বোধ হয় রিসেপশন কিছু করোনি, একসঙ্গে দু-পক্ষেরই হয়ে যাক তাহলে। তোমাদেরও দিককার আত্মীয়স্বজনরাও এলেন, আমাদেরও—'

তিথির খুব আনন্দ হচ্ছিল। এরকম কোনো সম্ভাবনার কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে জানে, তার বিয়েতে এরকম কিছু হয়নি বলেই পার্থর আত্মীয়স্বজনদের কাছে তার কোনো সামাজিক স্বীকৃতি নেই, বরং একটা অব্যক্ত অসম্মানই আছে। আজ

অপ্রত্যাশিত সুরাহার সম্ভাবনায় সে আপ্লুত হয়ে গেল। পার্থর হাত ধরে বলল, ‘সত্যি, কী ভালো হবে, বলো! এটাই সবচাইতে ভা—’

তিথি কথা শেষ করতে পারল না। পার্থ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বাধা দিল, শক্ত গলায় বলল, ‘না। আপনারা যা করতে চান করুন। আমাদের বাড়ি থেকে আলাদা ব্যবস্থা করা হবে। একসঙ্গে করার দরকার নেই।’

ঘরের পরিবেশ থমথমে হয়ে উঠছিল। অদিতি বললেন, ‘তাহলে আমরা দিন-টিন ঠিক করে ফেলছি। তমাল কবে ছুটি পায় দেখি। তারপর জানাব।’

পার্থর চপ্পল পরা হয়ে গেছে। তিথি একটু সময় নিয়ে জুতো পরছিল, তার জুতোটা ছিঁড়ে এসেছে, সে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘মা, আমার সেই কালো ব্যালে শু-টা আছে না? পরের দিন এসে নিয়ে যাব।’

অদিতি নীরবে ঘাড় নাড়লেন, তাঁর খুব ইচ্ছে করছিল বলতে যে তিথি তুই আজকের রাতটা এখানে থেকে যা।

তিথি সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল, ‘বাবা আসছি, আসছি মা। তোমরা বলোনি, কিন্তু আমি আবার আসব, হ্যাঁ?’ তার কথার মধ্যে একটা ছেলেমানুষি ছিল, অদিতির প্রাণে খুব বাজল। তিনি বললেন, ‘ওভাবে বলতে নেই তিথি, নিজের বাড়িতে আসবে না? যখন ইচ্ছে আসবে। আমরা তো একা একাই পড়ে আছি। পার্থকে অবশ্য আমাদের আলাদা করে বলা উচিত’, অদিতি হাসছিলেন, ‘আবার এসো, পার্থ!’

পার্থ জবাব দিল না, দরজা খুলে বাইরে চলে গেল।

বাড়ি ফেরার পথে পার্থ কোনো কথা বলল না, তিথিও না। বাড়ি ফিরে তিথি অবাক হয়ে দেখল, পার্থ খেতে বসছে। সুধা তাকেও খেতে দিচ্ছিলেন, তিথি বলল, 'না বড়োমা, আমি আর খাব না। মায়ের কাছে গিয়ে খেয়েছি তো!'

হাত মুখ ধুয়ে অলকের বিছানা করে মশারি টাঙিয়ে দিল তিথি। মশারির কোনা গুঁজতে গুঁজতে অনবরত তার মনে হচ্ছিল পার্থ পাঁচটা পরোটা খেয়েছে, মা প্রথমবারই ডিশে পাঁচটা করে দিয়েছিলেন। পরোটাগুলো খুব ছোটো ছোটোও নয় যে বাড়ি আসতে আসতে খিদে পেয়ে যাবে। তাহলে!

তিথি ওপরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আজ পার্থর আসতে যে অনেক দেরি হবে সে জানে। সুধা নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন তিথিদের বাড়িতে আজ কী কী হল, তিনি জানতে না চাইলেও পার্থ বলবে। তিথি ঘুমিয়ে পড়তে চেষ্টা করছিল, কিন্তু পারছিল না। তারও পার্থর কাছে কিছু জানতে চাওয়ার আছে।

তিথির তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। পার্থ দরজায় কড়া নাড়তে সে উঠে দরজা খুলে দিল। পার্থ ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে আলো নিভাতে যাবে, তিথি আর ধৈর্য রাখতে পারল না, বলে উঠল, 'তুমি না বললে কেন?'

পার্থ চমকে উঠেছিল, বলল, 'কীসে না বললাম?'

'একসঙ্গে রিসেপশনটা হয়ে গেলেই তো ভালো হত!'

পার্থ আলো নেভালো না, সুইচ থেকে হাত সরিয়ে নিল। ধীরেসুস্থে চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল, 'কেন না করলাম, বোঝোনি?'

'না তো, কেন!' তিথির গলায় বিস্ময়, তার মুখেও!

'তোমাদের বাড়ির সঙ্গে আমাদের ফ্যামিলির অনেক তফাত, তিথি! মেনলি সেটা তোমার মায়ের জন্যে। অদ্ভুত ভদ্রমহিলা। প্রথমবার যখন দেখেছিলাম তখন তাও ঠিকঠাক ছিলেন, আজ তো দেখলাম একেবারে যাচ্ছেতাই! বাবা বেঁচে তবু সিঁদুর পরেন না। এসব দেখলে আমার মা-বাবা-আত্মীয়স্বজনের রিঅ্যাকশন কেমন হবে বুঝতে পারছ?'

তিথির ব্রহ্মতালু অবধি শুকিয়ে উঠছে, তার ঠোঁট নড়ছে কিন্তু কোনো স্বর বেরোচ্ছে না, তার চোখ বিস্ফারিত কিন্তু দৃষ্টি শূন্য।

পার্থর তখনও বক্তব্য শেষ হয়নি, সম্ভবত নীচে একবার এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়ে যাওয়ায় শব্দগুলো তার মুখের মধ্যে খুব গোছানো ছিল, 'সবাই তো ভাববে আমি মুসলমান কিংবা ক্রিশ্চান বিয়ে করেছি। সেটা সত্যি হলেও একরকম কথা ছিল, আমি পরোয়া করতাম না। কিন্তু হিন্দুদের তো একটা নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। আমার মাকে দ্যাখো, কপালে সিঁদুর, বড়ো খোঁপা, হাতে শাঁখা-পলা, কী পবিত্র মায়ের চেহারা। তোমার মাকে দেখে, কিছু মনে কোরো না তিথি, আমার মা বলে ভাবতেই ইচ্ছে করেনি। তোমার বাবা অনেক বেটার। তবে তিনিও তোমার মাকে কিছু বলেন না কেন বুঝতে পারছি না। অবশ্য তোমার মা মনে হয় খুব একগুঁয়ে মহিলা—'

তিথি চিৎকারকরে উঠল, 'পার্থ! অনেক বলেছ। আর একটাও কথা বলবে না।'

পার্থ মুখটা করুণ করল, 'সরি তিথি। তোমার শুনতে খারাপ লাগারই কথা। কিন্তু তুমি তো ঠিক করেছ, আমার কাছে চলে এসেছ, তোমার মায়ের মতো হওনি। কিছুদিন ও বাড়িতে থাকলে তোমারও সর্বনাশ হয়ে যেত।' পার্থ উঠল। আলো নেভালো। তিথি এখনও ক্যাম্পখাটের ওপর কাঠের মতো বসে আছে। পার্থ হাই তুলে বলল, 'শোবে না? ভয় নেই, চিন্তা কোরো না। আমার মনে হয় মায়ের কাছে তোমার বেশি যাওয়া-টাওয়া উচিত হবে না, বুঝলে? নাও এবার শুয়ে পড়ো।' পার্থ তিথিকে টানল। তিথি তখন সম্পূর্ণ অসাড়। পার্থ তার শরীরের ওপর উঠে আসার পরও সে বাধা দিল না। তার কোনো অনুভূতি কাজ করছে না। বার কয়েক ঝাঁকুনি খাওয়ার পর সে খুব ক্লান্ত গলায় বলল, 'এখনও হয়নি!'

২

পার্থদের বাড়ির কাছাকাছি এসে অদিতিরা তিন জন যখন গাড়ি থেকে নামলেন, তখন সকাল আটটা। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এতদূর আসা গেছে, বাকিটাও ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে এগোতে হবে।

গাড়িটা ঠিক করেছে তমাল। কলকাতায় ফিরে অবধি তাকে ক্রমাগত ছোটাছুটি করতে হয়েছে। এক বন্ধুর দাদার প্রেস থেকে এক রাত্তিরের মধ্যে কার্ডও ছাপিয়ে ফেলেছে সে। আজ সেই কার্ড নিয়ে নেমন্তন্ন করতে বেরোনো হয়েছে। প্ল্যান আছে একদিনের মধ্যেই সব সেরে ফেলা হবে। হাতে বেশি সময় নেই, পরশু দিনই রিসেপশন। একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, খাওয়া–দাওয়ার দায়িত্বও ক্যাটারিং সার্ভিসের।

অনেকক্ষণ থেকেই অদিতির বুক ধুকপুক করছিল। যে অলিগলির মধ্যে দিয়ে গাড়িটা এগোচ্ছিল, সেই গলিগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায় অঞ্চলটা খুব পুরোনো, আর নোংরা। সরু সরু গলির পাশে খোলা নর্দমা, নর্দমার ধারে রাশি রাশি তরকারির খোসা আর মাছের কাঁটা ছড়ানো। বাড়িগুলোও ছিরিছাঁদহীন। অদিতি প্রতিটি বাড়ি দেখেই ভাবছিলেন, তিথি কি এই বাড়িটায় থাকে, এই বাড়িটা! পার্থদের বাড়ি সম্বন্ধে তাঁর মনের মধ্যে একটা ধারণা আঁকা ছিল।

অবশেষে যখন বাড়িটা খুঁজে পাওয়া গেল, অদিতির মনে হল কেউ তাঁর পাঁজরগুলো ভয়ংকর জোরে খামচে চেপে ধরেছে। তিনি খুব নির্মম হাতেই মনে মনে তিথির শ্বশুরবাড়ির সম্ভাব্য ছবিটা এঁকেছিলেন, কিন্তু এই বাড়িটা তার ধারেকাছেও আসে না। এটা বাড়ি, না বাড়ির প্রেতাত্মা! অদিতির মনে হল, হেলে পড়া বাড়িটা যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মতো গুঁড়ি মেরে বসে আছে। তাঁর কপালে ঠান্ডার মধ্যেও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। এত বাড়ি পেরিয়ে এলেন, তিথি তো তার মধ্যেই কোনো একটাতে থাকতে পারত! তা না হয়ে এই চূড়ান্ত কুৎসিত বাড়িটাতেই তিথি থাকে, এটা মেনে নিতে অদিতির যন্ত্রণা হচ্ছিল। তিনি

কোনোক্রমে বললেন, 'এই বাড়ি!' তাঁর স্বরে অবিশ্বাস।

থমকে গেছিলেন বিশ্বনাথও। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন বাড়িটার দিকে। তমালকে দেখে মনে হল সে জোর করে শক্ত থাকার চেষ্টা করছে। অদিতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'ফোরটিন সি, এটাই তো হবে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, একটু দাঁড়াও। দেখে আসছি।'

তমাল ঘাসজঙ্গল ডিঙিয়ে একতলার বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল, তারপর বারান্দায় পা দিল। বারান্দার দরজাটা আধখোলা। অদিতি দেখতে পাচ্ছিলেন তমাল কারও সঙ্গে কথা বলছে। একটু পরে তমাল তাঁদের দিকে ফিরে ইশারা করে ডাকল। অদিতি একবার বিশ্বনাথের দিকে তাকালেন, বিশ্বনাথের মুখেও অবিশ্বাস আর কষ্টের দাগ। অদিতি চাপা গলায় বললেন, 'এই বাড়িটাই। চলো।'

তাঁরা কয়েক পা এগোতেই বারান্দায় ছুটে বেরিয়ে এল তিথি। তার চুল উশকোখুশকো, পরনের শাড়িটাও আলুথালু। তার বাঁ–হাতে একটা বাটি, হলুদমাখা ডান হাতে একটা পাতলা বেগুনের ফালি। রান্নাঘরে বেগুনে নুনহলুদ মাখাচ্ছিল সে, যখন সীমা গিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছে, 'তিথি শিগগির এসো, তোমার মা-বাবা এসেছে, দাদাও।'

তিথি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে একেবারে বাচ্চা মেয়ের মতো লাফালাফি শুরু করেছে, তার সারা চোখেমুখে আনন্দ বিস্ময় মাখামাখি। সে বারবার বলছে, 'ও মা, তোমরা চলে আসবে আমি ভাবিইনি—এসো, এসো, দাদা কবে এলি!'

পার্থর সঙ্গে সেদিন যাওয়ার পর তিথি মা-বাবার কাছে আর যায়নি। তমাল কবে এসেছে, কবে রিসেপশনের দিন স্থির হয়েছে এসব সে কিছুই জানে না।

সুধা অভ্যর্থনা করলেন, ‘আসুন আসুন। সীমা ওপর থেকে মোড়া নিয়ে আয় তো। তিথি হাত–টাত ধুয়ে এসো না।’

অদিতি হাসিমুখে বললেন, ‘আবার মোড়া কেন! এই তো এখানে বসছি।’ তিনজনেই তক্তপোশে বসলেন। বিশ্বনাথের মুখে কোনো কথা নেই। তমালও নিঃশব্দে নখ খুঁটছে। সে বিয়ের পর তিথিকে এই প্রথম দেখল, এখনও ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

অদিতি সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন! দেখুন, আমাদের সম্পর্ক হয়েছে কিন্তু পরিচয় নেই। আমি তিথির মা, উনি তিথির বাবা, আর ও তিথির দাদা তমাল। নমস্কার।’

সুধার মনে হল, এভাবে আবার পরিচয় দেওয়ার কী আছে, তিনি কি বুঝতে পারছেন না কে কোন জন! অদিতিকে নমস্কার করতে দেখে হকচকিয়ে গেলেন তিনি, প্রতিনমস্কারের কথা তাঁর মাথায় এল না।

অদিতিরা আসার আগে সীমা সকালে ছাত্রছাত্রীদের পড়াচ্ছিল। তাদের বসিয়ে রেখে হন্তদন্ত হয়ে সে ওপরে মাধবীর কাছে গেছে। পার্থ তখনও ওপরের ঘরে ঘুমোচ্ছে। তিথি হলুদের হাত না ধুয়েই পার্থকে ডাকতে গেল। তার গায়ে নাড়া দিয়ে বলল, ‘এই ওঠো, শিগগির ওঠো। মা বাবা দাদা সবাই এসেছেন, নিশ্চয়ই রিসেপশনের দিন ঠিক হয়ে গেছে, শিগগির নীচে এসো। আমি যাচ্ছি।’

পার্থ তড়াক করে উঠে বসে চোখ মুছছিল। তিথি ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছে। সে হাত ধুয়ে ঘরে আসতেই অদিতি বললেন, ‘তিথি, তুমি ছিলে না, আমরা নিজেরাই আলাপ-পরিচয় করে নিলাম—’

বিশ্বনাথ বললেন, ‘ইয়ে, মিস্টার মল্লিক বুঝি বাড়ি নেই?’

'উনি তো বাজারে গেছেন—' সুধা অসহায় বোধ করছিলেন। অদিতি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাদের বড় অসুবিধেয় ফেললাম, সকালবেলাটায় সবাই ব্যস্ত থাকেন। আসলে আমরা একদিনে সব সারব বলে বেরিয়েছি। পরশু দিনই রিসেপশন—' অদিতি কার্ড বার করতে করতে তিথির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পার্থ কোথায়?'

তিথিও ভাবছিল, পার্থ এত দেরি করছে কেন!

মাধবী সীমার সঙ্গে দুটো মোড়া নিয়ে নীচে এলেন। তিথি এগিয়ে গেল, 'এসো, বড়দি, এসো মাধুবউদি—আমার মা, বাবা, দাদা। মা, এই যে আমার বড়দি আর ইনি মাধুবউদি।'

মাধবী ঝরঝর করে হাসলেন, 'সত্যি আপনারা মেয়ের বাড়িতে এলেন তাহলে! আমি জানতাম সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে চিন্তা করে করে তিথি শরীরটা খুব খারাপ করে ফেলেছে।' মাধবী বসতে গিয়েও উঠে পড়লেন, 'বসুন, চা আনি।'

'না না, চা খেয়েই তো বেরিয়েছি', বিশ্বনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আজ বরং থাক। আজ একটু তাড়াতাড়ি উঠব। মিস্টার মল্লিকের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত, তা ওঁর বোধ হয় একটু দেরিই—'

অদিতি কার্ড বার করে সুধার হাতে দিতে গেলেন, সুধা একটু ব্যাকুল গলায় বলেলন, 'উনি এক্ষুনি এসে যাবেন, ওঁকেই কার্ডটা দিলে ভালো হয়। আপনারা আর একটু বসুন।' সুধা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সারা মুখে দুশ্চিন্তা আর অস্বস্তি।

তিথি বলল, 'মা, মাধুবউদিকে নেমন্তন্ন করব, আমাকে একটা কার্ড দেবে?'

অদিতি হাসলেন, 'নিশ্চয়ই। তোমার জন্যে গোটা পাঁচেক কার্ড আলাদা করা আছে। তোমার কাকে কাকে বলতে ইচ্ছে হয়

বলবে।'

তিথি কার্ডগুলো নিয়ে একটা কার্ডে নাম লিখতে লিখতে বলল, 'তোমার নামই লিখলাম মাধুবউদি। মাধুবউদি অ্যান্ড ফ্যামিলি। তুমি, সলিলদা, আর রুম্পা, সবাইকে আমার বিয়ের নেমন্তন্ন।' তিথি হাসছিল।

তখনই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন অলক। তাঁর হাতে বাজারের থলে। তিনি হইহই করে বলছিলেন, 'আরে কী কাণ্ড কী কাণ্ড অ্যাঁ! আপনারা এসেছেন! আমি তো কিছুই জানতাম না। সবে বাজারে গিয়ে ঢুকেছি, আর—'

তাঁর প্রায় সঙ্গেই ঘরে ঢুকল পার্থ। সুধা বলে উঠলেন, 'তুমি জানলে কী করে—'

'আরে পার্থ তো গিয়ে ধরল আমাকে বাজারে। আমি সবে কাঁচালঙ্কাটা দর করছি আর ও গিয়ে আমায় টানতে লেগেছে। দৌড়োতে দৌড়োতে এসেছি, বাব্বা! এঁদের চা-টা দাওনি নাকি? চা করো চা করো, সেইসঙ্গে আমাকেও এক কাপ—'

'না না, আমরা চা খাব না।' অদিতি কার্ডটা অলকের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'আপনারা সবাই যাবেন দয়া করে। আগামী পরশু, বৃহস্পতিবার...'

মাধবী চা করে নিয়ে এলেন। তাঁর হাতে দুটো কাপ, সীমার হাতে দুটো। বিশ্বনাথ বললেন, 'আহা, সেই আবার চা করলেন—'

'নিন, এই শুধু চা আর বিস্কুটই। তিথি মোড়া দুটো এগিয়ে দে না, ওর ওপরে রাখি।' মাধবী অলকের দিকে তাকালেন, 'হাফ কাপ বেশি হয়েছে দাদা, ওইটে আপনার।'

তিথি উশখুশ করছিল, বলল, 'মা, চা-টা নিয়ে চলো ওপরে যাবে, আমি কোথায় থাকি দেখবে, বড়োমা মাকে নিয়ে যাই?'

সুধা সারাক্ষণ প্রায় ছায়ার মতো দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়েছিলেন, বিশেষ কোনো কথা–টথা বলছিলেন না। এখনও তিনি কিছু বলার আগেই অলক বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, একশোবার যাবে। যান আপনারা সবাই ওপরে যান ওর সঙ্গে।'

পার্থও ঘরে এসে অবধি একটাও কথা বলেনি। তিথি হঠাৎ যেন কী একটা আন্দাজ করেই দ্রুত পার্থর দিকে তাকাল। পার্থর দৃষ্টি কঠিন। সেই দৃষ্টি অনুসরণ করে তিথির চোখ পড়ল তমালের ওপর। তমালও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পার্থর দিকে। তার দৃষ্টি ঠান্ডা, কিন্তু তার মধ্যে ঘৃণার আভাস লুকোনো নেই। তিথি এগিয়ে গিয়ে পার্থর হাত ধরল, হাসতে হাসতে বলল, 'ও, দাদার সঙ্গে তোমার তো আলাপ করানো হয়নি। এসো—' তিথি পার্থর হাত ধরে তমালের সামনে নিয়ে এসে বলল, 'এই যে আমার দাদা। দাদা, পার্থ।'

তমাল সামলে নিয়ে হাত বাড়াল। তিথির মনে হল পার্থ বুঝি হাত বাড়াবে না। কিন্তু একটু সময় নিয়ে পার্থ হাত বাড়িয়ে তমালের হাত স্পর্শ করেই নামিয়ে নিল। তার চোখের দৃষ্টির কোনো পরিবর্তন হল না। তিথি বলল, 'চলো, আমরা ওপরে যাই, আয় দাদা।'

'মা বাবাকে নিয়ে যা, আমি আর নাই গেলাম।' তমাল মাথা নাড়ল, 'আমি এখানেই বসছি।'

বিশ্বনাথের মন চায়ের কাপে, কিন্তু অদিতির চোখ কিছুই এড়াল না। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, ও আর গিয়ে কী করবে, ও এখানেই থাক। চলো পার্থ, আমরা যাই।'

তিথি অদিতি আর বিশ্বনাথকে নিয়ে ওপরে চলে গেল। পার্থও গেল সঙ্গে। সুধা আর অলকও ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। সীমা তার আগেই পাশের ঘরে পড়াতে চলে গেছে। তমাল প্রাণপণে নিজেকে সহজ রাখার চেষ্টা করছিল। পার্থর প্রতি তার যাবতীয় অসন্তোষ সে ঢেলে দিচ্ছিল ডান হাতের বুড়ো আঙুলের নখে, দাঁত দিয়ে নখ ছিঁড়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। হঠাৎ মাধবী কথা বলে উঠলেন, 'বোনকে বড্ড ভালোবাসো, না?'

তমাল চোখের জল ঢাকতে দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

মাধবী বললেন, ‘চিন্তা কোরো না, এরকম কত হয়! তিথি খুব ভালো মেয়ে, ও ঠিক সব সামলে নেবে। এবার পাশটা করে গেলে—’

তমাল এক ঝটকায় ঘাড় ঘুরিয়ে মাধবীর চোখে চোখ ফেলল, ‘আপনি জানেন না, তিথি ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট। পাশ ও অবশ্যই করবে, ওকে আটকানো যাবে না।’

মাধবী হাসছিলেন, ‘তবে!’

তিথি ঘরে ঢুকে জানলা খুলে দিল। বিছানাটা এলোমেলো হয়ে আছে। দ্রুত হাতে সেটা একটু পরিষ্কার করতে করতে বলল, ‘এসো মা, এসো বাবা। এই ঘরে আমি থাকি, মানে আমরা—’

অদিতি সবরকম মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ঘরে পা দিয়েছিলেন। তিনি নিঃশব্দে চারিদিকে একবার চোখ বুলালেন। বিশ্বনাথ পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ও, এই ঘরটাও ভাড়া নিয়েছ, নাকি? ফাঁকাই ছিল?’

পার্থ নির্বিকার মুখে বলল, ‘হ্যাঁ এটা ফাঁকাই পড়ে ছিল, পাশের ঘরে একটা ছেলে ভাড়া থাকে।’

তিথি বলে উঠল, ‘না না, আমাদের ভাড়া দিতে হয় না। বাড়িওয়ালা এমনি থাকতে দিয়েছেন। মাধুবউদিই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সব। মা দ্যাখো, ওই খাটটাও মাধুবউদি দিয়েছেন আমাদের শোয়ার জন্য।’

তিথি খুশির স্বরেই কথাগুলো বলছিল। অদিতি বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। তাঁর চোখ ক্যাম্পখাটটার দিকে, বিছানাটা অনেকখানি

ঝুলছে। এইটুকু সরু খাটে দুজনে কী করে শুতে পারে তিনি বুঝতে পারছিলেন না। ঘরটা সম্পূর্ণ নিরাভরণ, এককোণে একটা রং-ওঠা কাঠের চেয়ারের ওপর তিথির জামাকাপড় ভাঁজ করা। দেয়ালের তাকে তিথির খাতাবই আর কলেজের ব্যাগ। অদিতির ধাঁধা লাগছিল। এই ঘরে কোনো গৃহস্থ দম্পতি বাস করার চিহ্নই নেই, নেই পার্থর ব্যবহার্য কোনো জামাকাপড়ও। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে বললেন, 'বাঃ, বেশ ঘর। আমরা আস্তে আস্তে যা দেব–টেব সব এই ঘরেই রাখবে তো?'

অদিতি তিথির দিকে তাকিয়ে কথা শুরু করেও প্রশ্নটা রাখলেন পার্থর দিকে ফিরে। পার্থর মুখে এতক্ষণে হাসি ফুটল। সে ঈষৎ মাথা নেড়ে ঘাড় নীচু করতেই তিথির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'তোমরা দেবে মানে? কী দেবে?'

'ওমা, ওরকম করছিস কেন!' অদিতি তিথির দিকে তাকিয়ে হাসলেন, 'মেয়ের বিয়েতে লোকে কী দেয়? যা যা তোর দরকার—এই ধর খাটবিছানা, একটা আলমারি—'

'না! একদম না!' তিথির চোখমুখ অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। সবাই আশ্চর্য হয়ে তাকে দেখছেন, পার্থও। তবে পার্থর বিস্ময়ের সঙ্গে একটা বিরক্তি মেশানো।

তিথি কেটে কেটে বলল, 'আমার বিয়ে কি তোমরা দিয়েছ যে ওইসব দিতে হবে? আমি তোমাদের কাছ থেকে ওসব কিছু নেব না।' তিথি একটু থেমে জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট ভেজাল, বলল, 'আর তা ছাড়া, এই ঘরটা থেকে আমাদের যে–কোনো দিন চলে যেতে বলতে পারে, আমরা তো ভাড়া দিই না। এখানে খাট আলমারি রাখব কী করে? এই যা আছে ঠিক আছে, আর কিছু দরকার নেই।' সে জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল।

অদিতি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন, তিনি কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। পার্থর মুখ ক্রমশ রাগে শক্ত হয়ে উঠছিল, সেটা লক্ষ করেই অদিতি বললেন, 'আচ্ছা, সে পরে দেখা যাবে। আজ আমরা চলি, অনেক জায়গায় যেতে হবে। হ্যাঁ শোন, তুই কি কাল

রাত্তিরে ওখানে থাকবি? সেদিনের পর আর তো গেলিও না আমাদের কাছে—'

তিথি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছিল, বলল, 'সময় পাইনি মা, পরীক্ষাটা নিয়ে একটু টেনশন হচ্ছে। ঠিকঠাক পড়া হচ্ছে না তো। কাল...দেখি, বড়োমাকে জিজ্ঞেস করি...'

অদিতিরা নীচে নেমে এলেন। তিথি সুধাকে জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করল না। চিন্তা করে বলল, 'না মা, থাক। আমি এখানে না থাকলে বড়োমারা ওখানে গিয়ে হঠাৎ করে ফলস্ পজিশনে পড়বে না? তার চেয়ে আমি এখান থেকে সবার সঙ্গেই যাব।'

বিদায় নেওয়ার সময় সুধা রান্নাঘর থেকে এসে দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে অলক গায়ে জল ঢেলে নিয়েছেন, ভিজে লুঙ্গি পরে হি-হি করে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন, 'আবার আসবেন, দুগ্গা দুগ্গা। আমরা সবাই যাব পরশু।'

মা বাবা দাদা চলে যাওয়ার পর তিথির মাথার মধ্যে হঠাৎ একটা বিরাট শূন্যতা ঝাঁপিয়ে এল। কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তার পরেই প্রচুর প্রশ্ন মাথা তুলে দাঁড়াল সেই শূন্যতার বুকে। পার্থর সঙ্গে অনেক বোঝাপড়ার দরকার তার। কিন্তু এখন সেই সময় নয়। তাকে কলেজ যেতে হবে। পার্থও হয়তো বেরোবে। তিথি রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাত নেমে গেছে বড়োমা? বেগুনগুলো ভাজি?'

সুধা নীরস গলায় বললেন, 'সে বেগুন আমার কোনকালে ভাজা হয়ে গেছে। তোমার আর কিছু করতে হবে না। বাবা খেতে বসবে, গেলাসে জল-টল দেবে তো দাও।'

তিথি অপরাধীর মতো গেলাস নিয়ে জল ভরতে যাচ্ছিল। সত্যিই সে আজ রান্নাঘরের কোনো কাজ করতে পারেনি। সুধাকে সবই প্রায় একা হাতে সামলাতে হয়েছে। জল ভরে গেলাস হাতে বাইরে আসতে আসতে তিথি শুনল সুধা বলছেন, 'সাতসকালে

মানুষ মানুষের বাড়ি এভাবে আসে! এ কী হাঙ্গামা বাপু!' তিথি দাঁড়িয়ে পড়তেই সুধা মুখ তুলে বললেন, 'তা, তোমার মা বাড়িতে ব্যবস্থা না করে বাইরে বাড়ি ভাড়া করলেন কেন?'

একটু ভেবে তিথি বলল, 'আমাদের বাড়িটা খুব ছোটো বড়মা, অত লোকজন এলে কোথায় বসবে?'

'বরাবর দেখেছি বাড়ির ছাদেই ম্যারাপ-ট্যারাপ বেঁধে বিয়ে-অন্নপ্রাশন হয়!'

তিথি এবার ঠোঁট কামড়াল, ক্ষুব্ধ গলায় বলল, 'এটা আমার বিয়ের অনুষ্ঠান নয় বড়োমা, এটা রিসেপশন। মা বাবা আমার বিয়ে দিচ্ছেন না।'

কথাটা বলেই আর দাঁড়াল না তিথি। অলকের আসন পেতে জল রেখে বাথরুমে স্নান করতে চলে গেল। এক্ষুনি তার মাথাটা ঠান্ডা করা দরকার।

রাত্তিরে নীচের কাজকর্ম সেরে এক বালতি জল নিয়ে ওপরে চলে এল তিথি। রোজই ওপরের বাথরুমে জল রাখতে হয়, রাত্রে দরকার হতে পারে। হিমাংশু ফিরে তার ঘরে দরজা লাগিয়ে শুয়ে পড়েছে। তিথি ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে বই খুলে বসল। যদিও সে জানে আজ তার একবিন্দুও পড়া হবে না। মাথার ভেতরটা সারাদিন অগ্নিগর্ভ হয়ে রয়েছে। সে এক-একবারে ভাবতে চেষ্টা করেছে তার এত অশান্তির কারণ কী? ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছে, আসলে পার্থর সঙ্গে তার একটা ঝগড়া হওয়া দরকার। খোলামেলা সোজাসুজি একটা ঝগড়া। সেটা হচ্ছে না বলেই তার মনের মধ্যে কথা জমে জমে পাহাড় হয়ে উঠেছে। সেই পাহাড়টা একটা আগ্নেয়গিরি। তার মাথায় অষ্টপ্রহর গরম ধোঁয়া। ধোঁয়ার চাপে দম বন্ধ হয়ে আসে। লাভা না উগরানো অবধি স্বস্তি নেই।

তিথি চেয়ারে বসে ছিল। পার্থ ওপরে এসে দরজা বন্ধ করতেই সে-ও বই বন্ধ করল। পার্থ সেটা দেখে বলল, 'পড়বে না? আলো নিভিয়ে দেব?'

'না, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

পার্থ খাটে বসতে বসতে বলল, 'কী কথা? যা বলবে তাড়াতাড়ি বলো, আমি খুব টায়ার্ড।' পার্থ হাই তুলল, কিন্তু তার চোখে আত্মরক্ষার সতর্কতা।

তিথি ভাবছিল কোথা থেকে শুরু করবে। ভাবতে ভাবতেই বলল, 'না পার্থ, আমার একটু সময় লাগবে। তুমি আমাকে কখনো কোনো সময় দাওনি। আজ আমি সময় নেব। দরকার হলে সারারাত। অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর চাই আমার।'

'সে আবার কী? শোওয়ার সময় কী আরম্ভ করলে!'

'শোওয়ার সময় ছাড়া তোমাকে কখন পাই আমি, পার্থ? তখনও তো কোনো কথাই হয় না। সারাদিন তুমি আমার কোনো খোঁজই নাও না। আমি কেমন আছি, কী করছি তার কোনো খবর রাখো না। আমার তো তোমাকে কিছু বলার থাকতে পারে। যে কথাগুলো কারও সামনে বলার নয়, একেবারে নিজেদের মধ্যে বলার, ঘরের মধ্যে বলার কথা। কিন্তু তুমি তো শোওয়ার সময় ছাড়া এ ঘরে আসই না। কেন?'

পার্থ কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ওলটাল, 'আশ্চর্য, তুমি বলতে চাও আমি সবসময় তোমার সঙ্গে এই ঘরে বসে থাকব?'

'আমি আদৌ তা বলছি না। আমিও এ ঘরে সবসময় বসে থাকি না তুমি জানো। আমি বলতে চাইছি তুমি এ ঘরে বাস করো না।

শুধু রাত্তিরে আমার সঙ্গে শুতে আস। এটা অত্যন্ত অপমানকর। আমি তোমার স্ত্রী পার্থ! তোমার সঙ্গে আমার শুধু শোয়ার সম্পর্ক নয়!'

'চুপ করো! বাজে কথা বোলো না।' পার্থ ধমকে উঠল, 'কী আবোল-তাবোল বলছ! আমি তোমাকে যথেষ্ট সম্মান দিই, তুমি নিজেই নিজের সম্মান নষ্ট করছ।'

তিথি প্রতিমুহূর্তে ভয় পাচ্ছে এই বুঝি সে কেঁদে ফেলবে, কিন্তু যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে ঠান্ডা গলায় সে বলল, 'চিৎকার কোরো না, পাশে লোক আছে। সম্মান দেওয়া বলতে তুমি কী বোঝাচ্ছ আমি জানি না। এ বাড়িতে তোমারই কোনো সম্মান নেই, তুমি আর আমাকে কী সম্মান দেবে! সে যাক, কিন্তু তা সত্ত্বেও একটা মেয়ে স্বামীর সঙ্গে যেভাবে সংসার করে, আমার তো তাও নেই। এই যে একটা ঘর পাওয়া গেল, কই এখানেও তো তুমি আমার সঙ্গে থাকো না? আমি যেন একটা বাইরের লোক...একটা...যেন...একটা আলাদা কেউ..., তোমার এমনকী একটা জামাও তুমি এ ঘরে রাখো না...'

'তুমিই তো পারছ না মিলেমিশে সংসার করতে। নীচে সব ঠিকঠাকই ছিল, মধ্যিখান থেকে অদ্ভুত জেদ করলে আমার সঙ্গে শোবে না। তারপর ওপরের ঘরটা আদায় করলে মতলব করে। মা এতে কষ্ট পায়নি ভেবেছ? আমি যদি আমার সব জিনিসপত্র আলাদা করে এ ঘরে নিয়ে আসি মায়ের কেমন লাগবে?'

অন্যদিন হলে তিথি আর পারত না, হয় স্তব্ধ হয়ে যেত নয় কান্নায় ভেঙে পড়ত। আজ তাকেও ঝগড়ার উন্মত্ততা পেয়ে বসেছে, সে চাপা গলাতেই চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ও! আমি মতলব করে আলাদা হয়েছি! তুমি ওপরে এলে বড়োমা কষ্ট পান! তাহলে শোও কেন আমার সঙ্গে? আসবে না। সেই ব্যবস্থাই তো করেছিলাম, তখন তুমি আমায় কম জ্বালিয়েছ? নীচের ওই দুটো ঘরে, ওইভাবে অসভ্যের মতো একসঙ্গে শোওয়া খুব ভালো ছিল, না? বিয়ে করেছ, একটা ঘরের ব্যবস্থা করোনি। তোমাকে আর কী বলব। নির্লজ্জ, না নির্বোধ!'

পার্থ হিসিয়ে উঠল, 'বুঝতে পারছি, আমাকে তোমার আর পছন্দ হচ্ছে না। তুমি খুব ভুল করছ তিথি। আমি দেখেছি, তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হলেই তোমার তেজ বাড়ে।'

'আমার মায়ের সম্বন্ধে একটাও কথা উচ্চারণ করবে না তুমি। লজ্জা করে না, মা যেই বললেন খাট আলমরি দেব, অমনি তুমি ঘাড় নাড়লে! ছিঃ! তুমি আবার কথা বলো!'

পার্থ একটু মিইয়ে গেল। পরক্ষণেই তেড়েফুঁড়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয়ই বলব, বলব না কেন? মেয়ের বিয়েতে সবাই দেয়। দিতে হয়। সীমার বিয়ে হলে আমাদেরও দিতে হবে। এতে লজ্জার কী—'

'ব্যাস ব্যাস ব্যাস! তোমরা সবাই এক ভুল করছ। আমার বিয়ে আমার মা-বাবার ইচ্ছে অনুযায়ী হয়নি, আমি নিজের ইচ্ছায় বিয়ে করেছি। মনে আছে, যেদিন আমি চলে এলাম তুমি আমাকে কী বলেছিলে? বলেছিলে তুমি নাকি বরাবর চেয়েছ আমি তোমাকে ভালোবেসে একটা সুতোও না নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে আসব। তাই তো আমি এসেছি পার্থ! কিচ্ছু না নিয়ে এসেছি। তাই বলে আমার ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো তো আমি ফেলে আসিনি। সেটুকু, যেটুকু ভদ্রভাবে আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে গেলে লাগে? সে তো তোমারই দেওয়ার কথা। কেননা আমি নিজে জোগাড় করতে গেলে আমাকে অন্তত পড়াশুনাটা শেষ করতে হবে। তুমি আমাকে সে সময়ও দাওনি। এখনও, আমার পড়ার জায়গা করে দিয়েছেন মাধুবউদি, এমনকি এ ঘরের বালবটাও মাধুবউদির দেওয়া। তুমি একটা দায়িত্বও পালন করেছ? আর আজ তুমি চাইছ আমার মা-বাবা আমাদের সব দেবেন, তুমি সেই লোভে—'

'খবরদার তিথি, মুখ সামলে—'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। মুখ পরে সামলাব। আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি। বড়দির সঙ্গে আমার বিয়ের তুলনা করলে

তুমি। আচ্ছা বলো তো, তোমার মতো কোনো পাত্রের সঙ্গে দেবে তুমি বড়দির বিয়ে? দেবে? তখন তোমার মনে হবে না, এমন ছেলের হাতে বোনকে দেওয়ার চেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়া ভালো! কিংবা, তোমার হয়তো মনে হবে না, কিন্তু বড়োমা আর বাবার হবে...' তিথির চোখ দিয়ে এতক্ষণে জল গড়িয়ে পড়ল, বিকৃত স্বরে সে বলল, 'নিজের দিকে তাকাও পার্থ, আমার মায়ের সম্বন্ধে অযথা খারাপ কথা বোলো না।'

পার্থ জবাব হাতড়াচ্ছিল। তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে গেছে। উপর্যুপরি পর্যুদস্ত হতে হতে সে প্রাণপণে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল, তিথি আবার তাকে আক্রমণ করল, 'আজ সকালে ওভাবে পালালে কেন?'

'পালালাম?' পার্থ ঢোঁক গিলল, 'পালালাম কোথায়!'

'ন্যাকামি কোরো না। মা-বাবা আসামাত্রই আমি তোমাকে ডেকেছি। তারপর তুমি কাউকে না বলে—'

'আমি বাবাকে ডাকতে গেছিলাম। বাবার সঙ্গে ওঁদের দেখা হত না নাহলে।'

'জানি তুমি এটাই বলবে। কিন্তু এটা মিথ্যে। সেরকম হলে তুমি আগে মা-বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে পারতে, সেটাই উচিত ছিল।'

পার্থ তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল, তর্জনী উঁচিয়ে বলল, 'শোনো তিথি, আমাকে উচিত দেখিও না। বাবাকে ডেকে আনাটাই আমার প্রথম কর্তব্য ছিল। জানো বাবাকে কীভাবে খুঁজে বের করেছি বাজারের মধ্যে!'

তিথি হাসছিল, অগ্নিবর্ষী হাসি, 'প্রথম কর্তব্য! কর্তব্য মানে বোঝো তুমি? আমার তো বিশ্বাস হয় না। আজ তোমার প্রথমেই

বাবার কথা মনে পড়ল, তাঁর প্রতিই কোন কর্তব্যটা তুমি করো? করলে বিয়ে করে বউ নিয়ে এসে বাবার ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারতে না। উনি উঠতে- বসতে তোমায় অপমান করেন, সে অপমান আমার গায়ে লাগে। অথচ তোমার কোনো বিকার নেই—'

'না, তিথি। বাবা আমায় কোনো অপমান করেন না। এক ফ্যামিলিতে থাকতে গেলে ওরকম রাগারাগি একটু হয়ই। তোমারই ওতে আঁতে খুব লাগে, আমি কিছু মনে করি না—'

'করো না, জানি। করলে তো তোমার চলে না, তাই করো না। সেইজন্যেই আজও পিঠ বাঁচাতে বাবাকে ডাকতে গিয়েছিলে।'

'সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তিথি। পিঠ বাঁচানো মানে? তোমার মা-বাবা কি আমাকে মারবেন নাকি?'

'ওঁরা মারবেন কেন? ভয় তো সেখানে নয়। ভয় তোমার ভেতরে। ওই জন্যেই তুমি পালাচ্ছ, মায়ের সামনে দাঁড়াতে পারছ না। খারাপ ব্যবহার করছ। মিথ্যে কথা বলছ—'

'শাট আপ!' পার্থ এবার রীতিমতো চেঁচিয়ে উঠল।

তিথি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, বলল, 'চেঁচাবে না। এগুলো তোমার আর আমার মধ্যেকার কথা। আর কাউকে শোনানোর দরকার নেই। তুমি মনে করে দ্যাখো কী কী অভব্যতা করেছ। মায়ের সঙ্গে, আজ দাদার সঙ্গেও। আমাদের বাড়ি গিয়ে সেদিন পরোটা খেতে খেতে বললে তুমি নাকি ভাজা খাও না। এদিকে তেলেভাজা দেখলে তো জিভ দিয়ে জল গড়ায়। আবার বাড়ি এসে খেলে। প্রমাণ করতে চাইলে আমার মা তোমাকে কিছু খেতে দেননি?'

'মোটেই তা নয়। বাড়িতে না খেলে মা দুঃখ পাবে—'

এতক্ষণ পরে তিথির হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, সে দু-হাতে কান চেপে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'উফ্ উফ্! মা দুঃখ পাবে—এক কথা বলে চলেছ। তুমি এখানে থাকলে মা দুঃখ পাবে, আমাদের বাড়িতে খেলে মা দুঃখ পাবে।' বলতে বলতে সে উঠে এসে পার্থর সামনে দাঁড়াল, তীব্র স্বরে বলল, 'তুমি এখন আমার কাছে আছ, এতে বড়োমা দুঃখ পাবেন না? যাও—যাও জিজ্ঞেস করে এসো মাকে তুমি এখন আমার সঙ্গে শুতে পারবে কি না? যাও!' কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে পার্থকে এক ধাক্কা মারল।

পার্থ তৈরি ছিল না। টাল সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে সপাটে একটা থাপ্পড় মারল তিথির গালে। তার চোখমুখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। ফ্যাসফেসে গলায় বলল, 'নোংরা মেয়ে একটা। যেমন মা তেমনি মেয়ে। ওই মায়ের শিক্ষায় এই জিনিসই তো তৈরি হবে। এ বাড়িতে এসব একদম চলবে না বলে দিচ্ছি। আর একটা কথা বললে'—পার্থ আবার চড় মারার জন্যে হাত ওঠাল।

তিথি ছিটকে সরে গেল ঘরের মধ্যিখানে। হাত থেকে শাঁখা-পলাগুলো খুলে খুলে ছুড়ে দিল। তার সমস্ত মুখ কান্নায় থই থই, কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক জ্বলছে। তার গলা একটুও কাঁপছে না, বলল, 'আমাকে তুমি চেনো না পার্থ, একটুও চেনো না। তোমার জন্যে অনেক বদলেছি নিজেকে, আর নয়। এবার থেকে আমি নিজের মতো থাকব। দেখি তুমি কী করতে পারো!'

তার সমস্ত অবয়বে এমন একটা কিছু ফুটে বেরোচ্ছিল, পার্থ তার দিকে এগোতে সাহস করল না। উদ্যত হাত গুটিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ স্থির চোখে দেখল তিথিকে। তার মুখে ক্রূরতার ছায়া পড়লেও তিথি বেশ বুঝতে পারছিল তাকে ওইভাবে দেখা ছাড়া পার্থ আর কিছু করতে পারবে না। তিথিও এক দৃষ্টে চোখে চোখ ফেলে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর পার্থ হঠাৎ উঠে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল কম্বল গায়ে দিয়ে।

তিথি তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছে।

সকালে তিথি যখন নেমে এল, সে অনেকটা বদলে গেছে। ভেতরে এবং বাইরে উভয়তই।

বাড়ি থেকে সালোয়ার–কামিজগুলো নিয়ে আসা সত্ত্বেও সেগুলো এখানে একদিনও পরেনি তিথি। পার্থ বলেছিল, বিয়ের পর সে শাড়ি ছাড়া অন্য কিছু পরলে সুধা দুঃখ পাবেন। তিথির শুনে খুব হতাশ লাগলেও সে আর কোনো কথা বলেনি। আজ তাকে দেখে সুধা হাঁ হয়ে গেলেন, সীমাও। অলক এখনও ঘুম থেকে ওঠেননি।

'এ কী!' সুধা উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আরে, শাঁখাপলাগুলো খুলেছ কেন তুমি!'

তিথি যাবতীয় সংঘাতের জন্যে তৈরি ছিল। আস্তে আস্তে বলল, 'খুলে ফেলেছি বড়োমা, আমি আর পরব না। শুধু এই চুড়ি আর লোহাই থাকবে।'

'মানে! পরব না মানে কী? অমনি খুলে ফেললে দুম করে, পার্থর অকল্যাণের কথা ভাবলে না!'

'এতে কিছু অকল্যাণ হয় না বড়োমা।' তিথির গলা অচঞ্চল, নীচু—'মাধুবউদিও তো মাঝে মাঝে শাঁখা-পলা খুলে ফেলেন!'

কথাটা সত্যি। সুধা হঠাৎ কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। তারপরই চড়া গলায় বললেন, 'সে যার যা ইচ্ছে করুক। তুমি তাই বলে আমায় কিছু না বলে খুলে ফেলবে?'

'আসলে কাল রাত্তিরেই ডিসিশন নিলাম তো, ওই জন্যেই তোমায় বলতে পারিনি।'

'আর এইসব জামা পরেছ কেন? ধিঙ্গি মেয়ের মতো যা ইচ্ছে তাই করলেই হল। কী হচ্ছেটা কী এসব, অ্যাঁ?' সুধা কোনো খেই পাচ্ছেন না। তিথির অভাবনীয় স্পর্ধায় জ্বলে উঠতে গিয়েও তার ঠান্ডা কথা বলার ভঙ্গিতে বার বার প্রতিহত হচ্ছেন।

'এটাও কাল ভেবেছি বড়োমা। আমি এখন থেকে চুড়িদার পরব। শাড়িও পরব, তবে সবসময় নয়।' তিথি একটা বড়ো শ্বাস টানল, 'তুমি ভেবে দ্যাখো বড়োমা, শাড়ির থেকে চুড়িদার অনেক ভালো পোশাক। এ ছাড়া আমার অনেক চুড়িদার আছে। ওবাড়ি থেকে সেগুলো নিয়ে এলে এখন অনেকদিন আমার কোনো জামা কিনতে হবে না—'

অকাট্য যুক্তি, তিথি আজ সমস্ত তর্কের উত্তর সাজিয়ে এনেছে। সুধা খণ্ডন করতে পারছেন না, অসহায় রাগে ছটফট করছেন। সীমার সমস্ত মুখে থমথম করছে মেঘ, কিন্তু তারও মুখে কোনো শব্দ নেই।

লুঙ্গি সামলাতে সামলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন অলক, সদ্য ঘুমভাঙা মুখে বিরক্তি আর বিস্ময় মিশিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে অ্যাঁ! সকালবেলায় এত চেঁচামেচি কীসের?' তাঁর প্রশ্ন সুধাকে।

সুধা এবার সত্যি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'চেঁচামেচি করব না! দ্যাখো একবার ওই দিকে তাকিয়ে, কী সং সেজেছে। শাঁখা-পলাগুলো সব চুকিয়েছে। হবে না! কী বাড়ির মেয়ে! কাল ওর মাকে তো দেখলাম—'

তিথির মুখ শক্ত হল, কিন্তু ঠোঁট চেপে থাকল সে। অযথা শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। তাকে যুঝতে হবে। যুঝতে গেলে সংযত থাকা প্রয়োজন।

অলক তিথিকে দেখছিলেন, সুধার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'তা ওকে খারাপ কিছু তো লাগছে না? বাচ্চা মেয়ে। মৌ-টৌরা তো আজকাল এইরকমই পরে-টরে দেখি—'

সুধা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'বাচ্চা? বাচ্চা মেয়ের এই ধরন? শাঁখা খুলে ছেলের অকল্যাণ করা, আবার মুখে মুখে তর্ক—ও বাচ্চা!'

অলক হাত নাড়লেন, লুঙ্গির গিঁট বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'হুঁঃ, ছেলের অকল্যাণ! বউ শাঁখা পরলেই ওই ছেলের কল্যাণ হবে ভেবেছ? অকালকুষ্মাণ্ড! নাও নাও, চা দাও।' অলক বাথরুমের দিকে হাঁটা লাগালেন।

তিথি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াতে যাচ্ছিল। সুধা ফুঁসছেন, তাঁর রাগ গিয়ে পড়েছে অলকের ওপর, 'বাচ্চা! আমার ওর বয়সে ছেলেমেয়ে হয়ে গেছে। কই, বাচ্চা বলে আমার ওপর তো তোমার, তোমার বাপ-মায়ের কোনো দরদ দেখিনি—'

তিথি খেয়াল করল, এতক্ষণ সীমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল তিথির এই বেয়াদপি তারও অসহ্য লাগছে। কিন্তু আস্তে আস্তে তার মুখ যেন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সে বলল, 'নাও মা, চুপ করো। এক্ষুনি আমার কাছে পড়তে আসবে—'

সুধা এই সমূহ পরাজয় মেনে নিতে পারছিলেন না। তিথি খুব সহজ সুরে সীমাকে বলল, 'তুমি একদম চুড়িদার পরো না কেন বড়দি? আমারগুলো আমরা ভাগাভাগি করে পরব, হ্যাঁ! ফ্রি সাইজ তো, তোমার অসুবিধে হবে না—'

'না। সীমা ওসব পরে না।' সুধা আবার চেঁচালেন।

সুধার রাগ অগ্রাহ্য করল সীমা। তার মুখে হাসির আভাস খেলছে, অনিশ্চিত স্বরে বলল, 'সবাই তো পরে, কিন্তু...আমাকে কি মানাবে?'

'খুব মানাবে বড়দি। দেখো, বড়োমাও অবাক হয়ে যাবেন।'

'সীমা!' সুধা ভাবতে পারছেন না সীমা তাঁর সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে, তাঁর স্বরে রাগের সঙ্গে কান্না মিশল, 'ও! তোমরা সবাই তবে একজোট! আমার কথা কেউ মানে না।'

‘বড়োমা—’ তিথি কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সীমা চেঁচিয়ে উঠল, ‘আচ্ছা বেশ, আমি পরব না। হল তো? একজোট আবার কী! আমি কোনো জোটে নেই, আমি একা।’ সীমা দুম দুম করে পা ফেলে ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে গেল। সুধা চোখে আঁচল দিলেন।

তিথি মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে রান্নাঘরে চলে গেল। কাল সারারাত ঘুম হয়নি এক ফোঁটা। ঠান্ডা মেঝেতে শুয়ে ঠান্ডাও লেগেছে। মাথা ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়। তার ওপর আবার অশান্তি। কিন্তু তিথি দেখল, তার ভেতরে ভেতরে একটা অদ্ভুত আরামবোধ ছড়িয়ে পড়ছে। এটা কি খুব খারাপ? তার জন্যে এই সংসারে শান্তি নষ্ট হোক, এটাই কি সে চাইছে? তিথি নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছিল না। টগবগ করে ফুটে ওঠা চায়ের জলের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার হঠাৎ নিজেকে খুব ঘেন্না করতে ইচ্ছে করছিল।

আশ্চর্য, তিথি কিছুতেই নিজেকে ঘেন্না করতে পারছিল না।

তিথির ঘর দেখে অদিতি তাকে খাট আলমারি ইত্যাদি কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী দেবার কথা ভেবেছিলেন ঠিকই, কিন্তু চিরাচরিত রীতি মেনে তাকে শাড়ি–গয়না দেওয়ার কথা ভাবেননি। প্রথমত, গয়না ইত্যাদিকে তিনি নিজে কোনোদিনও তেমন গুরুত্ব দেননি। তাঁর বিশ্বাস, বিয়ে করে ফেলেছে বলেই তড়িঘড়ি তিথিকে ওইসব দিতে হবে, এই ধারণার কোনো মানে নেই। তাঁর যা দেওয়ার, সেসব পরে দেবেন বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অদিতি। কিন্তু রিসেপশনের দিন তিথিকে দেখে তিনি আবার ধাক্কা খেলেন। তাঁর মনে হল, তবে কি তিথিকে তাঁর কিছু দেওয়াই উচিত ছিল, পার্থকেও?

তিথিরা পৌঁছিয়েছে সময়ের একটু আগে আগেই। মাধবীরা আসতে পারেননি, রুম্পার কাল রাত্রি থেকে হঠাৎ জ্বর এসে গেছে। অদিতি সবাইকে অভ্যর্থনা জানাতে জানাতে দেখলেন, তিথি আজও সেই শাড়িটাই পরে এসেছে যেটা পরে সে সেদিন বাড়িতে এসেছিল। তবে তার হাতে আজ শাঁখা-পলা নেই। সিঁথির সিঁদুরও কপালের সীমায় এসে থেমে গেছে। অদিতি আশ্চর্য হলেন,

খুশিও হলেন। তারপরই একটা অদ্ভুত বিষাদে ছেয়ে গেল তাঁর মন। সেদিন তিথিদের বাড়িতে ঘুরে এসেও, সব দেখেও, তিনি এটা ভাবতে পারেননি যে তিথি আজও সেই একই শাড়ি পরে আসবে। পার্থর পরনেও সেই অতি সাধারণ পাঞ্জাবি আর প্যান্ট। তার খয়েরি সুতির পাঞ্জাবির তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে সবুজ সোয়েটার। তিথির গায়ে আজও কোনো গরম কিছু নেই। সুধা অলক আর সীমার বেশভূষাও সেরকমই।

অলক এসেই বিশ্বনাথের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন। সুধা আর সীমার মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে। আর পার্থর মুখ কঠিন। এই ছেলেটিকে অদিতি কখনো হাসতে দেখেননি।

তিথিকে একপাশে ডেকে এনে অদিতি বললেন, 'হ্যাঁরে, এই শাড়িটাই পরে এলি?'

'কেন মা, খুব খারাপ দেখাচ্ছে?'

'তা নয়, তবে—'

'জানি মা। মাধুবউদিও বলছিলেন সেজেগুজে আসতে। শাড়ি, সোনার হার, বালা-টালা বার করে দিয়ে বললেন, 'পরে যা।' আমি নেইনি। সবাই আমায় দেখে হাসবে হয়তো, তোমাদেরও মান থাকবে না। কিন্তু কী করব বলো। এইটাই যে সত্যি—' তিথি নিজের দিকে তাকাল, বলল, 'এটাই আমার সবচেয়ে ভালো শাড়ি, বড়োমা পুজোয় দিয়েছেন—'

অদিতির কান্না আসছে, 'আমি যে কেন তোকে কিছু দিলাম না সেটা তুই—'

'আমি জানি। ওসব নিয়ে আমি ভাবি না। আমি যেভাবে চলে এসেছিলাম তারপর তোমাদের এভাবে মেনে নেওয়াই যথেষ্ট। তুমি

কিছু দিলেও আমি নেব না—' তিথি হাসল, 'ভেবো না মা। আমি খুব ভালো আছি। আমি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। দেখো, ঠিক দাঁড়িয়ে যাব।'

'তিথি—' অদিতি ভাঙা গলায় কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। অভ্যাগতরা আসতে শুরু করেছেন। সপরিবারে ঘরে ঢুকলেন অদিতির দাদা, তিথির বড়োমামা।

তিথি হাসিমুখে এগিয়ে গেল, 'এসো বড়োমামু, মাইমা এসো—' সে হেসে হেসে আলাপ করাচ্ছিল তার স্বামী আর শ্বশুর–শাশুড়ি–ননদের সঙ্গে। মামা মাইমা আর মামাতো দাদার মুখে অকৃত্রিম বিস্ময়, তাঁরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন। তাঁদের সপ্রশ্ন বিস্ফারিত দৃষ্টি আনাগোনা করছিল পার্থ সুধা অলক সীমা থেকে অদিতির ওপরে। তিথি গ্রাহ্য করল না। অদিতিও। তিথি হাসিমুখে বলল, 'ইশ্ কতদিন পর তোমাদের সঙ্গে দেখা হল, কেমন আছ তোমরা সব...'

সেই রাত্রের পর পার্থর সঙ্গে তিথির কথা বন্ধ, সেই সকালের পর থেকে সুধাও তার সঙ্গে পারতপক্ষে একটা কথাও বলছেন না। এমনকী সীমাও নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিথিকে এড়িয়ে চলছে। আজ তিথির আশঙ্কা হচ্ছিল পার্থ রিসেপশনে আসতে আবার আপত্তি না করে। তাহলে মা-বাবাকে চূড়ান্ত অপদস্থ হতে হত। কিন্তু অলকের উৎসাহের আতিশয্যে তেমনটা ঘটতে পারেনি। তিথি জানে, অলক বিনা নেমন্তন্নেও অনুষ্ঠানে গিয়ে খেয়ে আসেন, ভোগের খিচুড়ি নিয়ে ছেলেমানুষের মতো লোভ করেন। তিনি আজ দুপুর থেকেই আসার জন্যে তৈরি হয়ে বসে ছিলেন। তিথির আশঙ্কা ব্যর্থ করে অন্যরাও বেঁকে বসেননি।

পার্থ সর্বাঙ্গে উৎকট গাম্ভীর্য ধারণ করে বসে আছে। থাক। তিথিকে আজ হাসতেই হবে।

৩

'পার্থ পার্থ পার্থ তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না পার্থ, কখনো কি ভালোবেসেছিলে?' তিথির ঠোঁট নড়ছে না, কিন্তু সে অনবরত কথা বলে চলেছে। সে কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। সে যেন ভাসতে ভাসতে তলিয়ে যেতে যেতে এত দূরে চলে গেছে যেখান থেকে কারও সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সম্ভব নয়।

তার কী হয়েছে, তিথি বুঝতে পারছে না। শুধু চূড়ান্ত মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে সে। রোজ সকালে ঘুম ভেঙে বিছানা ছাড়ার জন্যেও যে উৎসাহটুকু নিতান্ত জুরুরি, সেটুকুও যেন ফুরিয়ে গেছে তার। তার চোখ চশমাহীন, সিলিং-এর দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু তার চোখের সামনে অন্তহীন ঘটনার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, তাদেরই উপর্যুপরি ধাক্কায় ধাক্কায় আছড়ে পড়েছে তিথি, অথচ সেই ঘটনাগুলোই তার আধো-সচেতন মস্তিষ্কে বার-বার হানা দিয়ে তাকে আরও কাবু করে ফেলছে তাড়া খাওয়া পাখির ছানার মতো।

গত রাত্রি থেকে এই ওপরের ঘরে একাই শুয়ে আছে তিথি। পার্থ কাল ওপরে আসেনি। এখনও ঘরের দরজা জানলা সব বন্ধ। শুধু ঘুলঘুলি, ভাঙা জানলার ফাঁকফোকর আর দরজার তলা গলে কয়েক দানা মনমরা আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। সকাল হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, বেলা হতে চলল। তিথি বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, নীচে নামেনি। সকাল থেকে প্রায় সবাইই ডেকে গেছেন—সুধা, মাধবী, পার্থ। চশমাহীন শূন্য দৃষ্টিতে তিথি দেখেছে সুধার বিরক্ত মুখ, মাধবীর করুণ মুখ, পার্থর ক্রুদ্ধ মুখ। কোন মহাসমুদ্রের ওপার থেকে যেন তাদের কথা ভেসে আসছিল, তিথি ভালো শুনতে পাচ্ছিল না।

অবশ্য বিছানা ছেড়ে সে একবারও ওঠেনি, এ কথাটা ঠিক নয়। ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পরই বাথরুম পেয়ে গেছিল তার। বড়ো নয়, ছোটো। তখনই বিছানা ছাড়তে গিয়ে টের পেয়েছিল তিথি যে তার কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। তার মাথা

হালকা অথচ ভারী, শরীরটা যেন নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটা পেল্লায় যন্ত্র, এটাকে নিয়ে সে আর ছেঁচড়ে ছেঁচড়েও চলতে পারছে না।

কোনোরকমে বাথরুম অবধি পৌঁছে বাথরুমের নালির মুখে উবু হয়ে বসে নিজেকে মুক্ত করে দিল তিথি। কাল রাত্রে ওপরে আর জল আনা হয়নি, তবে বাথরুমে হিমাংশুর বালতিতে জল আছে, ঢেলে দিলেই হবে। পরে নাহয় নীচ থেকে জল এনে হিমাংশুর বালতিটা ভরে দেবে সে! ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ তার প্রায় ঘোর ঘোর অবস্থাকে একটা ঝাঁকুনি দিল তার ষষ্ঠেন্দ্রিয়। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল বাথরুমটাতে সে একা নেই। যন্ত্রচালিত বিমূঢ়ের মতো সে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল পায়খানার দরজা বন্ধ, তার নীচের ফাটা অংশ দিয়ে পায়খানার পাদানির ওপর পা দেখা যাচ্ছে। হিমাংশু পায়খানায়।

তিথির প্রথমটায় মনে হয়েছিল সে অজ্ঞান হয়ে যাবে। কিন্তু হল না। তখন তার শরীরের মধ্যে থেকে হু-হু করে তরল মুক্ত হচ্ছে বেগে, সেই মাঝপথে বেগ সংবরণ করে উঠে আসা অসম্ভব। মূর্ছাহতের মতোই শেষ হওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হল তাকে, মূর্ছাহতের মতোই জল ঢেলে উঠে এল তিথি। বস্তুত টলতে টলতে সে যখন ঘরে এসে শুয়ে পড়ল, তার মনে হচ্ছিল সংজ্ঞা হারাতে পারলেই এই জলজ্যান্ত দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেত সে।

‘আমি তোমার কাছে কখনো কিছু চাইনি পার্থ, আর কখনো চাইবও না...’ তিথি ঠোঁট না নাড়িয়েই আবার বলল। তার ডান চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে গেল একটা গরম জলের ধারা।

ঘরের কোণে পড়ে আছে একটা ছোটো ট্রাঙ্ক। পার্থর কেনা। তিথি পার্থর কাছে ওটা চেয়েছিল বাড়ি থেকে তার জামাকাপড়গুলো নিয়ে আসবে বলে। আলমারি-টালমারির স্বপ্ন সে দেখে না। কলেজের হোস্টেলে তার সহপাঠী রুমকির ঘরে সে এইরকম একটা ট্রাঙ্ক দেখেছে। অনেক দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে নিজের মধ্যে নিজের সঙ্গে অনেক যুঝে সে পার্থকে বলতে পেরেছিল, ‘শোনো, এবার ভাবছি বাড়ি থেকে জামাগুলো নিয়ে আসি। আমাকে একটা বাক্স কিনে দেবে?’

'বাক্স!' পার্থ হাসল, 'এই মুহূর্তে আমার কাছে বাক্স কেনার পয়সা নেই যে, তিথি।'

তিথি ঠিক এই উত্তরের জন্যেই প্রস্তুত ছিল। আজকাল তার কেমন সন্দেহ হচ্ছে, পার্থ নিজেকে যতটা কপর্দকহীন দেখাতে চায়, ততটা হয়তো সত্যি সত্যিই নয়। এর মধ্যে অনেকটাই তার দায়িত্ব এড়ানোর ফিকির।

জীবনে যা সে এর আগে কখনো করেনি, সেটাই করল তিথি। পার্থকে চাপ দিল। বায়নার সুরে বলল, 'প্লিজ সোনা, একটা বাক্সের কত আর দাম হবে? এক্ষুনি না হোক, ক–দিন পরে কিনে দিয়ো? নইলে কোথায় রাখব বলো জামাকাপড়!'

পার্থকে দেখে মনে হল সে যেন গভীর দুশ্চিন্তায় পড়েছে। তিথি দেখেও দেখল না। এতদিন ধরে সে তো এই একই জিনিস দেখে আসছে। কিচ্ছুই না চেয়ে তার আজ এই অবস্থা। আজ যখন একবার সে চেয়েছে, তখন পিছু হটবে না। দেখা যাক, অন্যরকম কিছু হয় কি না!

তারপরের দু–সপ্তাহ এই নিয়ে আর কোনো কথা তোলেনি তিথি। পার্থও কিছু বলেনি। সম্ভবত সে ভুলে গেছিল। অবশেষে একদিন রাত্রে চোখের জল ফেলল তিথি। বলল, 'তুমি এটুকুও পারলে না তাহলে!'

এই ঘটনার দু-দিন পর, গত পরশু কলেজ থেকে ফিরে তিথি দেখল পার্থ বাড়িতে তার জন্যে অপেক্ষা করছে। তাকে দেখামাত্র বলল, 'চলো, তোমার বাক্সটা নিয়ে আসি।'

তিথি যথেষ্ট ক্লান্ত ছিল, কিন্তু পার্থর প্রস্তাব ক্লান্তি দূর করার পক্ষে যথেষ্ট। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাল সে, মৃদু হেসে বলল, 'সত্যি!'

দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে বাসে ওঠার পর তিথির খুব ভালো লাগছিল। মনে হচ্ছিল—ইশ্ কতদিন তারা দুজনে বেড়াতে

বেরোয়নি, এ বাড়িতে আসার পর তো একদিনও নয়। আগে তারা রোজ কত কত পথ পাগলের মতো ঘুরে বেড়িয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, পরস্পরকে নিবিড় ছুঁয়ে ছুঁয়ে। এখন আর সেসব করার কথা যেন ভাবাই যায় না। কেন যে যায় না! তিথির মনটা ক্রমশ বিষণ্ণ হয়ে উঠছিল। ওই সমস্ত সময় কি চিরদিনের মতো হারিয়েই গেল তাদের জীবন থেকে? খুব পুরোনো হয়ে গেছে কি তারা, পরস্পরের কাছে! প্রথম প্রেমের সেই অদ্ভুত কড়িমধ্যম আর কোনোদিনও বাজবে না!

তিথি লেডিজ সিটে বসার জায়গা পেয়ে গেছে। পার্থ বসতে পায়নি। বাসে বেশ ভিড়। বাসের হ্যান্ডেলধরা পার্থর হাতদুটো ছাড়া তাকে একটুও দেখতে পাচ্ছে না তিথি। ওইদিকেই তাকিয়ে থাকল সে, গাঢ় ব্যাকুল দৃষ্টি দিয়েই ওই হাত ছুঁয়ে ছুঁয়ে পার্থকে সে মনে মনে গভীর আদর করছিল।

দোকানে গিয়ে পার্থ যে ট্রাঙ্কটা পছন্দ করল, তাতে তিথি অবাক না হয়ে পারল না। নীচু গলায় বলল, ‘এটাতে যে ধরবে না...’

পার্থ মুখে কর্তৃত্ব ফুটিয়ে হাসল, ‘যথেষ্ট ধরবে। তোমার ক–টা জামাকাপড় যে এতে ধরবে না।’ দোকানদারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এটা রাউন্ড করেই ধরুন। একশো কুড়ি–টুড়ি না, ওই একশোই দেব।’

দোকানদার দু-একবার গাঁইগুই করে হাঁক দিল, ‘এই এটা নামা দিকি। আর একটু পুঁছে–টুঁছে দে। আপনি এদিকে আসুন দাদা, বিলটা লিখি...পাঁচটা টাকা দিয়ে দেবেন দাদা, ওই পাঁচ টাকাই লাভ—’

‘হ্যাঁ, তা না আরও কিছু। পাঁচ টাকা লাভ রেখে ব্যাবসা করছেন বললেই হল?’ পার্থ দোকানদারের সঙ্গে এগোতে এগোতে বলল। তিথির পা চলছিল না। দোকানের বাচ্চা চাকর এসে তাদের পছন্দ করা ট্রাঙ্কটা নামিয়ে ঝাড়ন দিয়ে মুছছে। তিথি চুপ করে দেখে যাচ্ছিল। পুরো ঘটনাটাই ঘটে গেল এত দ্রুত, তার যাবতীয় ভূমিকাকে এমন অনায়াসে অগ্রাহ্য করে, সে কিছু বলারই অবকাশ পায়নি।

ফেরার পথে রিকশায় চেপে পার্থ বলল, ‘কী, এবার খুশি তো?’

তিথি নিরুত্তর। তার হাঁটুতে চাপ দিল পার্থ, ‘ওফ্, তোমাকে নিয়ে যে আর পারা যায় না দেখছি। দেখবে এটাতেই সব সুন্দর ধরে যাবে—’

‘যাবে তো?’ তিথি এমনভাবে প্রশ্নটা করল, যেন পার্থর কথাটাই অমোঘ সত্য হবে। তিথি জানে এই ট্রাঙ্কে তার সব জামাকাপড় ধরা সম্ভব নয়, সব কেন বেশিরভাগই ধরবে না, তবু সে আবার অসহায় বিশ্বাসে পার্থর ওপরই একান্ত নির্ভর করতে চাইল।

‘যাবে, যাবে, আমি বলছি দেখো, বিশ্বাস না হয়, কালই যাওয়া যাবে তোমাদের বাড়ি, গিয়ে নিয়ে আসা যাবে সব।...আসলে তোমার কোনো আইডিয়া নেই, তাই বলছ...’

তিথি অভিমান করতে গিয়েও করল না। পার্থ যখন এত জোর দিয়ে বলছে তখন তাই হবে। সত্যিই তার এসব ব্যাপারে খুব একটা ভালো ধারণা তো নেই। আন্দাজের ওপর ভিত্তি করে মন অস্থির না করে বরং বিশ্বাস করে নিশ্চিন্ত থাকাটাই শ্রেয়। তিথি খুশি হওয়ার চেষ্টা করল। এই প্রথম তাদের নিজস্ব একটা জিনিস হয়েছে, এমনি করেই একটু একটু করে তারা সংসার পাতবে।

বাড়িতে ঢুকেই উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সুধাকে ডাকল সে, ‘ও বড়োমা! দেখবে এসো একটা বাক্স কিনেছি।’ তার মনে আর খুঁতখুঁতুনি নেই, বরং সে আনন্দে ঝলমল করছে। কিন্তু সুধার কাছ থেকে যে প্রতিক্রিয়া এল, তাতে আবার এক ধাক্কায় স্বপ্নের সংসার থেকে বাস্তবে আছাড় খেল সে।

সুধা তীক্ষ্ণ চোখে বাক্সটা দেখলেন। তারপর তিথির দিকে না তাকিয়ে পার্থকে বললেন, ‘যা পেলে সব ঢেলে দিয়ে এসেছ তো! বেশ করেছ। এবার এইটা নিয়ে তো ওই ওপরের ঘরেই তুলবে, না কি?’

পার্থ কোনো জবাব না দিয়ে বাথরুমে চলে গেল। দু-মুহূর্ত তিথির দিকে কঠিন মুখে তাকিয়ে থেকে সুধাও চলে গেলেন ঘরে। ট্রাঙ্কটা প্যাসেজের পাশে রাখা। সেইদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে রইল তিথি। ঘর থেকে বেরিয়ে এল সীমা, ঝড়ের মতো কলতলার দিকে যেতে যেতে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কী এটা রাস্তার মাঝখানে, সরিয়ে রাখতে পারছ না?'

রিসেপশনের পর এই মাস খানেক সময়ের মধ্যে তিথি কয়েক বার মায়ের কাছে এসেছে। প্রতিবারই একা, কলেজ থেকে ফেরার পথে। একদিনও রাত্রে থাকেনি। তার ঘন ঘন মায়ের কাছে আসা নিয়েই ও বাড়িতে চাপা অসন্তোষ চলে। তিথির মনে হয়, রাত্রে সে বাড়ি না ফিরলে তাই নিয়েও আরও অশান্তি হবে। তা ছাড়া মায়ের কাছে থাকার ব্যাপারে তিথি নিজেও ঠিক স্বস্তি বোধ করে না। যখনই সে বাড়িতে আসে, তার সঙ্গে অদিতির ক্রমাগত একটা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বোঝাপড়া চলতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তিথির ভয় হয় এই বুঝি মা সমস্ত বুঝে ফেললেন। সে বুঝতেও পারে যে তাকে দেখেই মা অনেকটাই বুঝতে পারেন আসলে সে কেমন আছে, তবুও প্রাণপণে লুকোতে চায়। সেটা বুঝতে পেরেই অদিতিও প্রাণপণে লুকোতে চান যে সত্যিই তাঁর বুঝতে কিছু বাকি নেই। তিথির শ্রীহীন বিষণ্ন মুখ দেখেই তাঁর সব বোঝা হয়ে যায়। কিন্তু তিনি একটা কথাও জিজ্ঞাসা করেন না। নিজের মেয়েকে ভালোই চেনেন তিনি। নিজে থেকে যেটুকু না বলবে সে, তার বাইরে মায়ের কোনো প্রশ্নও সহ্য করবে না।

কথাবার্তাও তো হয় না বিশেষ। তিথি প্রধানত বইপত্র আনতেই যায়। খাটে বসে বসে দুটো-একটা কথা বলতে বলতেই হঠাৎ কেমন এলিয়ে গিয়ে নিথর হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। আসলে, যে ক্যাম্পখাটটায় রাত্রে তারা শোয়, সেটাতে দুজনে শোয়া যায় না। পার্থ যখন তার শরীর আঁকড়ে থাকে তখনকার কথা আলাদা, কিন্তু পাশাপাশি শুয়ে ঘুমোনোর পক্ষে সেটা ভয়ংকর অপরিসর। দুমড়ে-মুচড়ে কাত হয়ে পার্থকে যথাসাধ্য জায়গা দেয় তিথি, কেননা পার্থর চিত হয়ে শোয়ার অভ্যাস। বিছানা ঝুলে থাকার জন্যে সকালে উঠে তিথির কাঁধে ঘাড়ে পিঠের পেশিতে টনটন করতে থাকে। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলে না সে। বলে কী লাভ, তার মনে হয়, এই একই ব্যথা নিশ্চয়ই পার্থরও হচ্ছে।

কিন্তু বাড়িতে এসে খোলামেলা পরিষ্কার বিছানায় বসে তার শরীর আর বশে থাকে না। দু-দণ্ডের আরামে তার চোখ লেগে আসে। তা ছাড়া ধকলও তার যায় খুবই। কলেজে যাওয়া-আসা, বাড়ির কাজকর্ম, পরীক্ষার প্রস্তুতি। তার হাড়-জাগা ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে না পেরে অদিতি রান্নাঘরে চলে যান খাবার বানিয়ে আনতে। খাবার নিয়ে এসে তিথিকে ডাকতেই সে ধড়মড় করে উঠে বসে শ্রান্তিতে লাল চোখে ঘড়ির দিকে তাকায়, বলে, 'ইশ্ খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দেরি হয়ে গেল।'

গোগ্রাসে খাবার মুখে পুরতে থাকে সে। অদিতি বলেন, 'আহা আস্তে। আস্তে খা, বিষম লাগবে। অত তাড়ার কী আছে।' একটু ইতস্তত করে বলেন, 'এর পর যেদিন আসবি, নাহয় বাড়িতে বলেই এলি...একদিন এখানে থাকলেও তো পারিস—'

'না মা! আমি না ফিরলে বড়োমার বড্ড কাজের প্রেশার পড়ে। দু-বেলা সব রান্না করা, এখন অবশ্য শীতকাল, ওবেলার ডালটালগুলো থাকে। কিন্তু এতজনের রুটি সব বড়োমাকে একা করতে হবে আমি না থাকলে। বড়দি পড়াতে যায় তো—'

অদিতি কিছু বলেন না। তাঁর অবাক লাগে ভাবতে যে এই মেয়ে ক-দিন আগেও কাজের নামে গায়ে জ্বর এনে ফেলত, ছেলেমানুষ আর খামখেয়ালি বলে তাকে কোনো কাজের ভার দিতেও সাহস হত না। সেই মেয়েকে আজ কী খাটনিটাই না খাটতে হচ্ছে। মেয়েরাই সংসারের জন্যে পারে নিজেদের এভাবে বদলে ফেলতে, এতখানি নিঃশেষে ঢেলে দিতে।

অদিতি তিথির কলেজের ব্যাগটা খুলে তার মধ্যে কোনোদিন একটা ক্রিমের কৌটো, কোনোদিনও বা একটা ভেসলিনের টিউব ভরে দেন। এর বেশি তাঁর সাহস হয় না। তিথি যদি মনে করে তিনি ওকে দয়া করছেন। তিথি মাথা নাড়ে, বলে, 'ওহ্ মা, বইয়েই আর জায়গা নেই ব্যাগে, আবার কী ভরছ—'

'কিছু না, তিথি। তোর ঠোঁট বড্ড ফেটেছে, শুধু জিব দিয়ে ভেজাচ্ছিস, অমনি করলে তো রক্ত পড়বে। মনে করে ভেসলিনটা লাগাস।'

তিথি কিছু বলতে পারে না। ভালো লাগে তার, কান্নাও পায়। ভেতরে ভেতরে কোথায় যেন এও তার মনে হতে থাকে যে সে হেরে যাচ্ছে। নিজের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো মায়ের হাত থেকে নিতেও যে এত লজ্জা এটা তো জানত না এতদিন। মাথা নীচু করে চলে আসে সে। এইভাবেই চলছে।

কাল তিথি সিঁড়ি দিয়ে উঠল হইচই করতে করতে, 'আমরা একটা বাক্স কিনেছি, জানো মা! আজ সব জামাকাপড়গুলো নিয়ে যাব।'

বাক্স! একটা বাক্স কিনে তিথি এত খুশি! অদিতি নিজেকে বহুকষ্টে সামলে নিলেন। পার্থও এসেছে আজ। তার মুখে প্রচ্ছন্ন অভিমান। অদিতির দিকে সরাসরি তাকাচ্ছে না, কেমন যেন ট্র্যাজিক নায়কের মতো ওর হাবভাব। অদিতি এই ছেলেটিকে ভালো বোঝেন না। ও কি আশা করে তিনি ওকে নিয়ে মাতামাতি করবেন, আদিখ্যেতা করবেন, নাকি বাবা-বাছা করবেন? অদিতির সেরকমই মনে হয়। তিনি স্বাভাবিক গলাতেই পার্থকে বললেন, 'এসো পার্থ। তুমি তো আর আসই না। ভালো আছ তো? বাড়িতে সবাই ভালো?'

পার্থ মুখে কিছু বলল না। আধখানা ঘাড় হেলাতেই এত সময় নিয়ে নিল যে ততক্ষণ ধৈর্য ধরতে না পেরে তিথি আবার বলে উঠল, 'সবাই ভালো আছে। ওমা, শোনো না, আমরা একটা বাক্স কিনেছি কাল—'

'তাই বুঝি। বাঃ!' অদিতি হাসলেন, 'সবুর সয়নি দেখছি। কাল বাক্স কিনে আজই জামা নিতে চলে এসেছ দুজনে।'

তিথির সত্যিই আর সবুর সইছিল না। বাবার সঙ্গে কোনোরকমে কয়েকটা কথা বলেই সে পার্থর হাত ধরে টানল, 'চলো না। চলো জামাকাপড়গুলো বার করি। এসো-না মা।'

অদিতি আলমারি খুলে একটার পর একটা জামা বার করে ডিভানের ওপর পর পর রাখছিলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, ঘরে যেন কোনো সাড়াশব্দ নেই। একটু আগেই তিথি কলকল করছিল, হঠাৎ কী হল তার?

তিথির দিকে মুখ তুলে তাকাতেই তিনি দেখলেন তিথির ঠোঁট কাঁপছে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে সে, চোখে জল টইটম্বুর। অদিতির চোখে চোখ পড়তেই তার চোখের জল উপচে গেল। পার্থর দিকে তাকিয়ে প্রায় অবরুদ্ধ গলায় তিথি বলে উঠল, 'দেখেছ? দ্যাখো। আমি বলেছিলাম না তোমাকে, ধরবে না?'

অবাক হয়ে অদিতি পার্থর দিকে দৃষ্টি সরালেন। পার্থকে দেখে চমকে উঠলেন তিনি। এ কী চেহারা পার্থর! তিনি পার্থকে কখনো হাসিখুশি দেখেননি ঠিকই, কিন্তু তার মুখ এত কুটিল হয়ে উঠতে পারে এ ধারণাও তাঁর ছিল না। তার নাকের পাটা ফুলছে, বিজাতীয় হিংস্রতায় সমস্ত মুখ কালি, চোখ দুটো যেন ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। অদিতি ভয় পেয়ে গেলেন, ব্যাকুল গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

পার্থ বা তিথি কেউই তাঁর কথার কোনো উত্তর দিল না। ঠিক যেন লড়াইয়ের পূর্ব মুহূর্তে দুটো রাগি বেড়ালের মতো তারা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে। পার্থ দাঁত চেপে খসখসে গলায় বলল, 'যা ধরবে তাতেই হবে!'

'হবে না।' তিথি কান্নার গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি বলেছিলে আমার কোনো আইডিয়া নেই, আমি বিশ্বাস করেছিলাম। এখন বলছ, যা ধরবে তাতেই হবে।'

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে অদিতি সামান্য হলেও সময় নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কর্তব্য স্থির করতে একে সেকেন্ডও সময় নিলেন না। তিথির হাত ধরে তাকে জোর করে ডিভানের ওপর বসিয়ে দিলেন। আলতো ধমক দিয়ে বললেন, 'ছিঃ তিথি ও কী! এই নিয়ে অমন করে ঝগড়া করতে আছে? বাবা শুনতে পেলে কী ভাববে?'

তিথি ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, ‘আমি কিছু নিয়ে যাব না! চাই না, কিছু চাই না। কলেজে সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। করুক। আমার আর জামা নিয়ে গিয়ে কাজ নেই। এইরকমই থাকব, ঝিয়ের মতো।’

‘না, তিথি, লক্ষ্মী মা আমার। এরকম করে না।’ অদিতি সান্ত্বনা দিয়ে চললেন, ‘সংসার করতে গেলে কত বুঝেশুনে চলতে হয় মা, রাগ করলে কি চলে! এখন একটা যা হোক কেনা তো হয়েছে। আবার দু-দিন পরে সুবিধামতো আরেকটা কিনে নিলেই হবে। সংসার এভাবেই চলে। একসঙ্গে দুম করে কি পারা যায় সব? ধীরে ধীরে একটু একটু করে গুছিয়ে তুলতে হয়। ধৈর্য না ধরলে কী করে হবে বল তো! আমরাও তো কত কষ্ট করে—’ অদিতি বাক্যটা আর শেষ করলেন না। তাঁর মন চাইল না। বিশ্বনাথের সঙ্গে পার্থর কোনো তুলনাই চলে না। তাঁর স্বামী নিঃস্ব হওয়া সত্ত্বেও কর্মোদ্যমী পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। আর পার্থ! অদিতি মেয়েকে ভোলাতে গিয়ে আসলে অনেকটা নিজেকেই ভোলাচ্ছিলেন সান্ত্বনার কথাগুলো বলে। তিনি জানেন তাঁর মেয়ে শূন্যে ঝাঁপ দিয়েছে।

পার্থর মুখের দিকে তাকাতে তাঁর প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। কিন্তু তিনি জোর করে তাকালেন, জোর করে একটু হাসলেনও। জোর করেই বললেন, ‘ও খুব ছেলেমানুষ পার্থ। তুমি তো বড়ো, ওর ওপরে রাগ কোরো না...’

তিথির কান্না ফুরিয়ে এলে সে অবসন্নের মতো বসে ছিল। অদিতি যা পারলেন আন্দাজমতো গুছিয়ে বিগশপারে ভরে পার্থর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘আর মনে হয় দরকার নেই আপাতত, তাই না?’

পার্থর স্বর থেকে কাঠিন্য মোছেনি, বলল, ‘যথেষ্ট। মোর দ্যান এনাফ।’

ফেরার পথে পার্থ চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ‘ভালোই তো সিন করলে মায়ের কাছে গিয়ে। আরেকটা বাক্স কেনার মতলব তোমার, না? তোমার মাকে দিয়ে বলানো। তা, নিজের মাকে বলতে পারছ না কিনে দেওয়ার কথাটা?’

তিথি দাউদাউ করে জ্বলছিল। কিন্তু আশ্চর্য ঠান্ডা স্বরে বলল, 'তুমি সেইজন্যেই যে মরে যাচ্ছ আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি মা-বাবার কাছ থেকে কিছু নেব না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকতে পারো। একথা তোমায় আমি আগেও বলেছি।'

পার্থ মুখ বিকৃত করল, 'আমাকেও আর বিরক্ত করবে না বলে দিচ্ছি। আমার পক্ষেও আর কিছু সম্ভব নয়।'

বাড়িতে পা দিয়েই তিথি দেখল মাধবী এসেছেন, সুধার সঙ্গে নীচু সুরে কীসব কথা বলছেন। তিথিকে দেখে বললেন, 'মায়ের কাছে গেছিলি? সব ভালো?'

তিথি ঘাড় নাড়ল। মাধবী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রে, মুখ শুকনো কেন? কার সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, মায়ের সঙ্গে না বরের সঙ্গে?'

'মায়ের সঙ্গে আবার ঝগড়া কীসের। যত ঝাল সব আমার ওপর। কাল একটা বাক্স কেনা হল। আজ ওর মা আমাকে বলে কি, এতে হবে না আরও একটা কেনো।'

একটা সত্যকে নির্লজ্জ নির্দ্বিধায় এমন বিকৃত করতে দেখে তিথি স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, তার আগেই সুধা জ্বলে উঠলেন, 'শুনলে মাধু! শোনো। এই চলছে শুধু মা আর মেয়েতে মিলে। পার্থ একেবারে জেরবার হয়ে গেল। এদিকে উনি নিজে কিছু দেবেন না।'

'আমি ঠিক এই কথাটাই বলেছিলাম।' পার্থ বলল, 'ওইজন্যে সারা রাস্তা আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে এল।'

তিথির চোখে জল এসে যাচ্ছিল ঘৃণায় আর দুঃখে। ঘৃণা পার্থর ওপর। আর দুঃখ এই কারণে যে, এদের কথা শুনে মাধবীও

নিশ্চয়ই সব বিশ্বাস করছেন! মাধবী হঠাৎ খুব ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'থাকগে, এসব পরে বোলো। আমার আর শুনতে ভালো লাগে না। আমারও তো মন-টন ভালো নেই। যাই দিদিভাই, কাল সকালে বেরোব, আমার তো কিছু গুছোনোই হয়নি—'

মাধবী উঠে দাঁড়ালেন। তিথি রাগ ভুলে মাধবীর দিকে তাকিয়ে আছে। মাধবী কোথায় যাওয়ার কথা বলছেন! সে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ মাধুবউদি? বেড়াতে?'

মাধবী হাসলেন, 'জামশেদপুর যাচ্ছি রে। তোর সলিলদার কাকার বাড়ি। কাকিমা পড়ে গিয়ে শয্যা নিয়েছেন। আমাকে দেখভাল করতে হবে। দুই ছেলেই তো আমেরিকায়, মেয়েও থাকে ব্যাঙ্গালোর। আমাকে ছাড়া কাকেই বা আর পাবেন বিনিপয়সার নার্সগিরি করতে।'

তিথির বিশ্বাস হচ্ছিল না। মাধবী চলে যাবেন ভাবতেই তার পায়ের তলা থেকে জমি সরে যাচ্ছে। সে ক্ষীণ স্বরে বলল, 'কবে আসবে?'

'সে আর কী করে বলি বল! বুড়ো হাড় তো, সহজে সারবে না। কাল গিয়ে ক-দিন পরই রুম্পাকে নিয়ে ফিরে আসবে ওর বাবা। আমাকে এখন অন্তত মাস খানেক মাস দেড়েক তো থাকতেই হবে। ওই জন্যেই তো ডাক পড়েছে।'

চলে যেতে যেতে মাধবী বললেন, 'কাল সকালে একবার তোর ঘরে যাব, হ্যাঁ তিথি? কেমন বাক্স কিনেছিস দেখব। কাল তো আমাকে দেখালি না!' মাধবী হাসতে হাসতে বললেন, 'আজ রাত্তিরের মধ্যেই বরের সঙ্গে ঝগড়া মিটিয়ে নিবি, কাল যেন হাসিমুখ দেখে যেতে পারি।'

মাধবীর এই কথাটা মনে পড়তেই তিথির চোখ দিয়ে পর পর অনেকগুলো গরম জলের ফোঁটা গড়িয়ে যেতে লাগল। আজ

সকালে রওনা হওয়ার আগেই নিশ্চয়ই মাধুবউদি এসেছিলেন তার সঙ্গে দেখা করতে। অথচ সে কোনো সাড়া দেয়নি। তিথি বিড়বিড় করল, ‘মাধুবউদি, ও মাধুবউদি, তুমি আমাকে ক্ষমা করো মাধুবউদি...আমার মাথার ঠিক নেই...আমার খুব কষ্ট হয় মাধুবউদি...আমার মাকে নিয়ে ওরা এভাবে কেন বলে...’

মাধবী এখন অনেকটা দূরে চলে গেছেন, তাঁকে আর ডেকে পাওয়া যাবে না। তবু তিথি তাঁর সঙ্গেই কথা বলে চলল। তার চোখ বন্ধ। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পেতেই সে চমকে চোখ খুলে দেখল ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন সুধা, তাঁর পেছনে সীমা। তিথি একবার তাকিয়েই আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল।

‘কী হচ্ছে কী, তিথি! বাড়াবাড়ির একটা সীমা আছে তো!’ সুধার গলায় যেন একটু আশঙ্কিত ভাব ‘রাগ দেখিয়ে টঙের ওপর শুয়ে রয়েছ, আর সংসারের হাজারটা হ্যাপা সামলে চোদ্দোবার করে তোমায় ডাকতে হচ্ছে। কোনো সাড়া দিচ্ছ না, এসব কী অ্যাঁ! ফিট–টিট আছে নাকি তোমার!’

তিথি অতি কষ্টে গলা দিয়ে আওয়াজ বার করল, ‘না বড়োমা, শরীরটা একটু খারাপ, আজ একটু শুয়ে থাকি।’

‘শুয়েই তো আছ, বেলা–দুপুর গড়িয়ে গেল।’ সুধা কঠিন হলেন, ‘দয়া করা নীচে গিয়ে মুখে একটু জল দিন, তা নইলে তো আবার ডাক্তারবাড়ি ছুটতে হবে। তোমার তো অল্পের ওপর দিয়ে কিছু হয় না।’

‘আমাকে একটু একা থাকতে দাও, প্লিজ!’ তিথি ফিসফিস করল।

‘মা চলো, চলো তো। নাটক হচ্ছে তখন থেকে।’ সীমা তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠল।

সুধা খাটের কাছে এসে একটা চাবি ফেলে দিলেন তিথির মাথার কাছে, তেতো গলায় বললেন, ‘একাই থাকবে। বাড়িতে কেউ রইল না। আমি আর সীমা যাচ্ছি নকুলবাবুর ওখানে। পার্থ কিংবা ওর বাবা ফিরলে চাবি নিয়ে যাবে। চল সীমা।’

সুধারা চলে গেলে তিথি আবার চোখ খুলল। নকুলবাবু মানে জ্যোতিষী, যাঁর ওপর এ বাড়ির সবার, মানে সুধা সীমা আর পার্থর অগাধ আস্থা। ইনিই গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছেন সীমার আসছে শ্রাবণে বিয়ে হবে। এছাড়া আরও অনেক কথাই তিনি বলেন যেসব শুনে তিথি হাসবে না কাঁদবে ভেবে পায় না। যেমন, ইনি বলেছেন পার্থ নাকি গতজন্মে অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজপুরুষ ছিল, এক দক্ষ অশ্বারোহী এবং নিষ্ঠুর শিকারি। শেষ বয়সে তার মানসিক পরিবর্তন আসে এবং ঈশ্বরে খুব ভক্তি হয় তার। সেই পুণ্যের ফলে নাকি এবার সে দিব্যজীবন লাভ করেছে। প্রায় জাতকের গল্প সন্দেহ নেই, কিন্তু দিব্যজীবন বলতে জ্যোতিষী কাকে বুঝিয়েছেন তিথি জানে না। তবে তার কৌতূহল হয়েছিল লোকটি সম্বন্ধে। একদিন পার্থকে সে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘ভদ্রলোক এত সব বলেন কীসের ওপর বেস করে?’

‘উনি দেখতে পান।’ পার্থ বলেছিল

‘সে কী, দেখতে পান মানে! কোথায় দেখেন? কী দেখেন?’

‘ওঁর একটা অদ্ভুত ভিশন আছে, উনি কারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ, তারপর তার মাথার পেছন দিকে দেখতে দেখতে এরকম সব বলে যান। অবশ্য সবসময় মুখ দেখারও দরকার হয় না, বর্ণনা শুনেও বলতে পারেন। যেমন তোমার সম্বন্ধেও তো উনি অনেক কিছু বলেছেন।’

‘আমার সম্বন্ধে!’ তিথি অবাক হল, ‘কী বলেছেন? কই, তুমি কিছু বলোনি তো!’

পার্থ দাড়ি চুলকাল, ‘বলিনি, কারণ তুমি নিতে পারবে না।’

‘নিতে পারব না কেন, এমন কী কথা?’ তিথির ক্রমশ আরও অদ্ভুত লাগছিল। তার সম্বন্ধে কী বলতে পারেন সেই জ্যোতিষী?

পার্থ তিথির চোখে চোখ ফেলল না, বলল, ‘তিথি, উনি বলেছেন তোমার ওপর একটা অশুভ প্রভাব তোমাকে জীবনে সুখী হতে দেবে না।’

তিথি কোনো কূলকিনারা না পেয়ে আবার বলল, ‘মানে!’

‘মানে, উনি দেখেছেন তোমার মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে একজন স্ত্রীলোক, শক্ত, পুরুষালি চেহারা, হাতে একটা ত্রিশূল। সে কিছুতেই তোমাকে মুক্তি দিচ্ছে না—’

‘এসব কী বলছ মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝছি না।’ তিথি অধৈর্য স্বরে বলল, ‘কে স্ত্রীলোক! কে আমার মাথার পেছনে দাঁড়িয়ে—’ বলতে বলতেই হঠাৎ একটা অভাবনীয় সন্দেহে তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ শিউরে উঠল। সে তীক্ষ্ণ চোখে পার্থর দিকে তাকিয়ে বলল, ‘উনি সেই স্ত্রীলোকটিকে চিনতে পারেননি?’

‘না, মানে, সেভাবে কিছু বলতে পারেননি। চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন—’

‘ও! কী বর্ণনা শুনি?’

পার্থ উদাস মুখে বলল, ‘যাক তিথি, শুনে তো—’

'আচ্ছা! আমার মুক্তির উপায় কিছু বলেননি উনি?' তিথির গলায় ধার বাড়ছে।

'বলেছেন। সেসব আমি তোমায় বলেওছি। তুমি তো কোনো কথাই শোনো না। বললাম ওখানে বেশি যাওয়া-আসা কোরো না—এ কী তুমি কাঁদছ। ওই জন্যেই আমি কিছু বলতে চাইনি—'

তিথি হাউহাউ করে কাঁদছিল। বিকৃত গলায় বলল, 'থাক আর দয়া দেখাতে হবে না। তুমি কি একটা মানুষ? তুমি কী বলতে চাইছ আমি অনেকক্ষণ থেকেই বুঝতে পারছি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছি না। আমাকে আমার মা সম্বন্ধে এত বড়ো কথা বললে তুমি—'

'আমি কিন্তু কিচ্ছু বলিনি, তুমি জোর করেছ। আর এসব নকুলবাবু—'

'চুপ করো। একটা কথাও আমি বিশ্বাস করি না। সব তোমার বানানো কথা!' তিথি চোখের জল মুছল, 'তোমার বিবেক-টিবেক কিচ্ছু নেই? আবার নিজের সম্বন্ধে জাতকের গল্প বানাও!'

পার্থ হাসল, 'তুমি বিশ্বাস না করলে আমি কী করতে পারি বলো!' সে পাশ ফিরে শুয়েছিল। তিথির বহুক্ষণ মনে হচ্ছিল, সে কি একটা সরীসৃপের পাশে শুয়ে আছে!

মনের এ কী জটিল অসুখ, এ অসুখে যত রাজ্যের বীভৎস স্মৃতিগুলোই বার বার মনে পড়তে থাকে। তিথি মুখ খুলে শ্বাস টানতে গিয়ে দেখল তার জিভটা টাকরার সঙ্গে এমন সেঁটে গেছে যে সে খুলতে পারছে না। সমস্ত থুতু শুকিয়ে গেছে মুখের ভেতর। ওপরে খাওয়ার জল নেই। পার্থ যখন শুতে আসে তখন একটা জলের বোতল নিয়ে আসে, আবার সকালে নীচে নিয়ে যায়। কাল অনেক রাত্রি অবধি জেগে ছিল তিথি, পার্থ আসেনি। জলের বোতলও তাই আনা হয়নি। কাল সে যখন বিগশপারটা নিয়ে

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে আসছে, শুনেছিল সুধা বলছেন, 'সবসময় বাপের বাড়ি থেকে জিনিস আনবে আর সব বুকলি বেঁধে নিয়ে যাবে ওপরে। লজ্জাশরমও নেই!'

পার্থও তাকে একদিন বলছিল, 'এইসব ক্রিম-টিম হ্যানাত্যানা সব ওপরে রাখার কী দরকার! নীচে রাখলেও তো পারো। সবাই মিলে ইউজ করা যায়। মা বলছিল সীমার খুব কষ্ট হয়। ও একটু অভিমানী তো! তুমি ওকে অন্তত একটু দিলে তো পারো।'

শুনে তিথি থ হয়ে থেকেছে। অদিতি তাকে দিয়েছেন একটা ছোটো চার্মিসের কৌটো আর একটা ভেসলিনের টিউব। এ বাড়িতে ক্রিম-টিম যে একেবারে নেই, তা নয়। কিন্তু তাতে তিথি কোনোদিন হাত দেয়নি। তাকে হাত দিতে বলেওনি কেউ। বরং এই নিয়ে বাড়িতে অনেক কাণ্ড হয়ে গেছে। তারপরে পার্থ তাকে এইসব কথা বলে কী করে এটাই অচিন্তনীয়।

সীমা তার টিউশনির টাকা দিয়ে শীতের প্রথমেই পন্ডস ক্রিম কিনে এনেছিল। সেটা সে একাই মাখে। অলক আর সুধাকে কখনো এসব কিছু মাখতে দেখেনি তিথি, ওঁরা তেলই মাখেন। তিথিও তাই। সারা গায়ে নয়। দু-তিন ফোঁটা নিয়ে সারা মুখে ঘষে ওই হাতটাই আবার পায়ের পাতায় বুলিয়ে নেয়। এখানে এসে খুব পা ফেটেছে তিথির। গোড়ালিতে গভীর লম্বালম্বি চিড়। সীমা একটা ময়শ্চারাইজারও কিনেছে, তিথি দেখেছে। এক ছুটির দিন স্নানের পর সে একটু রোদের লোভে বারান্দায় গিয়ে দেখেছিল রোদের টুকরোটা সীমার দখলে। সীমা বসে বসে পায়ের পাতায় ময়শ্চারাইজার লাগাচ্ছে। তাকে দেখে একবারও মুখ তুলল না। তিথি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ সীমার পদচর্চা দেখল। তারপর ঘরে এসে খাবার জায়গা করে রান্নাঘর থেকে ডালের বাটি নিয়ে আসছে, দেখতে পেল সীমা দ্রুতবেগে ময়শ্চারাইজারের বোতলটা নিয়ে ঘরে ঢুকে আবার দ্রুতই খালি হাতে বেরিয়ে গেল। তিথি ঘরে এসে কিছুটা কৌতূহলের সঙ্গেই একবার চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখল। ড্রেসিং টেবিলে, বাক্সের ওপরে, খাটের ওপরে, দেয়ালের তাকে, কোথাও ময়শ্চারাইজারের বোতলটা নেই। সীমা ময়শ্চারাইজারটা কিনে লুকিয়ে রেখেছে। তিথির হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। তার পরেই মনে হল—আহা রে, বেচারি সীমা! না লুকিয়ে কী আর করবে সে। বিচিত্র অনুভূতিতে পরক্ষণেই তার

দু-চোখ জ্বালা করে উঠল। সীমা তো তাকেও সন্দেহ করে।

পার্থ যে মাঝেমধ্যেই বোনকে লুকিয়ে সীমার ক্রিমের কৌটো থেকে খাবলা মারে, তিথি জানত। ব্যাপারটা তার পছন্দ না হলেও এটা ঠিক কতখানি চুরি-জাতীয় অপরাধের পর্যায়ে, সে বিষয়ে তার ধারণা ছিল না। কিন্তু সীমা যেদিন পার্থকে হাতেনাতে ধরল, যাচ্ছেতাই বলল সে দাদাকে। তিথি সেখানে উপস্থিত ছিল। সীমা চিৎকার করছিল, 'ও, তাই বলি! এই সেদিন কিনলাম বোরোলিনটা। এরই মধ্যে এমন তুবড়ে গেল কেন! ক্রিমের কৌটোটাও ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এই কাণ্ড! চুরি করেই ফাঁক করে দিচ্ছিস, অ্যাঁ! লজ্জা করে না। আর গুণ নেই ছার গুণ আছে, চুরি!'

পার্থ নির্লজ্জের মতো বলল, 'একদিন একটুখানি নিইছি তাতেই অত চোপা করছিস কেন রে? এইটুকু নিলে চুরি হয়? তাও আবার মুখে মাখার ক্রিম—'

সীমা দ্বিগুণ চেঁচিয়ে বলল, 'চোপা করব না তো কি, পুজো করব! ধোয়া তুলসী পাতা তুমি, না! চুরি কাকে বলে জানো না। একদিন নিয়েছ কি ক-দিন নিয়েছ তার আমি কী জানি। তাহলে তুমি ছাড়াও আছে কেউ হাতসাফাইয়ে—' বলতে বলতে সে এমনভাবে তিথির দিকে তাকাল, তিথির বুঝতে বাকি রইল না সীমা তাকেও সন্দেহ করছে। লজ্জায় অপমানে দিশাহারা লাগছিল তার। সীমার চিৎকারে মাধবী নীচে নেমে এলেন। তখন বেশ রাত। খাওয়া-দাওয়া হয়ে যাওয়ার পরেই ঘটেছিল ঘটনাটা। অলক বাথরুম থেকে হন্তদন্ত হয়ে আসতে আসতে চেঁচাচ্ছিলেন, 'কী হয়েছে ও সীমা, কী হয়েছে রে?'

পার্থ তখন ভালোমানুষের মতো কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, 'না রে সীমু, সত্যি বলছি বিশ্বাস কর। এই শুধু আজকেই...ঠোঁটটা বড্ড চড়চড় করছিল...এর আগে কখনো...অন গড বলছি...'

সীমা অগ্নিদৃষ্টিতে তিথির দিকে একঝলক তাকিয়ে নিয়ে বলল, 'থাক আর দিব্যি গেলে কাজ নেই। খবরদার বলছি আমার

জিনিসে হাত দেবে না। অত শখ হলে কিনে মাখবে—'

অলক গায়ে পড়ে বলে উঠলেন, 'হুঁঃ, পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই আবার মুখে ক্রিম লাগায়, ছোটোলোক একটা। ও তিথি, আমার মশারিটা শিগগির টাঙিয়ে দিয়ে যাও।'

মাধবী বলছিলেন, 'যাকগে বাবা। চিৎকার শুনে ভাবলাম কী না কী হল বুঝি...'

এই সামান্য তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে যে এমন চিৎকার চেঁচামেচি হতে পারে, তিথিরও ধারণা ছিল না। কিন্তু সে কারণে সীমাকেও তেমন দোষ দিতে পারছিল না সে। বরং তার বার বার মনে হচ্ছিল, পার্থ মিথ্যে শপথ করে কি ইচ্ছে করেই সন্দেহের তীরটা ঘুরিয়ে দিতে চাইছিল তার দিকে!

ঘুলঘুলি দিয়ে ঘরে ঢোকা আলোর দানাগুলো যখন ক্রমশ হলদে থেকে ঘোলাটে হয়ে শেষে বেগুনি হয়ে এল, তিথির মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল। এতক্ষণ একভাবে শুয়ে শুয়ে সে মাথাটা যেভাবে চালিয়ে গেছে, যেন সেটা একটা চলমান টিভির পর্দা। একটার পর একটা ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। সেখানে সিরিয়ালের মতো। আর এখন সব অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবার পর তার মাথায় ওই শূন্য স্ক্রিনের মতোই অসংখ্য পিনের মতো আলোর বিন্দু নাচানাচি করছে, সেইসঙ্গে কানের মধ্যে পরিত্রাহি ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ। তিথি দু-হাতে কান চাপা দিল, শব্দ বাড়ছে। উপুড় হতে চেষ্টা করল তিথি। সমস্ত শরীরটা যেন একটা ফাঁপা নলের মতো। নলের ভেতরটা খালি, একেবারে খালি। আশ্চর্য, এত ফাঁপা আর শূন্য একটা শরীর নাড়তে পারছে না কেন সে! শূন্যতার এত ভার! তিথির কান্না পেল, কাঁদতে গিয়ে সে দেখল তার চোখে আর কোনো জল আসছে না।

ঘরের ভেতরে ক্রমশই অন্ধকার চেপে আসছে। প্রায় সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে থাকতে থাকতেই তিথি শুনল সিঁড়িতে যেন কার পায়ের আওয়াজ। আওয়াজটা কাছে এসে দরজা খুলে ফেলল। তিথি কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

'মা আবার কোথায় বেরোল? চাবি নিশ্চয়ই তোমার কাছে—' পার্থ ঘরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে, 'এ কী! তুমি সেই থেকে শুয়ে নাকি। তিথি! কী হয়েছে!'

পার্থর গলায় অপ্রত্যাশিত বেদনা ধ্বনিত হল, 'কী পাগলামি করছ তিথি, সারাদিন খাওনি? এত রাগের কী হল তোমার?'

তিথির ঠোঁট নড়ল না, কিন্তু সে বলল, 'রাগ নয়, পার্থ। তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না। সেই জন্যেই আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে না। তুমি একটু ভালোবাসলেই আমি উঠে দাঁড়াতে পারব...'

পার্থ শুনতে পেল না, কিন্তু তিথির পাশে বসে তার ওপর ঝুঁকে পড়ল, 'উঠবে না তিথি? কাল আমি আসিনি বলে রাগ করেছ? আসলে আমারও খুব রাগ হয়েছিল। তোমার ওপর নয়, তোমার মায়ের ওপর। উনি তো কিছুতেই আমাকে মানতে পারেন না।'

'আমাকে একটু ধরে দাঁড় করিয়ে দাও।' তিথি অতি কষ্টে গলায় স্বর আনল।

পার্থকে ধরে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেই জগৎব্রহ্মাণ্ড ঘুরে উঠল তিথির মাথার মধ্যে। চোখে অন্ধকার দেখতে দেখতে সে বলল, 'আহ্ পার্থ...বাথরুম...আমায় বাথরুমে নিয়ে চলো...বমি পাচ্ছে...'

কোনোরকমে বাথরুমে অবধি পৌঁছিয়েই ওয়াক তুলল তিথি। কিছু বেরোল না, শুধু তেতো পিত্তজল ছাড়া। তবু মুহুর্মুহু শরীর ভেঙে ওয়াক আসতে লাগল তার, যেন নাড়িভুঁড়ি সব ছিঁড়ে উঠে আসতে চাইছে তার মুখ দিয়ে।

৪

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শরীর দেখছিল পার্থ। এরকম সে মাঝেমধ্যে করে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, সামনে থেকে, পাশ থেকে নানাভাবে নিজেকে দেখে। দেখতে দেখতে তার ধারণা হয়, সে যথেষ্ট সুন্দর। শুধু একটু রোগা। সেটা নিয়ে অবশ্য লজ্জার কিছু নেই। ব্যায়ামবীরের মতো ফোলানো শরীর মোটেই রুচিসম্মত কোনো চেহারা নয়। আসল ব্যাপার হল চেহারাতে ইন্টেলেক্টের ছাপ। পার্থ হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো সুন্দরভাবে উশকোখুশকো করে দিয়ে দেখতে লাগল। তার সৌন্দর্য পেশিতে নয়, ইন্টেলেক্টে। ঠোঁটের কোণে সামান্য ভাঁজ খেলাল,—হাসি, কিন্তু হাসি নয়। বাঃ, দারুণ মানিয়েছে।

সুধা খাটে বসে বসে ছেলের কাণ্ড দেখছিলেন। বেশ ঠান্ডা পড়েছে। শীতকালে দুপুরে ঘুমোনো যায় না। ঘুমিয়ে পড়লে লেপ-কম্বল সরিয়ে ওঠাই মুশকিল হয়ে যায়। কোনোরকমে এই সংক্ষিপ্ত দুপুরবেলাটুকু পার করে দিতে হয়। সুধা প্রশ্রয় মেশানো কৌতুকের স্বরে বললেন, ‘কী হচ্ছে ও? সিনেমা?’

‘না, স্টিল।’

‘সে আবার কী?’

‘মানে স্থিরচিত্র। পেপারে যেসব ছবি বেরোয় না? ওইরকম।’ পার্থ গালে হাত দিয়ে চিন্তার ভঙ্গি করল, সেটা পছন্দ না হওয়ায় হাত দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে দুটো বুড়ো আঙুল জুড়ে হাতের পাতার ফাঁক দিয়ে নিবিষ্ট মনে দেখতে লাগল নিজেকে।

সুধা আবার হাসলেন, ‘কী যে করিস পাগলামি!’

'পাগলামি নয় মা। দেখবে, একদিন কাগজে আমার ছবি বেরোবে। হইচই হয়ে যাবে চারিদিকে—'

সুধা সস্নেহে পার্থকে দেখতে দেখতে বললেন, 'আরও রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন রে দিন দিন। ভালো করে খাওয়া-দাওয়াও করিস না। ওই ক-টা ভাত—'

পার্থ একটা নিশ্বাস ফেলে খাটের ওপর বসল ধপ করে। তারপর চিত হয়ে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর খাওয়া! প্রাণে শান্তি না থাকলে কি আর..। আমার নিজের ভেতরে তো চাপ কম নেই। এই লাইনে কেউ কাউকে সুযোগ দেয় না, লড়তে হয়। আমিও তো লড়ছি মা, তবু মাঝে মাঝে এত ফ্রাসট্রেটেড লাগে। তার ওপর ঘরেও তো অশান্তি লেগেই আছে—'

সুধা সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন, 'আমি তখনই বলেছিলাম। এভাবে বিয়ে কি একটা বিয়ে। আর কপালে কী মেয়েই জুটিয়েছ—যেমন বেয়াড়া তেমনি বেহায়া। ওর বায়নাক্কা বেয়াড়াপনা সামলানো কী সহজ কথা। আর তোকেও বলি পার্থ—', সুধা হাত বাড়িয়ে পার্থকে ছুঁলেন, তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, 'এবার একটা কাজ-টাজ দ্যাখ বাবা, এভাবে কতদিন আর—'

পার্থ আপশোসে মাথা নাড়ল। বলল, 'তুমিও তিথির মতো কথা বলছ মা। সব মেয়েদের এই এক দোষ। তোমাদের বড়ো কোনো স্বপ্ন দেখানো সম্ভব নয়। সেই ধারণাই নেই তোমাদের।'

সুধা রাগ করলেন, পার্থ তাঁর স্বপ্ন দেখার অক্ষমতার কথা বলেছে বলে নয়, তিথির সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছে বলে। একটু চুপ করে থেকে অপ্রসন্ন মুখে বললেন, 'সে তুমি কী বলো কী বোঝো তুমিই জানো। তবে কিনা, অনেকদিন তো হল। আমি তো আর ওর মতো নিজের দিক দেখি না। আমি বলি সংসারের দিক চেয়ে। তোর বাবার চাকরিইবা আর ক-দিন? সীমুটার যে কী গতি হবে—সেদিন তো নকুলবাবু বললেন বাড়িতে এবার একটু পুজো-টুজো করতে হবে, কী নাকি এই বাড়িতে গ্রহের বাসা হয়েছে।

সেসব কাটিয়ে নিলে খিদিরপুরের সম্বন্ধটাই নাকি লেগে যাবে। তুই যে বললি ছেলের অফিসে গিয়ে খোঁজখবর করবি-টরবি, কই গেলি না তো? আজ তো দেখি বেরোলি না কোথাও, ঘুরে আসতে পারতিস তো—অ্যাই পার্থ, বাঃ রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?'

সুধা পার্থকে একটু ঠেলা দিলেন। পার্থ সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠেলা খেয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমজড়ানো গলায় বলল, 'গায়ে একটা ঢাকা দিয়ে দাও না।'

সুধা একটা কম্বল পার্থর গায়ের ওপর ফেলে দিতে দিতে বিরস মুখে বললেন, 'আবার এই অবেলায় ঘুম। ভালো!'

সীমা গেছে পাড়ায় উলবোনার ডিজাইন তুলতে। তিথি কলেজে। সুধা জানলা-দরজা বন্ধ করে ড্রেসিংটেবিলের ড্রয়ারের মধ্যে থেকে ওপরের ঘরের চাবিটা বার করলেন। তিথি চাবি রেখে যায়, সেই সুযোগে সুধা অবসরমতো তার ঘরে মাঝে মাঝে তদন্ত চালান। এটা এমন কিছু বড়ো অপরাধ নয়, তবু সুধা কাজটা গোপনেই করে থাকেন। পার্থ ঘুমিয়ে পড়ার পর আজও তিনি বাইরের দরজাটা ভেজিয়ে রেখে ওপরে চললেন।

প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস-টাসগুলো দুপুরের পর ছাড়া হয় না বলে কলেজ থেকে ফিরতে ফিরতে তিথির প্রায়ই বিকেল গড়িয়ে যায়। এবার কলেজ করাটা আস্তে আস্তে একটু কমাতে হবে, তিথি ভাবছিল। তার বদলে যেটুকু সময় পাওয়া যায়, বাড়িতে বসে সেটুকু পড়লে পড়াশুনাটায় আর একটু বাঁধুনি আসে। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ দিন দিন এমন দাঁড়াচ্ছে, সেখানে দু-দণ্ড মনঃসংযোগ করে পড়তে বসাই মুশকিল। তবু আজ একটু আগে আগেই কলেজ থেকে ফিরল তিথি। মনে মনে জোরালো প্রতিজ্ঞা করতে করতে, আজ সে যেভাবেই হোক পড়বেই। এর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনেকে পড়াশুনা করে। তিথি তো নিজের বাবার কথাই জানে। তাহলে সে পারবে না কেন!

বাড়ি ফিরে তিথি দেখল নীচের ঘরে পার্থ একা কম্বলমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। আর কেউ নেই। ঘরের মধ্যে অন্ধকার! আলো

জ্বালাল তিথি। ড্রয়ার খুলে ওপরের ঘরের চাবিটা খুঁজে পেল না সে। আজ সারাদিন ক্লাস করতে করতে আর লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পড়তেও থেকে থেকে গা গুলিয়ে উঠেছে তার। এটা প্রায়ই হচ্ছে। মুখে কোনো রুচি নেই। তিথি দু-ঢোঁক জল খেল। খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গা গুলোতে শুরু করল তার। এরকম হচ্ছে কেন, তিথি বোঝার চেষ্টা করছিল, সেরকম কিছু খায়নি তো সে!

পার্থর মুখে থেকে কম্বলটা টেনে সরিয়ে দিতেই চোখ কুঁচকে ফেলল পার্থ। তার চোখে আলো গেছে। চোখ পিটপিট করে জড়িত স্বরে বলল, 'হ্যাঁ? কী?'

'এখন ঘুমুচ্ছ? উঠে পড়ো। নইলে গা ম্যাজম্যাজ করবে।' তিথি এদিক-ওদিক তাকাল, 'বড়োমা কই গো?'

পার্থ আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'জানি না তো। তুমি আজ তাড়াতাড়ি চলে এলে যে, ক-টা বাজে!'

'আমার শরীরটা আবার খারাপ করছে, জানো! কী যে হয়েছে, সারাক্ষণ বমি বমি লাগে। একটু জোয়ান বা বিটনুন মুখে দিতে পারলেও হত—'

পার্থ উঠে বসল। হঠাৎ কীরকম অদ্ভুত মুখ করে তিথিকে দেখতে দেখতে বলল, 'দাঁড়াও দাঁড়াও, এক সেকেন্ড। তোমার পেটের গোলমাল হয়েছে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না, কই সেরকম তো—'

'আমি কী বলছি শোনো,' পার্থ হঠাৎ গলা নামাল, 'বমি পাওয়াটা অন্য কিছুর লক্ষণ নয় তো?'

তিথি বজ্রাহতের মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। কী সর্বনাশ। এ কথাটাই তার মাথায় আসেনি! ভয়ে তার হাত–পা হিম হয়ে গেল। মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে পারছে না কবে তার শেষ পিরিয়ড হয়েছিল। এমনিতেই পিরিয়ডের তারিখ মনে থাকে না, কারণ পিরিয়ড একটু উলটোপালটাই হয় তার। সবসময়ই তারিখ এগিয়ে বা পিছিয়ে যায়। তারপর এরকম জটিল সংঘাতের মধ্যে দিয়ে ধাক্কা খেয়ে এগোতে এগোতে সে খেয়ালই রাখতে পারেনি ঋতু বন্ধ হয়ে গেছে কবে। প্রাণপণে ভাবার চেষ্টা করছিল তিথি, পুজোর পর থেকেই তো তার আর রক্তপাত হয়নি। তার মাথা ঘুরে গেল, সমস্ত শরীর অস্থির অস্থির করছে। রক্তশূন্য মুখে খাটের ছত্রি ধরে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করল সে, অস্ফুট আর্তনাদের মতো বলল, 'কী হবে!'

ঠিক তখনই ওপরের ঘর থেকে নেমে এলেন সুধা। নেমেই তিথিকে দেখে একটু সিটিয়ে গেলেন। অবচেতন অপরাধবোধে ঘরে না ঢুকে সোজা কলতলার দিকে চলে যাচ্ছিলেন তিনি, পার্থ ডাকল, 'মা, শোনো!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়ালেন সুধা। তাঁর মুখে অস্বস্তি, কিন্তু স্বরে বিরক্তি ফুটিয়ে বললেন, 'কী হল!'

'একটু এসো তো এদিকে। তিথি কী বলছে দ্যাখো—' পার্থর গলায় চাপা উত্তেজনা। সুধা ঠিক ঠাহর করতে পারছিলেন না। তাঁর একবার মনে হল তিথি কি ধরতে পেরেছে তাঁর ওপরের ঘরে যাওয়াটা? না মনে হয়। কী করে ধরবে? পার্থও তো ঘুমোচ্ছিল। সুধা অনিশ্চিত স্বরে বললেন, 'কী? কী বলছে?'

পার্থ ঠোঁট টিপে হাসল, 'বিটনুন চাইছে মা। ওর গা গুলোচ্ছে।'

'অ্যাঁ!' সুধা হঠাৎ কোনো খেই পেলেন না।

'সেদিন বমি করছিল বললাম না? ওর আজকাল কেবলই বমি পায়।'

পার্থ ইঙ্গিত করে চলেছে। তার স্বরে কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ নেই। কৌতুক আছে। সুধা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিথির দিকে তাকালেন। তার মুখে সুস্পষ্ট ভয়ের ছাপ। সুধা আত্মস্থ হলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তিথির শরীরে চোখ বিঁধিয়ে বললেন, 'হুঁ, ক-দিন?'

'আমি...আমি জানি না বড়োমা...' তিথির চোখ বিস্ফারিত, তার হাত বিছানার চাদর খামচে ধরেছে।

'আঃ ন্যাকামো কোরো না। মাসিক কবে বন্ধ হয়েছে বলবে তো?'

তিথি অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'এ মাসে হয়নি বড়োমা'।

'বমি হচ্ছে মানে দু-মাস।' সুধা কঠিন স্বরে বললেন, 'এ অবস্থায় বাড়ির বার হবে না বলে দিলাম। কলেজ-টলেজ যাওয়া এবার বন্ধ করো।'

হাতের চাবিটা ঠক করে ড্রেসিংটেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। তাঁর হাতে চাবি দেখে চকিতের জন্যে তিথির একবার মনে হল সুধা তার অনুপস্থিতিতে ওপরের ঘরে গিয়েছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আর অন্য কিছু ভাবার অবসর ছিল না তার। অন্য এক ভয়াবহ দুশ্চিন্তায় সে তখন চিবুক অবধি ডুবে যাচ্ছে।

ওপরের ঘরে চলে এসে নির্জীবের মতো শুয়ে পড়ল তিথি। এ কোন গভীরতর দুঃস্বপ্নের জালে জড়িয়ে পড়ল সে! যতদিন পড়াশুনাটা সে আবার শুরু করতে পারেনি, ততদিন কোনো স্বপ্নও ছিল না। পড়াশুনা শুরু করার পর দাঁতে দাঁত চেপে সব সে সহ্য করে যাচ্ছে শুধুমাত্র একটা বহু দূরবর্তী স্বপ্নকে সামনে রেখে। সেটা না হলে এতদিনে সে পাগল হয়ে যেত। অথচ, তার স্বপ্ন

যে কেবলই তার নিজেকে নিয়ে নয়, এ কথা কেউ বিশ্বাস করে না। তিথি প্রতিমুহূর্তে অনুভব করে, তার পড়াশুনা করার চেষ্টাটা যেন তার একান্ত ব্যক্তিগত একটা বিলাস। স্বার্থপরতা। এ বাড়ির মানুষজনেরা এমনটাই ভাবেন। তিথিকে সেই নিজস্ব অবসরটুকু দিতে তাঁদের রাগ হয়, বিরক্তি হয়। এমনকী, রাত্রে পার্থও তার দাবি ছাড়ে না। তিথির একেকবার মনে হয়, এ বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করা বোধ হয় তার পক্ষে সম্ভব নয়। যুঝতে যুঝতেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মনঃসংযোগের ক্ষমতা থাকে না। মনের খুব গোপন কোণে একটা কথা ঘুরেফিরে উঁকি মারে। পরীক্ষার আগে কয়েকটা দিন মায়ের কাছে গিয়ে থাকলে কেমন হয়! কথাটা মনে হওয়ামাত্র মনের মধ্যে আর একটা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। স্পর্ধা দেখিয়ে চলে আসার পর এখন দরকারে পড়ে সুবিধা নিতে যাওয়ার মধ্যে যে অগৌরবের গ্লানি, সেটাই উপলব্ধি করে অন্তরাত্মা সংকুচিত হয়ে ওঠে তিথির। এত তাড়াতাড়ি হারও তো সে মানতে চায় না। সে এখানে থেকেই পড়বে, পরীক্ষা দেবে, পাশ করবে...মায়ের কাছেই যে তার নিজেকে প্রমাণ করার দায় অনেক বেশি।

তিথি মুখে হাত চাপা দিয়ে কেঁদে উঠল। হল না...হল না। তার আগেই সে হারতে বসেছে। সব মিথ্যে হয়ে গেল। আর তার পড়াশুনা হবে না। দু–মাস হয়ে গেছে, পরীক্ষার আর মাস ছয়েক বাকি। কী করে ওই সময়ে পরীক্ষা দেবে! এ কী শাস্তি দিলেন তাকে ঈশ্বর। কেন উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতে–না–করতেই এমন করে তার হাত পা বেঁধে দিলেন!

পার্থ ঘরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল। তিথির দিকে তাকিয়ে হাতের এমন একটা ভঙ্গি করল যেটা একই সঙ্গে গর্বিত এবং অশালীন। তার সমস্ত মুখে আনন্দে জ্বলজ্বল করছে। তিথির মুখে হাসি নেই দেখে সে এগিয়ে এল, ‘এই মেয়েটা, ইশ্ খুব ঘাবড়ে গেছ না? সব ঠিক হয়ে যাবে। উফ্ এটা যে কী দুর্দান্ত একটা ব্যাপার, তিথি, আমি ভাবতেই পারছি না আমি বাবা হতে চলেছি! দিস ইজ রিয়েলি আ গ্রেট ফিলিং!’

‘কী খাওয়াবে?’ তিথির গলার স্বর শুকনো খটখটে। তার চোখেও এখন একফোঁটা জল নেই।

'বলো কী খেতে চাও।' পার্থ ডগমগ করছে, 'বেগুনি খেতে ইচ্ছে করছে, না আলুর চপ?'

'আমার কথা বলছি না।'

'তবে?' পার্থ একটু থিতিয়ে গেল।

তিথি ধীরে ধীরে উঠে বসল। তার চোখ পার্থর চোখের দিকে স্থির। খানিকক্ষণ একভাবে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাচ্চাটাকে তুমি কী খাওয়াবে সেটাই জানতে চাইছি। সে তো জন্মেই ভিক্ষে করবে না।'

পার্থর মুখটা একমুহূর্তে কালি হয়ে গেল। ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, 'বাজে কথা বোলো না। ভিক্ষে করতে যাবে কেন? ছিঃ!'

'তা ছাড়া আর কী পার্থ!' তিথি আর্তস্বরে বলে উঠল, 'তুমি বুঝতে পারছ না আমরা এখন একটা বাচ্চার জন্যে তৈরি নই! আমরা ভুল করে ফেলেছি পার্থ। তুমি কিচ্ছু করো না, সংসারের এই অবস্থা। আমাকে তো পরীক্ষাটা দিতেই হবে—' তিথি হাঁপাচ্ছিল। পার্থর হাত ধরে ফেলল সে, ব্যাকুল গলায় বলল, 'না না পার্থ, খুব ভুল হয়ে গেছে। আমাদের কিছু করা উচিত, এ হতে পারে না।'

'কী হতে পারে না! কী বলছ কী তুমি?' পার্থর কপালে প্রবল ভ্রূকুটি।

'এখন আমি...আমি পারব না...' তিথি কাঁদতে শুরু করল। তার হাতটা সরিয়ে দিল পার্থ। চোখেমুখে ঘৃণা ফুটিয়ে বলল, 'মানে? তুমি মা হতে চাও না? চমৎকার! কেন জানতে পারি কী!'

চেঁচিয়ে উঠল তিথি, 'সেই কথাটাই তো বলছি আমি। তুমি কেন বুঝতে পারছ না পার্থ! আমি...আমরা...আমাদের পক্ষে এখন

এসব সম্ভব নয়—'

পার্থ তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিল, 'দ্যাখো তিথি! সব বিষয় অনর্থক জটিল করে তোলা তোমার স্বভাব। এখনও ঠিক সেটাই করছ। আমাদের পক্ষে কী কতটা সম্ভব সেটা আমাকেও ভাবতে দাও। সব ভাবনা তুমি একাই ভাববে তা তো হতে পারে না। তৈরি নও মানে আবার কী? তুমি এখনও নিজেকে বাচ্চা ভাবছ নাকি, সেইজন্যে এক্ষুনি বাচ্চা চাইছ না? জানো, মায়ের তোমার মতো বয়সে আমি আর সীমা হয়ে গেছি?' পার্থ আবার ঝাঁকাল তিথিকে, 'একদম বাড়াবাড়ি করবে না। অত চিন্তার কিছু নেই।'

তিথি ছটফট করে বলল, 'কিন্তু আমি পরীক্ষা দেব কী করে পার্থ! তখন আমার আটমাস চলবে...শরীর খারাপ করবে নিশ্চয়ই, যদি বাচ্চাটা হওয়ার সময় হয়ে যায়?'

'পরীক্ষাটা এর চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়।' পার্থ হাত নাড়াল, 'পরীক্ষা চাইলে পরেও দেওয়া যাবে।'

তিথি বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকল। বিড়বিড় করে বলল, 'পরে! পরে আর কবে দেব...'

তার চোখের সামনে একটার পর একটা গাঢ় রঙের পর্দা পড়ে যাচ্ছিল। যেন আলোর শেষতম বিন্দুটি থেকেও অধিকারচ্যুত হয়ে যাচ্ছে তার দৃষ্টি। এ বছরও যদি পার্ট ওয়ানটা না দেওয়া হয়, তার পরের ধাপগুলো পেরোবে কবে সে! পেরোনো কি যাবে আদৌ! একটা বাচ্চার জন্ম দেওয়ার পর সেই সুযোগ তাকে দেবে কি এই সংসার! তিথি অন্ধের মতো হাত বাড়াতে চাইল, অনির্দিষ্টভাবে। সে একটা অন্ধকার খাদে ঝাঁপ দিয়েছিল। খাদটা নীচের দিকে সরু হতে হতে একটা কুয়ো হয়ে যাচ্ছে। কুয়োর দেওয়াল চারপাশ থেকে চেপে বসছে তিথির ওপরে, সে আর হাত-পাও নাড়তে পারছে না...।

রাত্তিরে খেতে বসে আবার গা গুলোচ্ছিল তিথির। সুধা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই অলক আর সীমাকে সব কিছু বলেছেন। সীমার মুখে

অমাবস্যার অন্ধকার। অলকের মুখেও রাগের ছাপ। ডাঁটা চিবোতে চিবোতে তিনি জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছেন পার্থর দিকে। পার্থর যথারীতি কোনো বিকার নেই, সে সুধাকে বলল, 'আলুভাজা আর নেই?'

সুধা মাথা নাড়লেন। নিজের পাতের থেকে নিয়ে বললেন, 'আমার লাগবে না। নে।'

'না না, সবটা দিয়ো না। একটু দিলেই হবে।' পার্থ থালাটা এগিয়ে দিল। বলল, 'কাল একটু বেশি করে কোরো দুপুরে।'

'হুঁঃ, বেশি করে কোরো।' অলক মুখ বিকৃত করলেন, সুধার দিকে তাকিয়ে বললেন 'আলু ছ–টাকা হয়ে গেছে খেয়াল থাকে যেন। গিলতে লজ্জাও করে না।'

সুধা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'নাও শুরু করো এক্ষুনি। রাগ দেখানোর জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকো সবসময়। তোমার আর কথা বলে কাজ নেই। হিসেব না কষে কোনদিন রান্না করেছি আমি?'

অলক খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে গ্লাসটা ঠক করে নামিয়ে রাখলেন মেঝেতে। উঠতে উঠতে হুমকির সুরে বললেন, 'এমনি পাষণ্ড নই যে আজকের দিনে খারাপ কথা বলব। তবে এই তোমাকে বলে রাখলুম সুধা, দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়। যার ম্যাও সে সামলাবে। ছেলেকে বলে দিয়ো।'

পার্থর কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না। খাওয়া শেষ করে মন দিয়ে আঙুলের ডগা চুষছিল সে, যেন কোনো কথাই তার কানে পৌঁছোয়নি।

রাত্রে সে তিথির শরীরে হাত দিতেই তিথি হঠাৎ খেয়াল করল তার স্তন দুটো অসম্ভব টনটন করছে ব্যথায়। পার্থর হাত সরিয়ে

দিয়ে সে বলল, ‘আঃ। লাগছে।’

পার্থ হাত সরিয়ে নিল বটে, কিন্তু তাকে ছাড়ল না। শরীরের ওপর উঠে এল। বলল, ‘যে ক–দিন পাচ্ছি করে নিই, কী বলো? ক–দিন পর তো আর তুমি করতে দেবে না, বাচ্চাও লাথি ছুঁড়বে দমাদ্দম।’ পার্থ হাসছিল। তার হাসিটা এত অশ্লীল লাগল তিথির যে সে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

পার্থ পাশ ফিরে শুয়ে পড়ার পর তিথির ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ নিষ্পলক চোখে শূন্যদৃষ্টিতে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ সে ঘুমন্ত পার্থকে ছুঁয়ে ফিসফিস করে ডাকল, ‘মা! ও মা! মা গো...মা মা মা মা...’

৫

সিদ্ধান্তটা নিতে দিন চারেক সময় নিল তিথি। এই কয়েকটা দিন ছিল তার জীবনের তীব্রতম টানাপোড়েনের দিন। তিথি বুঝতে পারছিল, আবারও একটা কঠিন বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে সে। একেবারে একা। জীবনে এত একা এর আগে সে কখনো ছিল না।

এই চারটে দিন কলেজ করেছে সে। সুধার আপত্তি শোনেনি। বলেছে, 'আমি ঠিক আছি বড়োমা। তুমি চিন্তা কোরো না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব।' তার বেরোনোর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কলেজ যাওয়া নয়। তার মনে হচ্ছিল, রাস্তায় একটু একা একা না হাঁটতে পারলে সে মাথা ঠান্ডা করে চিন্তা করতে পারবে না।

তার দেহের অভ্যন্তরে একটু একটু করে দানা বাঁধছে আর একটা প্রাণ। কী বিস্ময়! তিথি ধারণা করতে পারে না, পুরোপুরি বিশ্বাস হয় না তার। বুকের তলে কাঁপুনি ধরে। গত কয়েক দিন ধরেই থেকে থেকে চমকে উঠেছে সে। তার শরীরের মধ্যে তার সন্তান এসেছে! তার সন্তান! এ যে অভাবনীয়!

আপ্লুত হতে হতে বার বার ঝাঁকুনি দিয়ে নিজের সংবিৎ ফিরিয়ে এনেছে তিথি। এমন অসতর্ক স্বপ্ন তাকে সাজে না। কোনো অধিকার নেই তার। তাকে পাথর হতে হবে। কঠিনতম সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পার্থকে আর একতিলও বিশ্বাস করে না সে। কোনো মূল্য নেই তার কথার। তিথি জানে, কী ভবিষ্যৎ হতে চলেছে তার সন্তানের। জন্মের পর তাকে বাঁচিয়ে রাখার নূন্যতম দায়িত্বটুকুও পালন করতে পারবে না পার্থ। তার নিজের পক্ষেই–বা কতটুকু সম্ভব হবে? হয়তো বাচ্চা কোলে নিয়ে হাত পাততে হবে মা–বাবার কাছে। ছি ছি ছি! এ অবস্থায় মায়ের কাছে গেলে মা ফেলবেন না নিশ্চয়ই। কিন্তু তার নিজেরই যে লজ্জা রাখার জায়গা থাকবে না। কেন আনবে সে অনাগত প্রাণকে সেই সুনিশ্চিত দুর্ভাগ্য আর চূড়ান্ত শূন্যতার মধ্যে! কিছুতেই না। জন্মের

পর তিলে তিলে মরার থেকে তার আগেই তাকে শেষ করে ফেলবে সে। অন্তত বাচ্চাটা তো কোনো কষ্ট পাবে না তাহলে...নিজের অজান্তেই তিথির ডান হাত উঠে এল তার পেটের ওপরে। সে আলতোভাবে হাত বুলোতে লাগল, যেন আদর করছে। লাইব্রেরির জানলার পাশে বসে অনেকক্ষণ থেকেই এসব ভেবে যাচ্ছে সে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে তার। জানলা দিয়ে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খুব অন্যমনস্ক হয়ে গেল তিথি। বার বার মনে হতে লাগল, আচ্ছা, দু-মাসে কতটুকু হয়েছে বাচ্চাটা? ওর কি হাত হয়ে গেছে? পা? চোখ?

বুকের মধ্যে তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে সচেতন হয়ে উঠল তিথি। হুড়হুড় করে জল পড়ছে তার গাল বেয়ে। এ কী, এরকম হলে তো চলবে না। তাকে পাথর হতে হবে। দ্রুত চোখ মুছে উঠে পড়ল সে। জোর করে মনটাকে অন্যদিকে ফেরাতে চেষ্টা করল।

লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে একেবারে কলেজের বাইরে চলে এল তিথি। শীতের রোদটা আজ দারুণ উজ্জ্বল। কতদিন এমন উজ্জ্বল দিন দেখেনি সে। এই দিনটা কি তার? নাকি তার নয়? বুকের মধ্যে এখনও কান্না কাঁপছে তিথির। শিরা ছিঁড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার ভিতরে। গা গুলিয়ে উঠল আবার। ব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কাগজের মোড়ক বার করে তার থেকে এককুচি আদা নিয়ে মুখে ফেলল সে। আশ্চর্য, কিছুতেই অন্যমনস্ক হওয়া যাচ্ছে না। সিদ্ধান্ত তো নেওয়া হয়েই গেছে, তবু সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে এত কান্না আসতে চাইছে কেন! এই সুন্দর ফুটফুটে রোদ্দুরে ভরা দিনটা, শীতের দুপুরে রঙিন সোয়েটার পরা লোকজন, রাস্তা দিয়ে ছুটন্ত বাস আর গাড়ি...এসবই কী অলীক কী ভাসমান। তিথির সঙ্গে যেন তাদের কোনো যোগাযোগ নেই, যেন সে অনেক দূরের একটা রঙিন ছবি দেখছে...ওই যে একজন অল্পবয়সি মা লাল মারুতি থেকে নামছে, তার কোলে গোলাপি সোয়েটার জড়ানো একটা বাচ্চা। আহ্ কী সুন্দর বাচ্চাটা! সোয়েটারটা এত ফুলোফুলো যেন হাওয়াই মিঠাই, তার ওপর ছোট্ট টুলটুলে মুখটা জেগে আছে। মায়ের কোল থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে নিল কে? ওর বাবা নিশ্চয়ই, সুন্দর হাসছে বাচ্চাটা, ঠিক এই ফুটফুটে রোদ্দুরটার মতো। ওর মাও হেসে হেসে কী বলছে। কার মতো যেন দেখতে লাগছে মেয়েটিকে। খুব চেনা। কে? মৌসুমী না?

তিথির বুকে বিরাট একটা ঢেউ ভাঙার মতো ধাক্কা লাগল। সত্যিই মৌসুমী কি? না না, তা কী করে হবে। মৌসুমীর বিয়ে হয়ে গেলে সে খবর পেত না! তিথি চোখ বড়ো করে ভালো করে দেখল। মেয়েটি অনেক বড়োই হবে। মৌসুমীর মতো চুলের ধরন, সুন্দরীও। হাসিটা তো একদম মৌসুমীর মতো। কিন্তু মৌসুমী নয়, অন্যদিকে চোখ সরিয়ে নিল তিথি। তার বুক এখনও ধড়াস ধড়াস করছে।

তিথি ফুটপাত ধরে এলোমেলো হাঁটতে শুরু করল। জোর করে মনটাকে অন্যদিকে সরানোর একটা উপায় পেয়েছে সে। মৌসুমীর কথা মনে পড়ছে খুব। আশ্চর্য, কতদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে? তার এতদিনের প্রাণের বন্ধু! আজ তো সে মৌসুমীর নিকটাত্মীয়, তবু যোগাযোগ নেই। জীবন বুঝি এরকমই হয়। এক একটা বাঁকের আড়ালে হারিয়ে যায় কত কত মুখ। তিথি ভাবছিল, মৌসুমী নিশ্চয়ই খুব হতাশ হয়েছে। তার ওপর রাগ করেছে এভাবে পড়াশুনা ছেড়ে বিয়ে করে ফেলায়। তা ছাড়া, মৌকে সে নিজে থেকে কিছু জানাতেও চায়নি। ওর অভিমান হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে এতদিনের মধ্যে একদিনও দেখা হবে না এটা তিথি ভাবেনি। তার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। মৌ তো জানে সে কোথায় আছে, একদিন জেঠুর বাড়িতে এলেই তো তার সঙ্গে দেখা হয়! গলার কাছে একটা কষ্ট উঠে এল তিথির। মৌসুমী তাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে, তাকে ভুলে যেতে চেয়েছে। বন্ধু হিসেবে তিথিকে সে সাদরে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তার এই পরিণতি হয়তো সে চায়নি, ‘ভালোই করেছিস রে মৌ, আমায় ভুলে গিয়ে’, তিথি বিড়বিড় করল,—‘এখন আমায় দেখলে নির্ঘাত ঘেন্না করতিস তুই!’ তার মনে হল, মৌসুমী নিশ্চয়ই তার খবরাখবর রাখে। অলক তো মাঝেমধ্যে যান ওদের বাড়ি। তিথিই এতদিন তার সম্বন্ধে কোনো কথা জিজ্ঞেস করেনি। খুব অনুতপ্ত বোধ করল সে। সত্যিই, সে নিজেও মৌকে কতখানি মনে রেখেছে!

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে গম বাছতে বসেছিল তিথি। রেশনের গম। আটা ফুরিয়ে এসেছে। কাল গম না ভাঙানো হলে রুটিই হবে না। আগে এ বাড়িতে গম বাছার চল ছিল না। তিথি আসার পর শুরু হয়েছে। রেশনের গমে রাশিরাশি আবর্জনা মেশানো থাকে। কাঁকর, মাটির ঢেলা, কাঠি, শেয়ালকাঁটার বীজ আরও কত কী! সেসব সুদ্ধুই আটা হয়ে পিষে আসত ভাঙানির দোকান থেকে।

তিথি এ বাড়িতে আসার পর পরই একদিন বলেছিল, ‘বড়োমা, গমটা মনে হয় একটু বেছে নিলে ভালো হয়। দেব বেছে?’

‘আমার আর অত গম–টম বাছার সময় হয় না। তোমার ইচ্ছে হলে করো!’ সুধা বলেছিলেন। তারপর থেকেই গম বাছাটা তিথির নিয়মিত কাজের মধ্যে পড়ে গেছে।

দ্রুত হাত চালাতে চালাতে তিথি ভাবছিল আজ পার্থকে কীভাবে জানাবে তার সিদ্ধান্তর কথাটা। এর আগের দিনই পার্থ কোনো কথা শুনতে চায়নি। আজ নিশ্চয়ই বাড়িতে প্রলয় হবে। তিথির বুকের মধ্যে ভয় লাফাচ্ছে। কিন্তু মন স্থির রাখার চেষ্টা করছে সে। একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে এখনও পায়ের তলায় মাটি পায়নি, এত তাড়াতাড়ি আরও একটা ভুল সে কিছুতেই করবে না।

অলক অফিস থেকে বাড়ি আসতেই সুধা বললেন, ‘বাবার চিঠি এসেছে।’

অলক শার্টের বোতাম খুলছিলেন, ব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘বাবার চিঠি? কই? কী লিখেছে?’

‘আমি খুলে দেখিনি। কোনদিক দিয়ে ছিঁড়তে কোনদিক ছিঁড়ে ফেলব। ইংল্যান্ডের চিঠি। সীমাও পড়াতে গেছে।’

ইংল্যান্ডের চিঠি শুনে তিথি অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল। বাবার চিঠি মানে নিশ্চয়ই বর্ধমানের দাদু। সুধার মা–বাবা ওঁর ছোটোবেলাতেই মারা গিয়েছেন, তিথি শুনেছে। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে চিঠি দিয়েছেন কে!

সুধা যে চিঠিটা অলকের হাতে এনে দিলেন, সেটা দেখেই অবশ্য তিথি ভুল বুঝতে পারল। তার মুখে চাপা হাসির আভাস ফুটে উঠেছিল। অলক আড়চোখে সেটা দেখে বললেন, ‘ইংল্যান্ড না, ইনল্যান্ড ইনল্যান্ড। সীমা ছিল না, তিথি তো ছিল। ও তো জানে

ইনল্যান্ড কোনদিক দিয়ে খোলে। এতক্ষণ চিঠিটা না পড়ে রেখে দিয়েছ?' অলক আঙুল ঢুকিয়ে এবড়োখেবড়ো করে চিঠির মুখটা ছিঁড়লেন। ভাঁজ খুলতে খুলতে বললেন, 'এখন তো বাবার চিঠি আসার কথা না। দেখি আবার কী সংবাদ!'

পড়তে পড়তে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল অলকের মুখ, সুধাকে বললেন, 'মা আসছে, বুঝলে! সঙ্গে অসীম পাগলাটাও! মায়ের নাকি চলতে-ফিরতে খুব অসুবিধে হচ্ছে, পা তুলে ফেলতে পারছে না। ওখানে ডাক্তার দেখিয়েছে, বলেছে নার্ভের রোগ। এক্ষুনি কলকাতায় এনে চিকিৎসা করানো দরকার—'

সুধা শুনছিলেন। ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সব দায়িত্ব শুধু আমাদের। আর অন্যরা কেউ কিছু করবে না!'

'সে কথা আর কী বলব বলো!' অলক চিন্তান্বিত মুখে চিঠিটা দেখতে দেখতে বললেন, 'খরচ খরচা কিছু মায়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দেবে লিখেছে বাবা। সামনের রোববার আসবে। মানে...আজ তো বেস্পতিবার।...দোকানের লোকটা পৌঁছে দিয়ে যাবে। এই যে বাবা লিখেছে,

সবদিক বিবেচনা করিয়া তোমাকেই পত্র লেখা স্থির করিলাম। অন্যান্য ভাইদিগের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যাহা সুবিধা হয় করিও। তবে আমার মনে হয় আর কেহ তোমাদের মাকে রাখিতে চাহিলেও অসীমকে রাখিতে চাহিবে না। সে বেচারি এবার কিছুতেই মাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহিল না। তোমাদের মাও খুব অবুঝ হইলেন। যাহা হউক আমার মনে হয় ক-টা দিন উহাদের তোমাদের গৃহেই রাখিও। কষ্ট একটু হইবে। আর কী করা। আমি আর যাওয়ার আবশ্যক দেখি না। তোমরা আমার স্নেহাশীষ নিও। ইতি তোমাদের বাবা।

'অলক গড়গড় করে পড়ে থামলেন। সুধার দিকে তাকিয়ে বিপন্ন মুখে বললেন, 'বোঝো অবস্থা। এর মধ্যে অসীমটার কি না এলেই চলছিল না। পাগল-ছাগল আর বলেছে কাকে। সত্যিই তো, ওকে কে রাখবে নিজের বাড়িতে। বাবা খুব ভালোই জানে

অন্য ছেলেদের ল্যাজ কত মোটা।'

অলক চিঠি রেখে জামা খুললেন। সুধা কঠিন গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। বললেন, 'ওই জন্যেই তারা শুধু নিজেদের নিয়েই আছে। কর্তব্য করার বেলায় শুধু আমরা।'

অলক গজগজ করলেন, 'আর পারা যায় না। আমার ওপর যত হ্যাপা। কেউ রাজি হবে না সে আমি জানি, তবু দেখি একবার অরূপের বাড়ি যাই কাল। এত লোক এখানে থাকারও তো অসুবিধে। অশোককেও কাল একটা ফোন করব—'

'কোনো লাভ নেই। ওদের বলে কিছু হবে না, কেউ গায় জল ফেলতে দেবে না, দেখো, বউদের তো চিনি।' সুধা হাত নাড়লেন, 'উপায় আমাকেই করতে হবে। থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ওপরের ঘরটা তো আছে। মা নীচে থাকুক, অসীমকে ওপরে পাঠিয়ে দেব।'

তিথি চমকে সুধার দিকে তাকাল। সুধা তার চোখে চোখ ফেললেন না, অলকের দিকে তাকিয়েই বললেন, 'বিছানাপত্র নিয়েই মুশকিল হবে। ওপরে মেঝেতে বিছানা করতে হবে। তুমি আর পার্থ ওপরে মেঝেতে শুয়ো, বুঝলে? নীচে আমরা মেয়েরা রয়ে যাব।'

লুঙ্গি পরতে পরতে ছেলেমানুষের মতো মাথা ঝাঁকালেন অলক, 'না না। আমি খাটে ছাড়া শুতে পারি না—'

'আচ্ছা আচ্ছা সে দেখা যাবে।' সুধার মুখে বিরক্তি, 'খাটে শোব না বললে হবে কী করে। বুঝমতো চলবে তো! আমার হয়েছে সবদিকে জ্বালা।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

তিথি স্থির হয়ে বসে ছিল, মনের মধ্যেটা নিভে আসছে তার, প্রাণপণে একদিক সামলাতে গিয়ে অন্যদিক দিয়ে আরেকটা সমস্যা ঢুকে পড়ছে ক্রমাগত। নাকাল হয়ে যাচ্ছে তিথি, হাবুডুবু খাচ্ছে। যাও–বা তার একটা নিজস্ব আড়াল গড়ে তুলতে পেরেছিল সে, পড়াশুনার যৎসামান্য সুযোগ, সেটুকুও আবার ধসে পড়ল খানখান হয়ে!

অলক চাপা গলায় তাকে ডাকলেন, 'এই যে, শোনো! ও তিথি!'

তিথি মুখ তুলে তাকাতেই অলক ফিসফিস করে বললেন, 'তুমি একটু দেখো তো, তোমার বেশ বুদ্ধি আছে। এমন একটা হিসেব বার করো যাতে আমি খাট থেকে স্থানচ্যুত না হই, বুঝলে!' অলক ব্যস্তসমস্ত হয়ে বাথরুমের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, 'এই ঠান্ডায় মেঝেতে শোয়া, বাবারে! দাও দাও চা দাও—'

তিথি যন্ত্রচালিতের মতো উঠল। রান্নাঘরে গিয়ে দেশলাই জ্বালাতে গিয়ে তার হঠাৎ মনে হল, সুধা কী সুন্দর চট করে হিসাব করে ফেললেন কে কোথায় শোবে। অলক যাই বলুন, এটাই সবচেয়ে ঠিকঠাক ব্যবস্থা। অথচ, ওপরের ঘরটা না থাকলে এই ব্যবস্থা সম্ভব হত না। তিথির মনে পড়ল, যেদিন সে ঘরটা পরিষ্কার করেছিল সুধা কী রাগই না করেছিলেন। সেসব তাঁর নিশ্চয়ই মনে নেই। কিংবা মনে থাকলেইবা কী!

শিবানী আর অসীমের আসার খবর শুনে পার্থর কোনো হেলদোল হল না। সীমা অবশ্য খুব খুশি। তিথি শুনল সে অলককে বলছে, 'মা ঠিকই বলেছে বাবা। আমাদের তো এখন ঘরের অসুবিধে নেই। ঠাকমা আর ছোটোকা এখানেই বেশ থাকতে পারবে। খুব ভালো হবে।'

রাত্রে পার্থ তিথির কাঁধে হাত রাখল, 'কী গো, মনখারাপ?'

তিথি পার্থর দিকে তাকাল না। সে মনে মনে অন্য যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

'যাঃ তোমার সাধের ঘর থেকে পাততাড়ি গুটোতে হচ্ছে।' পার্থ হাসল, 'ভেবো না। ঠাকমা আর ক–দিন থাকবে? ট্রিটমেন্ট হয়ে গেলেই চলে যাবে। আমি অবশ্য ভেবেছিলাম এ ক–দিন খুব ভালোবেসে নেব, বাচ্চাটা লাথি ছুড়তে শেখার আগে', একটা চোখ বন্ধ করল সে, বলল, 'দুপুরবেলা দু-একদিন ছোটকাকে সরিয়ে আমরা ঠিক ম্যানেজ করে নেব, হ্যাঁ?'

'আমার তোমাকে একটা কথা বলার আছে পার্থ।' তিথি মনের সমস্ত জোর একজায়গায় করে বুক ভরে দম নিল।

পার্থ একটু অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তিথি হঠাৎ খুব জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল, 'তোমার নিশ্চয়ই মানতে কষ্ট হবে। কিন্তু এটা আমার সিদ্ধান্ত। তোমাকে আমার কথা শুনতে হবে। শুনতেই হবে।'

'কী বলছ? কী কথা?' পার্থর গলায় সন্দেহ।

তিথি তীব্র গলায় বলল, 'বলো, বলো তুমি আমার কথা রাখবে?'

'এরকম করছ কেন? কী কথা না শুনলে কী করে বলি?' পার্থ একইসঙ্গে বিরক্ত এবং কৌতূহলী।

তিথি সময় নিচ্ছিল। এই কথাটাকে মনে মনে বহুবার আবৃত্তি করেছে সে, কিন্তু বলতে গিয়ে মুখে আটকে যাচ্ছে তার। মরিয়া হয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল তিথি, তারপর শ্বাসরুদ্ধ স্বরে বলল, 'আমি...আমি অ্যাবরশন করাতে চাই।'

সে ভেবেছিল, কথাটা শুনেই পার্থ চেঁচিয়ে উঠবে, তেড়ে আসবে তার দিকে। কিন্তু পার্থ সেসব কিছুই করল না। তিথি ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল পার্থ ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার সমস্ত অবয়বে বিজাতীয় নিষ্ঠুরতা, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'না। সে আমি

কিছুতেই হতে দেব না। আমি ভেবে পাচ্ছি না এ কথা তুমি ভাবলে কী করে!'

তিথি অনুনয়ের সুরে বলল, 'প্লিজ, প্লিজ পার্থ। আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো। এরকম কোরো না...আমাকে একটু উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ দাও...তোমার নিজেরও তো তার আগে দাঁড়ানো দরকার...আমাদের কিছু নেই পার্থ, সন্তানকে দেওয়ার মতো কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমাদের....'।

'তোমাকে বার বার বলছি তিথি, এসব চিন্তা মাথা থেকে তাড়াও। পাগল হয়ে যাচ্ছ তুমি। সেইসব করলে একেবারে উন্মাদ হয়ে যাবে।'

'আমি পাগল!' তিথি বিস্ফারিত চোখে বলল, 'আমাকে তুমি পাগল বানাতে চাইছ?'

'আমি চাইছি না। তুমি চাইছ। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—' পার্থ তর্জনী নাচাল, 'শুনে রাখো, তুমি যদি অ্যাবরশন করাও তাহলে তোমার শরীরে খুঁত হবে। জীবনে আর মা হতে পারবে না তুমি। অথচ মা হতে চাইবে পাগলের মতো। তারপর উন্মাদ হয়ে যাবে—'

তিথি কানে হাত চাপা দিল, আর্ত চিৎকারকরে বলল, 'ব্যাস ব্যাস ব্যাস। আর শুনতে চাই না। কে বলেছে এসব কথা? তোমাদের ওই জ্যোতিষী, তাই না?'

পার্থ ঘাড় নাড়ল, 'হ্যাঁ, অনেকদিন আগেই বলেছিলেন নকুলবাবু। তোমার মধ্যে নাকি এইসব অশুভ টেন্ডেনসি আছে। তোমার মায়ের প্রভাবের জন্যই। আমাকেই তোমায় ওই মহিলার হাত থেকে টেনে বার করে আনতে হবে। ছিঃ তিথি! অ্যাবরশন কত বড়ো একটা পাপ তোমার সে জ্ঞান নেই? মাতৃত্ব একটা মেয়ের কাছে কী বিরাট গৌরবের, তুমি তাকে—'

দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল তিথি, 'হ্যাঁ, বেশ করব। বাবা হয়ে তুমি তাকে জন্মানোর পরে মারবে। আমি তাকে জন্মানোর আগেই মারব। বেশ করব, তুমি আমাকে বাধা দিতে পারো না—'

পার্থ হিসহিস করে উঠল, 'জঘন্য! তুমি এত জঘন্য মেয়ে আমার ধারণা ছিল না। নকুলবাবু অবশ্য বলেছিলেন, তোমার মা—'

পার্থর কথা শেষ হল না, তিথি হঠাৎ পার্থর খুব কাছে এসে দাঁড়াল। তাকে অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। তীব্র গলায় বলল, 'ও! আচ্ছা! আরও আছে? কথাগুলো বড়ো আস্তে আস্তে বেরোচ্ছে। আরও কী কী বলেছেন তোমাদের জ্যোতিষী, আমার সম্বন্ধে?'

পার্থ দাঁতে দাঁত ঘষল, বলল, 'তুমি একটা নোংরা ইতর মেয়ে—'

তিথি আরও কাছে চলে এল, প্রচণ্ড শীতল স্বরে বলল, 'আচ্ছা আমি না হয় নোংরা ইতর মেয়ে, কিন্তু তুমি তো পুরুষই নও, একটা নপুংসক। তোমাদের জ্যোতিষী বলতে পারবেন, আমার পেটে তোমার বাচ্চা এল কী করে?'

পার্থর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল কয়েকটা অশ্রাব্য গালাগাল। তিথির চুলের মুঠি ধরে তাকে একটা ধাক্কা মারতেই এক লহমায় তিথিও জন্তু হয়ে গেল। আজন্মের সমস্ত শিক্ষা, রুচি, ধৈর্য আর বোধ অবলুপ্ত হয়ে গেল তার। পার্থর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এলোপাথাড়ি আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছিল সে। পার্থ আত্মরক্ষা করতে পারছিল না, কেননা তিথি সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়েছে। মিনিট খানেক পরে শরীরের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর তিথি হড়হড় করে বমি করে দিল পার্থর গায়ে। তারপর চোখ বুজে এলিয়ে পড়ল মেঝেতে। এবারে সে সত্যি সংজ্ঞা হারিয়েছে।

রাত্রে একবার জ্ঞান ফিরেছিল তিথির, কিন্তু তারপরই আবার ঘুমে তলিয়ে গিয়েছিল সে। পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল, সারা গায়ে আর মাথায় অসহ্য ব্যথা। উঠবার শক্তি নেই। এমনকী মাথাও কাজ করছে না। একটুক্ষণ চোখ খুলে থাকার পর পরই

আবার আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছিল সে। সারাদিন এভাবেই কাটল। কেউ ডাকতেও এল না তাকে। সন্ধ্যে পেরিয়ে যাওয়ার পরে কোনোরকমে উঠে টলতে টলতে সে নীচে নেমে এল।

পার্থ নীচেই ছিল। তিথিকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। পার্থর কপালের ডান পাশে একটা গভীর আঁচড়ের দাগ। সেখানে মারকিউরোক্রোম লাগানো। সীমা জ্বলন্ত চোখে তিথির দিকে তাকিয়েই ছুটে রান্নাঘরে গিয়ে বলল, 'মা, দেখবে এসো। তিনি নেমেছেন।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুধা, দু–মুহূর্ত তিথির দিকে তাকিয়ে থেকে দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, 'তোমার ভাগ্য ভালো যে এখনও তোমার গায়ে কেউ হাত তোলেনি। একতরফা তুমিই মেরে যাচ্ছ। পেটের বাচ্চাটাকে খুন করতে চাও। ওইসব বদমায়েশি এ বাড়িতে চলবে না। আমার অনেক আগেই তোমায় শায়েস্তা করা উচিত ছিল, নইলে এত বাড় বাড়তে না। মাধুও তোমায় বড্ড লাই দিত, সে আর দেবে না কেন, বউ নিয়ে তো তাকে আর ঘর করতে হয় না। বাইরে থেকে ভালো সাজা খুব সহজ।' সুধা সীমার দিকে তাকালেন, 'নিয়ে আয় শাঁখা-পলাগুলো। আর নকুলবাবুর মাদুলিটাও নিয়ে আসবি।'

তিথি স্থির হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকল। সীমা গম্ভীরমুখে শাঁখা-পলাগুলো নিয়ে আসতেই সুধা বললেন, 'আর যদি কখনো খুলেছ তো দেখবে তোমার একদিন কি আমার একদিন। পরে নাও ওগুলো। আর ওই মাদুলিটা গলায় পরো। ওতে মগজ ঠান্ডা করবে। আর একদম বেগড়বাই করবে না। পরশু মা আর অসীম আসছে। ওদের সামনে যেন কোনো বেচাল না দেখি।'

তিথি সীমার হাতের দিকে তাকিয়ে দেখল তার হাতে শাঁখা-পলা ছাড়াও একটা বড়োসড়ো মাদুলি, লাল সুতো দিয়ে বাঁধা। সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল, হাত বাড়াল না।

সুধা হুংকার দিলেন, 'কী হল! কথা কানে যাচ্ছে না!'

'ওসব আমি পরব না বড়োমা।' তিথি মাথা নাড়ল। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সমস্ত শরীর ঝিমঝিম করছে। তবু ঘাড় শক্ত রেখে দাঁড়িয়ে রইল সে।

সুধা চিৎকারকরলেন, 'পরবে না মানে? তোমার ঘাড় পরবে। তোমার চুলকাটা মায়ের মতো বেহায়া বাউণ্ডুলে সেজে ঘুরে বেড়াবে নাকি?'

'আমার মা বেহায়া বাউণ্ডুলে নন।' তিথির আবার গা পাক দিয়ে উঠল।

পার্থ লাফিয়ে এল, 'ফের কথা? অনেক সহ্য করেছি আমরা। যা ইচ্ছে তাই করে যাচ্ছ তুমি। আর নয়। চুপচাপ মায়ের কথা শুনবে তো শোনো। নইলে বেরোও বাড়ি থেকে।'

তিথির শরীর মুচড়ে ওয়াক আসছিল, মুখের সামনে হাত চাপা দিল সে। কোনোক্রমে সামলে নিয়ে দু-হাতের লোহা আর ব্রোঞ্জের চুড়ি খুলে রাখল মেঝের ওপর। তারপর জুতোয় পা গলাল।

সুধা চোখ কপালে তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একী একী একী, লোহা খুলে ফেললে! এ কী সাংঘাতিক মেয়ে রে! ও কি মেয়ে না রাক্ষুসি? ও কোথায় যাচ্ছে?'

পার্থ তিথির হাত চেপে ধরল, 'কী সিন করছ, অ্যাঁ! মার খেয়ে মরার সাধ হয়েছে?'

তিথি মাথা নাড়ল, 'আমি সিন করছি না। তুমিও কোরো না। ডেকেছিলে বলে এসেছিলাম। চলে যেতে বলছ চলে যাচ্ছি। এই দুইয়ের মধ্যিখানে আমাকেও কম সহ্য করতে হয়নি—'

‘দে দে দে ওকে যেতে দে, যাবে আর কোন চুলোয়। আমাকে অপমান করাই ওর কাজ। তুইও গেলি আবার বউয়ের হাত ধরে টানতে। ছি ছি ছি...’ সুধা কাঁদতে শুরু করলেন। পার্থ তিথির হাত ছেড়ে দিল, গম্ভীর গলায় বলল, ‘ঠিক আছে, ঠিক আছে। যা ইচ্ছে করো, আমার কিছু বলার নেই। কিচ্ছু বলার নেই।’

তিথি বেরিয়ে গেল।

খানিকক্ষণ পর যখন অলক বাড়ি ফিরলেন, পার্থ তখন গুম মেরে বসে আছে। সুধা কাঁদছেন আর তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছে সীমা। অলক বললেন, ‘তিথি কোথায় গেল? চৌরাস্তার পাশের গলিতে ওর সঙ্গে দেখা হল, আমি ডাকলাম, শুনতেই পেল না...’ হঠাৎ দৃশ্যপটের ওপর ভালো করে চোখ বুলিয়ে তিনি সন্দিগ্ধ গলায় বললেন, ‘বলি হল কী তোমাদের, অ্যাঁ!’

সুধা ডুকরে উঠলেন, ‘হবে আবার কী! মাথা আর মুণ্ডু। চোখের ওপর দেখতে হল হাতের লোহা খুলে হাত খালি করে ফেলল জলজ্যান্ত জোয়ান ছেলের বউ। ও কি কম শয়তান! আবার ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ভরসন্ধ্যেবেলা পোয়াতি অবস্থায়। এত আস্পর্ধা ধম্মে সইবে না।’

অলক ধমক দিলেন, ‘আঃ থামো দিকি।’ পার্থর দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ‘হাত–পা কোলে করে বসে আছিস কী রে! বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, যা গিয়ে খুঁজে আন?’

‘ছাড়ো তো!’ পার্থ চোয়াল শক্ত করল, ‘যেখানে গেছে যাক। যাবে আর কোথায় এই রাত্তিরবেলা। পয়সাও তো নেই সঙ্গে। খুঁজতে হবে না। একটু পরে নিজেই চলে আসবে।’

একটা অন্ধ উদগ্র ঝোঁকে তাড়িত হয়ে তিথি প্রায় দৌড়োচ্ছিল। রাস্তাটায় আলো খুব কম। শীতের কুয়াশার সঙ্গে আলো–আঁধারি

মিশে রহস্যসংকুল হয়ে আছে। ফাঁকা ফাঁকা গলি, বাঁকের পর বাঁক নিতে নিতে এলোপাথাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে তিথি। অলকের সঙ্গে ওভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় সে আরও দিশাহারা হয়ে গেছে। অল্প আলোয় অলক প্রথমে তাকে চিনতে পারেননি। তিথিও খেয়াল করেনি। উলটোদিক থেকে তাকে পেরিয়ে গিয়ে হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন অলক, বলে উঠেছিলেন, 'কে? তিথি না? কোথায় যাচ্ছ?'

তিথি উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলছিল। অলকের গলা শুনে সে আর পিছনে তাকায়নি। তাড়াতাড়ি গতি বাড়িয়ে গলির মোড় ঘুরে গিয়েছিল। খানিকটা প্রায় দৌড়ে চলার পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল সে। না, কেউ আসছে না তার পিছনে।

গলগল করে ঘামছে তিথি। তার গায়ে কোনো গরম জামা নেই, এমনকি সালোয়ার কামিজের নীচে কোনো অন্তর্বাসও নেই। পাগলের মতোই বেরিয়ে এসেছে সে বাড়ি থেকে। কোথায় যাবে সে এবার! কোথায়?

আবার আর একটা অন্ধকার খাদের পাশে দাঁড়িয়ে তিথি মনস্থির করার চেষ্টা করল। এবারের ঝাঁপটা তার অনেক বেশি সুনিশ্চিত হতে হবে। কোনো ভুল আশা নয়, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য মাথায় রেখেই লাফাতে হবে তাকে। নিশ্চিত মৃত্যুর লক্ষ্যে।

তিথি অসহায় বোধ করল। এই মুহূর্তে তার হাতে কী কী উপায় আছে আত্মহত্যার? রেললাইনে গলা দেওয়া? রেললাইন কত দূরে, এদিকে রেললাইন কোথায় আছে তাই তো সে জানে না। হাঁটতে হাঁটতে ডায়মন্ডহারবার রোডে এসে পড়ল তিথি। পাণ্ডুর হ্যালোজেন আলো আবর্জনার মতো ছড়িয়ে আছে পিচরাস্তায়। বাস ট্রাম চলছে যেন অতিকায় নিশাচর জন্তুর মতো। মাঝে মাঝে দ্রুতগতিতে চলে যাচ্ছে একটা-দুটো ট্রাকও। তিথি মনের মধ্যে উপায় হাতড়াতে লাগল। ওইরকম একটা ট্রাকের সামনে লাফিয়ে পড়া যায় না? খুব কি কঠিন হবে ব্যাপারটা? তিথি একাগ্র মনে ভাবার চেষ্টা করল। তার ঠিক পেটের ওপর দিয়ে চলে যাবে ট্রাকের পিছনের ভারী ভারী চাকা। মরতে কত সময় লাগবে তার? নিজের পিষে যাওয়া বীভৎস মৃতদেহটাকে মনশ্চক্ষে একবার দেখে নেওয়ার পরই পার্থর মুখটা কল্পনা করার চেষ্টা করল তিথি। একটুও কি কষ্টের দাগ আছে সেই মুখে? সামান্য

অনুশোচনার?

নাঃ, তিথি মাথা ঝাঁকাল। কিচ্ছু নেই ওই মুখে। একটা স্বাভাবিক প্রতিশোধপরায়ণ শ্বাপদের মতো অকারণ নিষ্ঠুরতা ছাড়া আর কিছু নেই। কী সাংঘাতিক ভুল করেছে সে মানুষ চিনতে! এ কাকে ভালোবেসে নিজের জীবনটা তছনছ করে ফেলল সে! কার ওপর অভিমান করে মরতে চাইছে? যার জন্যে সব কিছু ছেড়ে অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়েছিল, কতটুকু মূল্য দিয়েছে তার? আর একবার ঝাঁপ দিলেও তো সে ঝাঁপ আরও মূল্যহীন অর্থহীন হবে।

তিথি মায়ের মুখ মনে আনতে চেষ্টা করল। তাকে মৃত দেখার পর মা কীরকম করবেন? পাগলের মতো কাঁদবেন? কাঁদতে কাঁদতে বলবেন, ‘এ আমি জানতাম, জানতাম তিথি শেষ হয়ে যাবে, ওর আর বাঁচার রাস্তা নেই!’

তিথি হঠাৎ তীব্র অস্থিরতা অনুভব করল। মা ওইভাবে কাঁদছেন কেন? বুকফাটা কান্নায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছেন মা, তাঁর মুখটা ভয়ংকর যন্ত্রণায় বেঁকেচুরে ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তিথির খুব ইচ্ছে করল মাকে জড়িয়ে ধরে, ধরে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু তার তো আর কোনো উপায় নেই। আত্মহত্যার পর সে কী করে সান্ত্বনা দেবে মাকে!

‘চুম্মা চুমা দে দে...চুম্মা চুমা দে দে চুমা...হুঁ হুঁ দে দে...’

তিথির বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। একটা লোক তার খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সোজা তার চোখের দিকে দেখছে। তিথি তাকাতেই লোকটা একটা চোখ ছোটো করল, তার দৃষ্টি তিথির গলা বেয়ে নীচে নামছে। হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল তিথি। এই শীতের রাত্রিতে সে একেবারে একা, আলুথালু, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত...এই বাজে লোকটা শিকারের গন্ধ পেয়ে গেছে। গন্ধে গন্ধে আরও কেউ জুটে যাওয়াও অসম্ভব নয়। এই প্রথম পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল তিথি। দৃঢ়পায়ে লোকটাকে পেরিয়ে এগিয়ে গেল যেদিকে এস থার্টি–ওয়ান বাসটা রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছে সেইদিকে। এখনই ছাড়বে মনে হচ্ছে বাসটা,

তার আশেপাশে কিছু লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিথি সেদিকে পা বাড়াতেই লোকটা শিস দিয়ে উঠল, চাপা গলায় বলল, ‘কী জানু! কোনদিকে?’

এস থার্টি–ওয়ানের এইটাই স্ট্যান্ড, বেহালা চৌরাস্তায়। তিথি দেখল, কন্ডাক্টর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন। সরকারি বাসের কন্ডাক্টররা বেশ শিক্ষিত আর ভদ্র চেহারার হন। এই কন্ডাক্টরও সেইরকম, প্রৌঢ়, চোখে চশমা। তিথি পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে একটু ইতস্তত করে ডাকল, ‘একটু শুনবেন?’

কন্ডাক্টর বুঝতে পারেননি তিথি কাকে ডাকছে। তিথি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল সেই বাজে লোকটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। আশা ছাড়েনি। তিথিকে তাকাতে দেখে জিভ বার করল। তিথি এবার একটু জোরে ডাকল, ‘শুনছেন? একটু শুনুন না।’

‘আমাকে বলছেন?’ কন্ডাক্টর এবার তিথির দিকে ফিরলেন।

‘হ্যাঁ...’

‘বলুন?’ তিনি সিগারেটটা শেষ করে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে পিষলেন। তিথি তখনও কিছু না বলায় কন্ডাক্টরটি একটু অবাক হয়ে গেছেন, বললেন, ‘কী ব্যাপার দিদি? কী বলছেন?’

তিথি আর দেরি করল না। এক নিশ্বাসে বলল, ‘দেখুন। আমি খুব বিপদে পড়ে আপনার হেল্প চাইছি। আমার শরীর খুব খারাপ। আমার কাছে পয়সাও নেই। আমাকে একটু...মানে...আপনাদের বাসে করে একটু পৌঁছিয়ে দেবেন?’

কন্ডাক্টরটি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, ‘কোথায় যাবেন আপনি?’

তিথি স্টপের নাম বলল।

‘অ, আচ্ছা। উঠে পড়ুন।’

নিশ্চিন্ত হতে গিয়েও দ্বিধা করছিল তিথি, আবার বলল, ‘আমার কাছে টিকিটের পয়সা নেই কিন্তু...’

‘ঠিক আছে, বললাম তো।’ কন্ডাক্টর হাত ঝাঁকালেন, ‘বাস এক্ষুনি ছেড়ে দেবে, উঠে যান।’

হু-হু করে বাস চলছিল। তিথির মাথার মধ্যেও মহাবেগে ছুটে চলেছে চিন্তার উথালপাথাল স্রোত। স্রোতে ভেসে আসছে অজস্র মুখ। প্রতিটি মুখই পার্থর। কোনো মুখ উদাসীন, কোনোটা হিংস্র, কোনোটা কুটিল। কোনো মুখে কোনো পিছুডাক নেই। হঠাৎ তিথি চমকে উঠল, স্রোতে ভেসে এসেছে অন্য একটি মুখ। মাধুবউদির। মাধুবউদিকে না বলে চলে এসেছে সে। ‘মাধুবউদি, আমাকে ক্ষমা কোরো মাধুবউদি’, তিথি ফিসফিস করল, ‘তুমি খুব দুঃখ পাবে জানি, কিন্তু বলো, আমার আর কীই বা করার ছিল...’

বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপতে গিয়ে থরথর করে কাঁপছিল তিথি। কিছুটা শীতে, কিছুটা ক্লান্তিতে, বেশিটাই চূড়ান্ত স্নায়ুর চাপে। অদিতি বারান্দায় এসে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে!’

তিথি কিছুতেই স্বাভাবিক স্বর বার করতে পারল না। ভাঙা ভাঙা বিকৃত গলায় বলল, ‘আমি!’ নিজের গলা নিজের কানেই এমন অদ্ভুত অচেনা ঠেকল তার, ভয় হল মা বোধ হয় চিনতে পারবেন না। রাস্তার আলোগুলো আজও জ্বলেনি। তিথি কাঁপতে কাঁপতে আবার বলল, ‘আমি তিথি, মা!’

অদিতি রুদ্ধশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। দরজা খুলতেই তিথি ভেতরে ঢুকে সিঁড়িতে বসে পড়ল। তার আর কাঁদারও শক্তি ছিল না। অদিতির মাথার মধ্যে ভয় আর প্রশ্ন তোলপাড় করছে। তিনি বললেন, ‘এখানে বসে পড়লি কেন তিথি! শরীর খারাপ? ডাক্তার ডাকব? তিথি?’

তিথি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল, বলল, ‘না। শরীর একটু খারাপ। ও কিছু না। খুব টায়ার্ড। চলো ওপরে যাচ্ছি।’

ওপরে এসে তিথি আর কথা বলতে পারছিল না। তার সমস্ত শরীর ভেঙে পৃথিবীর ঘুম ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনোরকমে সে অদিতিকে বলল, ‘কাল সব বলব মা। আজ একটু ঘুমোই...চিন্তা কোরো না...তেমন কিছু হয়নি...কাল...সব বলব...’ তার জিভ ভারী হয়ে মুখের ভেতর জড়িয়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথ পাগলের মতো করছিলেন। বার বার বলছিলেন—‘কী হয়েছে, কী হয়েছে মা? এত রাতে চলে এলি কেন?’

দুশ্চিন্তায়, উদ্বেগে অদিতিও বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। তিনি বুঝতে পারছেন সাংঘাতিক কোনো ঘটনাই ঘটেছে যাতে তিথি এইভাবে বাড়ি থেকে চলে এসেছে। কিন্তু কী হয়েছে তার কোনো আন্দাজ পাচ্ছেন না। মনকে শক্ত হাতে বাঁধলেন তিনি, ধৈর্য ধরলেন। বিশ্বনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘থাক। ওকে ঘুমোতে দাও। কাল সকালেই সব জানা যাবে।’

সারারাত তিথির পাশে শুয়ে দু-চোখের পাতা এক করতে পারলেন না অদিতি। জটিল চিন্তার আবর্তে ছটফট করলেন। কী হতে পারে যার জন্যে চলে এল তিথি? পার্থর সঙ্গেই কিছু হয়েছে হয়তো। গভীর মনোমালিন্য, রাগারাগি, ঝগড়াঝাঁটি। এমন তো হতেই পারে। সেরকম হলে তিথি এখানে থাকুক কয়েক দিন, বিয়ের পর একদিনও তো থাকেনি। তারপর মিটমাট হয়ে গেলে চলে যাবে। অদিতি এভাবে ভাবতে চেষ্টা করে বার বার ধাক্কা খাচ্ছিলেন। মনের মধ্যে আর একটা মন তাঁকে বারবার বলছিল, এত প্রচণ্ড শরীর খারাপ হয়েছে কেন তিথির! অদিতি ছটফট করছিলেন, সারারাত তিথির দিকে তাকিয়ে থেকেছেন তিনি। কী

নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে মেয়েটা। নিশ্বাসও যেন প্রায় পড়ছেই না। তার গা পাথরের মতো ঠান্ডা। অদিতির বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠেছে কতবার। বার বার তার গায়ে হাত দিয়ে দেখেছেন, আঙুল রেখেছেন নাকের তলে। কী হল মেয়েটার! কোনোদিন তাকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি তিনি। জিজ্ঞেস করতে তারও রুচিতে বেধেছে, তিথির হাবভাব দেখেও তিনি বুঝেছেন প্রশ্ন করলে সে বিরক্ত হবে। কাজেই শুধু তার চোখমুখ দেখেই বুঝে নিতে হয়েছে তাঁকে। তিথির সেই চোখমুখই কাল তাঁকে বলেছে, তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে...সে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত।

সকালেও তিথির ঘুম ভাঙল না। অদিতিও তাকে ডাকলেন না। দেখা যাক নিজে থেকে ওঠে কি না। আর একটু বেলা হোক। না হয় একটু পরেই তার ঘুম ভাঙাবেন। বিশ্বনাথ মর্নিং ওয়াকে চলে গেছেন। অদিতি বারান্দার দরজা খুলে বাইরে এলেন। মোড়া পেতে বসে আবার ডুবে গেলেন এলোমেলো চিন্তায়।

মনটা গভীরে গেঁথে থাকলেও অদিতির চোখ ছিল রাস্তার দিকে। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলেন তিনি। রাস্তার মোড় ঘুরে কে আসছে? পার্থ না! অদিতি দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেন। হ্যাঁ, পার্থই তো। উশকোখুশকো চেহারা। এগিয়ে আসছে, তবে তার হাঁটার ভঙ্গিটা যেন কেমন, যেন ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধে পা ফেলতে বাধ্য হচ্ছে সে। অদিতি শক্ত হয়ে উঠলেন। ঘরে এসে দেখলেন তিথি হাত-পা উপুড় হয়ে নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। অদিতি নিঃশব্দে নীচে নেমে গেলেন।

পার্থ দরজার সামনে এসেই অদিতিকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্পষ্টতই চমকে উঠল। অদিতি যে বারান্দা থেকে তাকে দেখতে পেয়েছেন সে বুঝতে পারেনি। অদিতি কিছু বললেন না, নিঃশব্দে সোজা তাকিয়ে থাকলেন পার্থর চোখের দিকে। পার্থ অস্বস্তিতে একবার চোখ সরিয়ে নিল। তারপর বলল, ‘তিথি আছে?’

অদিতি দৃষ্টি স্থির রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘তুমি জানো না?’

'না। কী করে জানব? বলে তো আসেনি।'

অদিতি দরজা থেকে সরে গেলেন। সংক্ষেপে বললেন, 'এসো। ও ঘুমোচ্ছে।'

দোতলায় এসে বসার ঘরে ঢুকে অদিতি বললেন, 'বলো কী হয়েছে।'

পার্থ বলল, 'কালকে মায়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছে তিথি। করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে।'

'ঝগড়া করেছে কেন?'

পার্থ ঠোঁটের কঠিন ভঙ্গি করল, বলল, 'কেন সেটা ওকেই জিজ্ঞেস করবেন।'

'ও ঘুমোচ্ছে। তুমিই বলো।' অদিতি নিরুত্তাপ গলায় কথা বলছেন। তাঁর চোখমুখ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। ভেতরে ভেতরে যদিও অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি।

পার্থ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে অসংলগ্নভাবে বলল, 'মায়ের কথা কিছু শোনে না। উলটোপালটা কাজ করবে। শাঁখা-পলা পরবে না। আমাদের বাড়ি ওরকম নয়। বলতে গেলে অশান্তি করে। মারপিট। তা ছাড়া ওর এখন বাইরে বেরোনো-টেরোনো ঠিক নয়, তাও মা বারণ করলে শোনে না—'

অদিতির কানে খট করে লাগল। বললেন, 'কী বললে? বাইরে বেরোনো ঠিক নয়? কেন বলো তো?'

'মানে, ওর...ও প্রেগন্যান্ট তো—' পার্থ দাড়িতে হাত বুলোল।

অদিতির গালে যেন কেউ ঠাস করে চড় মারল একটা। তাঁর কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। তিথি প্রেগন্যান্ট! মাথার মধ্যে হুড়মুড় শব্দে প্রবল ভাঙন টের পাচ্ছেন অদিতি। ব্যাস্, তিথির আর কিছু করার নেই। পড়াশুনা শুরু করে যাওবা একটু কোনোরকম ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিকে পা বাড়িয়েছিল, আবার পিছলে গেল সে। এত তাড়াতাড়ি ফাঁদে পা জড়িয়ে ফেলল মেয়েটা! অদিতির ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল, কিন্তু তিনি অবিচলিত স্বরেই বললেন, 'তাই নাকি? আমাকে কিছু বলেনি তো তিথি! ও, তাই ওর শরীরটা খুব খারাপ হয়েছে দেখলাম।'

পার্থ বিরস মুখে বলল, 'হ্যাঁ তা তো হবেই। বাড়িতে সবসময় অশান্তি করছে। নিজেও খায় না, ওর জন্যে মায়েরও খাওয়া হয় না।'

অদিতি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলেন। হঠাৎ বললেন, 'তিথির মনে হয় একটু রেস্ট দরকার। আমার মনে হয় এখন ও ক–দিন আমাদের কাছে থাক। বুঝলে? কাল থেকে খুব ঘুমোচ্ছে দেখছি। ওকে আর ডাকছি না—' অদিতি উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি বরং এখন এসো। পারলে সন্ধ্যেবেলায় এসো একবার। আমি তিথিকে বলব। তোমার মায়ের সঙ্গে ও খারাপ ব্যবহার করে শুনে খুব অবাক লাগছে। এটা তো ভালো কথা না।' অদিতি মাথা নাড়লেন, 'যা হোক। আমি বলব ওকে বুঝিয়ে। এসো, হ্যাঁ! আমি আর চা-টা করছি না।'

পার্থর হয়তো তিথিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ারই ইচ্ছে ছিল। অন্তত তার সঙ্গে কথা বলার। কিন্তু অদিতি সেদিক দিয়েই গেলেন না। সুস্পষ্ট ইঙ্গিতে চলে যেতে বললেন, তাঁর গলার স্বরে নির্দেশ ছিল। পার্থ আর জোর করতে সাহস করল না। অখুশি মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠিক আছে, সন্ধ্যেবেলা আসব। আপনি বলবেন ও যেন আজ বাড়ি ফেরে। মা মনে খুব দুঃখ পেয়েছেন।'

পার্থ চলে যাওয়ার পর অদিতি বসার ঘরেই মূর্তির মতো নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। হু-হু করে চোখ দিয়ে জল পড়ছে তাঁর। একটু পরে জোর করে নিজেকে সামলে নিলেন তিনি। এতে তাঁর এত ভেঙে পড়ার কী আছে! তিথি তার নিজের

জীবন নিয়ে যা খুশি করবে, যেভাবে ইচ্ছে বাঁচবে। এতে তাঁর কী বলার থাকতে পারে!

অদিতি তিথির কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। সামান্য সজাগ মনে হল তিথিকে। অদিতি তার মাথায় হাত রাখতেই তিথি সাড়া দিল, 'ম্?'

'ঘুম ভেঙেছে, তিথি?'

'হুঁ।...মা?' তিথি হাত বাড়িয়ে অদিতির হাতটা টেনে নিল নিজের মুঠির মধ্যে। তার চোখ এখনও বন্ধ।

'কী রে?' অদিতি অন্য হাতটা দিয়ে তিথির কপালের চুল সরাতে সরাতে বললেন।

'কিছু না মা। এমনি।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অদিতি ধীরে ধীরে বললেন, 'পার্থ এসেছিল। সব শুনলাম।' তিনি লক্ষ করলেন তিথির শরীরটা মুহূর্তের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল। দ্রুত নিশ্বাস ফেলছে সে। একটু চুপ করে থেকে অদিতি বললেন, 'ভালো খবর, খুব ভালো খবর।...তবে একটু তাড়াতাড়ি হল, এই যা...'

বলতে বলতেই দেখলেন তিথি একেবারে কুঁকড়ে গেল। তার সমস্ত শরীর এমন থরথর করে কাঁপছে, পুরো খাটটাই কাঁপছে সেই কাঁপুনিতে। অদিতি ভয় পেয়ে তার পিঠ আঁকড়ে ধরে ঝুঁকে পড়লেন—'কী হয়েছে? তিথি? কী হল? এরকম করছিস কেন? তিথি?'

হাঁটু দুটো গুটিয়ে বুকের কাছে নিয়ে এসেছে তিথি, দু-হাতে শক্ত করে জড়িয়ে আছে হাঁটু দুটোকে। মাথাটাকেও বাঁকিয়ে এনে

গুঁজে দিয়েছে বুকের কাছে। সমস্ত দেহটাকেই গুটিয়ে যেন সে কোনো উদ্যত আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে চাইছে নিজেকে। একটা তীব্র মরিয়া আর্তনাদ ছিটকে এল তার গলা থেকে—‘না না না মা। আমি পরীক্ষা দিতে চাই মা! আমি পরীক্ষা দেব।’

৭

তিথি ক্রমাগত নিজের শরীরটাকে দুমড়ে–মুচড়ে ফেলছিল। ছটফট করতে করতে অস্পষ্ট গোঙানির স্বরে একটা কথাই বলে যাচ্ছিল বার বার, 'আমি পরীক্ষা দেব মা, আমি পরীক্ষা দেব।'

অদিতি প্রথমে ভয় পেয়ে গেছিলেন। তারপর তিথিকে নাড়া দিলেন, 'তিথি, এই তিথি! স্বপ্ন দেখছিস। উঠে পড়। তিথি?'

তিথি চোখ খুলে তাকাল। বিভ্রান্ত চাহনি। ধাঁধা লেগে গেছে তার। অদিতি সস্নেহে হাসিমুখে বললেন, 'এখনও ওই সব বাজে স্বপ্ন দেখিস, হ্যাঁরে! ভোরে উঠে মহালয়া চালালি তো দেখলাম। তারপর কী ঘুম কী ঘুম!'

তিথি চোখ মুছে বলল, 'উফ্ বাবা, স্বপ্ন দেখছিলাম, না?'

'সত্যি, কী দুঃস্বপ্নের দিন গেছে সেসব! ভোলা কি যায় সহজে। আমিও তো পুরোপুরি ভুলতে পারি না...' সামলে নিলেন অদিতি, কৌতুকের সুরে বললেন, 'নিজেই এখন কলেজে ছাত্রদের পরীক্ষা নিস, আবার ঘুমের মধ্যে পরীক্ষা দেব বলে চেঁচাস। যাঃ, ওঠ, উঠে পড়। বাথরুম থেকে ঘুরে আয়। পরোটা ভাজছি।'

'আজ তো কলেজ ছুটি মা।' তিথি আড়মোড়া ভাঙল, 'আজ আমি পরোটা ভাজব।'

'আচ্ছা আচ্ছা। আগে ওঠ তো। আমি রান্নাঘরে গেলাম।'

তিথি খাট থেকে নামল। মাথাটা খুব ভার হয়ে আছে। এ আজ কী হয়েছিল তার! পিছু হাঁটতে হাঁটতে জীবনের কোন

অন্ধকারতম কোণে ফিরে গিয়েছিল সে! সেই কোণ থেকে কবেই তো ছিটকে বেরিয়ে এসেছে সে। বেরোনো যদিও খুব সহজ হয়নি। পার্থ সাধ্যমতো অনেকরকম খেলা খেলবার চেষ্টা করেছে। তিথিকে সেসব স্পর্শ করেনি। অদ্ভুত নিঃসাড় হয়ে গিয়েছিল সে। পার্থর জোরজবরদস্তিতে যেমন ভয় পেত না, তার অনুনয়-বিনয়ও ছাপ ফেলত না তার মনে। সব শেষ হয়ে গিয়েছিল মনে আছে, মেরি স্টোপস্ ক্লিনিক থেকে মেডিকেল টার্মিনেশন করিয়ে ও যেদিন বাড়ি ফিরল, পার্থ এসেছিল রাত্রে। মধ্যের কয়েকটা দিন তার সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও কোনোরকম সাহায্য করেনি সে। অদিতি একাই সব ব্যবস্থা করেছিলেন। জেনারেল অ্যানিস্থিসিয়া করা হয়েছিল তিথিকে। বাড়িতে যখন ফিরেছিল সে, পুরোপুরি চেতনা আসেনি তার। পার্থ তাকে বলেছিল, 'আমার কথা শুনলে না তিথি। সেই পাপই করলে। তবু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিচ্ছি, কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। বাড়ি চলো, আমি তোমাকে শেষ সুযোগ দিতে চাই—'

পাগলের মতো চিৎকারকরে উঠেছিল তিথি, 'বেরিয়ে যাও! আজ তুমি আমাকে ভালোবাসার কথা বলতে এসেছ? ভালোবাসা? সব ফুরিয়ে গেছে পার্থ, সব শেষ হয়ে গেছে। যাও, বেরিয়ে যাও, চলে যাও তুমি। আমি আর কোনোদিন তোমার কাছে ফিরব না—'

চিৎকারশুনে ছুটে এসেছিলেন অদিতি, 'তিথি, শান্ত হ তিথি, তোর শরীর খুব খারাপ, এখন এত উত্তেজনা ঠিক নয়।'

শেষ মুহূর্তে আবার ভোল বদলে ফেলেছিল পার্থ। কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমাকে অন্তত আর একটা সুযোদ দাও—'

'সুযোগ! কীসের সুযোগ? আমরা আর কেউ কাউকে কোনো সুযোগ দিতে পারি না পার্থ।' তিথি অদিতির দিকে তাকিয়ে ক্লান্ত স্খলিত স্বরে বলেছিল, 'ওকে চলে যেতে বলো মা। বলো যেন কখনো আর এখানে না আসে।'

ডিভোর্সের মামলাও অদিতিরা করেননি। পার্থদের তরফ থেকেই সেসমস্ত চুকেবুকে গেছে। তিথি চলে আসার পর প্রথম প্রথম

পার্থ উত্ত্যক্ত করতে ছাড়েনি। উড়ো চিঠি দিত। কলেজে গিয়ে দেখা করার চেষ্টা করত। তিথির নিঃসাড় শীতলতার কাছে হার মানতে বাধ্য হওয়ার পর তার দিক থেকেই আইনি বিচ্ছেদের গরজ বেশি দেখা গেল। তিথি চেয়েছিল আর কোনো জটিলতায়, নোংরামিতে না জড়িয়ে শুধুমাত্র নৈঃশব্দ্যের আশ্রয় নিয়ে যাবতীয় টানাপোড়েন থেকে উত্তীর্ণ হতে। সেইমতো, মামলা চলাকালীন তাদের তরফ থেকে টুঁ শব্দটিও করা হয়নি। একতরফা মামলার নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়ার অনেক বছর পর আদালত থেকে ডিভোর্স পেপারটা সংগ্রহ করে এনেছে তিথি। তাতে লেখা আছে—‘শ্রীমতী তিথি মল্লিক একজন অস্বাভাবিক ক্রূর এবং নিষ্ঠুর স্বভাবের মহিলা। তার মাথাও খারাপ। তার এই স্বভাবের জন্য অভিযোগকারী শ্রীপার্থ মল্লিক ও তাঁর পরিবারের সমস্ত শান্তি বিঘ্নিত হয়...’

কুররর্ কুররর্...কুররর্ কুররর্...কুররর্ কুররর্...

ফোনটা বাজছে। অদিতি গলা তুললেন, ‘তিথি! কই, বাথরুমে গেলি না এখনও। দ্যাখ তো কার ফোন!’

বিশ্বনাথ ফোনটা ধরেছিলেন। দু-একটা কথা বলার পর গলা চড়ালেন, ‘তিথি, তোর ফোন। অনিন্দ্য।’

বর্তমানে ফিরে এল তিথি। কর্ডলেস টেলিফোনটা কানে চেপে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কথা বলতে বলতে দেখল চারিদিকে ঝলমল করছে রোদ। রোদের গা থেকে সমস্ত ধুলো ধোঁয়া বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। উপচে পড়ছে খুশির জৌলুশ। এই সকালেও চকচকে নীল আকাশে প্যাঁচ খেলছে একটা লালঝারি আর একটা চাঁদিয়াল। ফোনে ছুটির দিনের প্রোগ্রাম করতে চাইছে অনিন্দ্য। অনিন্দ্য তিথিদের কলেজেই পড়ায়। তিথি জিওগ্রাফি, অনিন্দ্য বাংলা। অনিন্দ্য তার সহকর্মী, বন্ধু। প্রেমিক নয়।

তিথি একমুহূর্ত ভাবল। কী চমৎকার দিনটা। পুজোর গন্ধ ম-ম করছে রোদ্দুরের গায়ে। আজকের দিনটা কি সে অনিন্দ্যর সঙ্গে কাটাতে চায়? মন স্থির করতে একটু সময় নিল তিথি, তারপর বলল,—‘না, আজ থাক অনিন্দ্য। আজ একটু বাড়িতে রিল্যাক্স

করি।'

'ওকে! ঘুমোও তাহলে। দেখি আর কাকে পাওয়া যায়।' অনিন্দ্য লাইন ছেড়ে দিল। রাগ করল না। অনিন্দ্যকে কখনো রাগ করতে দেখেনি তিথি, পাঁচ বছর একসঙ্গে কাজ করছে। হাসিখুশি ঠান্ডা মাথার ছেলে। তিথি ওকে পছন্দ করে। অনিন্দ্যও পছন্দ করে তাকে। কিন্তু না, এখনও তারা শুধু বন্ধুই। অন্য কিছু ভাবতে তিথি ভয় পায়। আর ঝাঁপ দিতে রাজি নয় সে। তার সারা শরীরে সেই প্রথম ঝাঁপের ক্ষতচিহ্ন আজও মেলায়নি। অনিন্দ্যর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর একদিন তিথি দুম করে বলেছিল, খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই, 'জানো অনিন্দ্য, আমি একটা বিয়ে করেছিলাম, ডিভোর্স হয়ে গেছে।' কেন যে সে ওভাবে বলল কথাটা, বলার পর নিজেই ঠিক বুঝতে পারেনি। সম্ভবত তার মনে হয়েছিল, এটা তার জানিয়ে রাখা কর্তব্য, যেন কেউ মনে না করে সে তার জীবনের একটা দাগ লুকিয়ে নিষ্কলুষ সাজছে। অনিন্দ্য খুব অবাক মুখ করে তাকিয়েছিল, 'তাই? কিন্তু হঠাৎ এ কথা বললে কেন? আমি তো কিছু জিজ্ঞাসা করিনি!'

'না, মানে, মনে হল...তুমি আমাকে যা ভাবছ আমি তা নই...'

অনিন্দ্য সারা মুখে আরও বিস্ময় মাখিয়ে বলল, 'ও! বাঁ-পাটা দেখাও!'

'মানে!'

'তাহলে কি ডান পায়ে?'

'কী বলছ বুঝতে পারছি না।'

'কোন পায়ে ছ–টা আঙুল আছে তোমার?'

'ছ–টা আঙুল! কেন, আমার তো...' তিথি অনিন্দ্যর কথার কোনো মাথামুণ্ডু খুঁজে পাচ্ছিল না।

'পাঁচটাই ছিল নিশ্চয়ই, ডিভোর্সের পর ছ–টা হয়ে যায়নি?' অনিন্দ্য খুব সিরিয়াস মুখে বলল, 'তুমি বললে যে আমি যা ভাবছি তুমি তা নও...তবে কি তোমার লেজ হয়েছে? কিংবা শিং?'

রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল তিথি। নিজের বোকামিতে লজ্জা করছিল তার। কিন্তু সত্যিই, নিজের সম্পর্কে এই অতিরিক্ত সচেতনতা থেকে এখনও সে পুরোপুরি মুক্ত নয়। তবু, অনিন্দ্যর সঙ্গে সহজ বন্ধুত্বে আরামবোধ হয় তার। অনিন্দ্য আর সে, পাশাপাশি যেমন হাঁটছে, কখনো কথা বলতে বলতে, কখনো চুপচাপ, তেমনই হেঁটে যেতে চায় আপাতত।

ফোন রেখে তিথি রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। পরোটা বেলছেন অদিতি। তিথিকে দেখে বললেন, 'কার ফোন রে?'

'অনিন্দ্য। আমাকে ডাকছিল। লোক জুটিয়ে দলবেঁধে নিক্কো পার্ক যাবে। বাচ্চা আর কাকে বলে!' তিথি মুখে কপট বিরক্তি আনতে গিয়েও হেসে ফেলল।

'তা একটু বাচ্চা হওয়া মন্দ কী! দেখছি তো ছেলেটিকে। এদিকে যেমন ছেলেমানুষ তেমনই আবার দায়িত্বশীলও মনে হয়। বেশ বুদ্ধিমান, না রে?' অদিতি সমর্থন প্রত্যাশা করে তিথির দিকে তাকালেন, 'তুই যাবি না?'

তিথি মিটিমিটি হাসল। বলল, 'নাঃ, আজ আমি বাড়িতে থাকব, তোমার সঙ্গে আড্ডা মারব। আচ্ছা মা, অনিন্দ্যকে তোমার খুব পছন্দ, না?'

অদিতি হাসলেন। কিছু বললেন না। তাঁর মনের তলায় স্বপ্ন দানা বাঁধছে। অল্পবয়সে যে ভুল করেছিল তিথি, তার জন্যে যথেষ্ট শাস্তি ভোগ হয়ে গেছে তার। আজ সে জীবনে প্রতিষ্ঠিত। এবার কি একজন উপযুক্ত মানুষ আসতে পারে না তার জীবনে? অদিতি নিশ্বাস ফেললেন।

তিথি এখন অন্য কথা ভাবছে। মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে হচ্ছে, মা না থাকলে আজ এই সুন্দর আলোময় সকালে কখনো কি ঘুম ভাঙত তার! আর কোনো পুজোও কি ফিরে আসত তার জীবনে, শাশ্বত ধ্রুবপদের মতো! আবার একটা অন্ধ ঝাঁপই তো দিতে হয়েছিল তাকে। সেই ঝাঁপের সময় মা তাকে লুফে না নিলে আবার সে কোথায় গিয়ে ঠেকত কে জানে।

'এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছিস? আমার যে বেলা হয়ে গেল।'

তিথি ছেলেমানুষি আবদারের স্বরে গভীর আদর মিশিয়ে বলল, 'ওই গানটা একটু গাও–না মা। ওই যে...মিথ্যা স্বপনরাজি কোথা মিলাইল, আঁধার গেল মিলায়ে...'

সঞ্চারি থেকে গানটা গেয়ে উঠল তিথি, অদিতি তার সুরের কোনাটা ধরে নিলেন...'শান্তি সরসী মাঝে চিত্তকমল ফুটিল আনন্দবায়ে...মনোমোহন গহন যামিনীশেষে দিলে আমারে জাগায়ে...'

সুর আর কথার মিলিত অভিঘাতে আবার জল আসছে তিথির চোখে। এ জল কোনো কান্নার নয়। আনন্দের হয়তো। হয়তো তাও নয়। শুধুই কোনো গভীর উপলব্ধির। তিথির গলার কাছে কান্না আটকে আছে বলে সে গাইতে পারছে না, অদিতির সুরেলা ভারী কণ্ঠস্বরের তলে নিজের স্বর ডুবিয়ে ফিসফিস করে আবৃত্তি করছে গানের লাইনগুলো...'মেলি দিলে শুভপ্রাতে সুপ্ত এ আঁখি...শুভ্র আলোক লাগায়ে...'

নিজস্ব নিয়মে গান ঘুরে ঘুরে ফিরে আসছে সমে...